প্রথম সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ ১৯৬০

প্রকাশক : অভয়কুমার বর্মন
সংস্কৃত বুক ডিপো প্রাঃ লিঃ
২৮/১ বিধান সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : শ্রীসিদ্ধার্থ মিত্র
বোধি প্রেস
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

স্তুতি-গীতি-প্রার্থনা

ভূমিকা ঃ ভারতীয় আর্যজাতির প্রাচীনতম সাহিত্যকীর্তি ঋগ্‌বেদ। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান বা জ্ঞানভাণ্ডার। বেদের মন্ত্রগুলি দীর্ঘকাল যাবৎ গুরুশিষ্যপরম্পরায় আবৃত্তির মাধ্যমে অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়েছিল—তাই এর অন্য নাম শ্রুতি। আবার বেদকে ত্রয়ী শব্দের দ্বারাও বোঝান হয় (অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ ও সাম সংহিতার সমন্বয়)। প্রাচীন ভারতীয় আর্যজাতির ধর্ম-সাহিত্য-সংস্কৃতির সম্যক্ পরিচয় বহন করছে চারটি সংহিতা এবং অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য। ঋগ্‌বেদ প্রায় দশ হাজাব ছয় শ' মন্ত্রের সংকলন ; সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ঋক্‌সংহিতা থেকে গৃহীত। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষি-কবি ও তাঁদের বংশধরগণ এইসব মন্ত্র বা কবিতার বচয়িতা। অথর্ববেদ ব্যতীত সমগ্র বৈদিক সাহিত্য মূলতঃ ধর্মীয় সাহিত্য। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, রুদ্র, সরস্বতী, উষা, সূর্য, বায়ু প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত মন্ত্র-কবিতায় প্রাচীন মানবজাতির চিন্তাভাবনা সার্থক বাঙ্ময় রূপ পরিগ্রহ করেছে। দেবদেবীর স্তুতি-গীতি, যাগযজ্ঞের উপদেশ, দার্শনিক চিন্তাভাবনার কথা আছে, কিন্তু অধিকাংশ মন্ত্রে প্রকৃতি-উপাসক আর্য-জাতির খাদ্য-পানীয়, শত্রুনাশ, দম্পত্যসুখসম্পদ্ প্রভৃতির বিপুল কামনাই সোচ্চার। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যথার্থ পরিচয় নির্ধারণে অথর্ববেদও মূল্যবান আকর। গদ্য ও পদ্যে রচিত ছয় হাজার মন্ত্রের এই সংকলনে প্রাচীন মানব-গোষ্ঠীর রাষ্ট্রচিন্তা, কৃষিবাণিজ্য ও সম্পদ-সমৃদ্ধির কথা এবং রোগ নিবারণ, শত্রুনিধন, সুখপ্রসব, অলক্ষ্মীনাশ, রতিসৌভাগ্য প্রভৃতির কামনা আর বিবিধ মারণ-উচাটন-বশীকরণ প্রভৃতির সমাবেশ। ঋগ্‌বৈদিক দেবত্ববাদের মূল তত্ত্ব প্রকৃতি-উপাসনাকে অবলম্বন করেই প্রতিষ্ঠিত ; স্বাভাবিক দান-প্রতিদানের ভিত্তিতে মানুষ ও দেবতার

সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছে। তাই গৃহী মানুষ দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছেন ধী, শ্রী, ঋত ও সত্য, উতি (সাহায্য), শর্ম (সুখ), মৃড়া (করুণা), মেধা, ক্রতু (জ্ঞান), ভদ্র (মঙ্গল) ও চারুতা।

ভূমি-বন্দনা

ভূমিকা ঃ পৃথিবী সম্পর্কে আদিম মানুষের চিত্তে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিস্ময়-কৌতূহলের অন্ত ছিল না। ভারত, গ্রীস, মিসর প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সাহিত্যে মাতৃরূপে পৃথিবীর বন্দনায় ভূপ্রকৃতির সঙ্গে মানবের নিবিড় সম্পর্কের এক বাস্তব দিক এবং অন্যদিকে এক মিস্টিক চেতনা পরিস্ফুট হয়েছে। দ্যাবা-পৃথিবী দিব্য জনক-জননী[১]; আকাশ-পিতার ঔরসে পৃথিবী-মাতার গর্ভে সমস্ত জীবের জন্ম, তার কোলেই জীবন ও মৃত্যু। অথর্ববেদের দ্বাদশ কাণ্ডে ভূমিসূক্তের কবি অথর্বা ৬৩টি মন্ত্র-কবিতায় শস্যসম্পদ্‌ধারিণী আনন্দমঙ্গলবিধায়িনী ভূমি-জননীর স্তুতি রচনা করেছেন ঃ

শাশ্বত সত্য, মহান ঋত, তপস্যা, ব্রহ্ম আর ধর্ম—
ধারণ ক'রে আছে ভূমিকে ;
ভূত-ভবিষ্যতের পত্নী এ ধরণী ;
ওগো পৃথিবী! জীবলোক বিস্তীর্ণ করো মানব-কল্যাণে ॥
জীবিত মানবের তরে তোমার অবাধ বিস্তার,
উচ্চ, নীচ, সমতল বহু ভেদ,
ধারণ ক'রে আছ বহুগুণ ওষধি ;
ওগো পৃথিবী! আমাদের কল্যাণে বিস্তীর্ণা হও, সমৃদ্ধা হও ॥
পৃথিবীতে বিরাজিত সমুদ্র, নদী, অগণিত জলধারা,

১। বৈদিক দ্যৌস্‌ ও পৃথিবী, গ্রীক Zeus ও Gaia জনক-জননী; ইজিপ্টে Seb (Earth) ও Nut (Heaven) পিতা-মাতা, সাঁওতালদের সের্মা-অতে (আকাশ ও পৃথিবী) হলেন আপা-এঙ্গা (পিতা-মাতা)।

অন্ন আর কৃষি এ পৃথিবীতেই উৎপন্ন;
প্রাণময় কর্মময় জীব লাভ করে সঞ্জীবনী শক্তি,
ওগো পৃথিবী ! সম্পন্ন করো আমাদের পানকর্ম ॥
তুমি বিশ্ব নিখিলের ধারণকর্ত্রী,
ওগো ভূমি ! সোনার বরণ বক্ষ তোমার,
তুমি সর্ব জঙ্গমের নিবেশনী।
তুমিই ধারণ করেছ বৈশ্বানর অগ্নিকে,
হে ইন্দ্রপালিতা ধরণী ! দাও অমেয় সম্পদ্[১] ॥
নিদ্রাহীন দেবগণ অপ্রমাদে রক্ষা করেন ভূমিকে,
ওগো ভূমি ! আমাদের কল্যাণে দোহন করো জীবনের মধু-রস,
তোমার দীপ্তিতে পূর্ণ করো এ জীবন ॥
আদিতে ভূমি ছিল সমুদ্রে সলিলরূপা,
প্রাজ্ঞেরা তাকে অন্বেষণ করেছেন প্রজ্ঞা দিয়ে ;
মহান আকাশ-লোকে সত্যে আবৃত তার মর্মস্থল,
সত্যে আবৃত তার অমৃত শক্তি ;
ওগো ভূমিরূপা ! উত্তম রাষ্ট্রে আমাদের জ্ঞান ও শক্তি দাও ॥
ভূমিতেই প্রবাহিত হয় জলস্রোত,
সমভাবে অনালস্যে চলেছে দিবা ও রাত্রি ;
ওগো বহুধারা ভূমি ! আমাদের কল্যাণে ক্ষরণ করো প্রাণ-রস,
অভিষিক্ত করো তোমার দীপ্তিতে ॥
গিরিসব তোমারই, হিমবান্ পর্বত আর অরণ্য তোমারই,
ওগো ভূমি ! তোমার সকলই আমাদের সুখকর হোক ;
তুমি কোথাও পাংশুবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণা, নানারূপে নিশ্চলা,
আমি যেন অপরাজেয়, অনাহত, অক্ষতরূপে বাঁচি তোমাতেই ॥
তোমার মধ্যদেশে, নাভিতে যে শক্তি সঞ্জাত,

১। বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা, / হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী /
বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিম্ / ইন্দ্রঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু ॥

তাই দিয়ে রক্ষা করো আমাদের।
ওগো ভূমি! তুমি আমার মা,
আমি যে তোমারই সন্তান;
তোমার নিঃশ্বাস স্পর্শ করুক আমার দেহ,
আর পিতা পর্জন্য আমায় পূর্ণ করুক[১] ॥
ওগো পৃথিবী! মর্ত্য মানবকে তুমি জন্ম দিয়েছ, লালন করেছ;
দ্বিপদ আর চতুষ্পদ তোমারই,
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ—পঞ্চমানব তোমারই,
উদয়বিহারী সূর্য সবার কল্যাণে বিস্তার করুক অমৃত জ্যোতি ॥
ওগো পৃথিবী! তুমি নিখিল তরুলতাতৃণগুল্মের মাতা,
অক্ষয় ভূমির ধর্ম দিয়ে ধারণ করেছ সকলকে,
আমাদের জীবনে মঙ্গলময়ী, শুভাকাঙ্ক্ষিণী হও,
আমরা আনন্দে বিচরণ করবো তোমাতেই ॥
ওগো পৃথিবী! যে সুরভি সঞ্জাত তোমার দেহে—
তরুলতা ও বারিধারায় সে সৌরভ বিকশিত,
সে গন্ধ লাভ করেছে গন্ধর্ব ও অপ্সরা;
আমাকেও সুরভিত করো তোমার সে গন্ধে;
কেউ যেন আমাদের হিংসা না করে ॥
যে সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছে নর ও নারীতে,
যে ঐশ্বর্য আর শুচিতা দিয়েছ স্ত্রী ও পুরুষে,
যে বীর্য অশ্বে, বীর-পুরুষে, অরণ্য-পশুতে, হস্তীতে,
যে লাবণ্য কুমারী কন্যাতে,—
ওগো ভূমি! সেই শক্তি আর দীপ্তি দাও আমাতে;

১। যত্তে মধ্যং পৃথিবি যচ্চ নভ্যং / যাস্ত ঊর্জস্তন্বঃ সং বভূবুঃ /
তাসু নো ধেহ্যভি নঃ পবস্ব, / মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ /
পর্জন্যঃ পিতা স উ নঃ পিপর্তু ॥

কেউ যেন দ্বেষ না করে আমাদের॥[১]
শীলা, মাটি আর প্রস্তরে নির্মিত কঠিন তোমার দেহ,
বক্ষে তোমার সোনার উজল আভা॥
ওগো ভূমি! আমি যা খনন ক'রে তুলি—
তা যেন ত্বরায় পুষ্টি লাভ করে;
তুমি পবিত্র করো সর্ব বস্তু,
তোমার গভীর হৃদয় যেন বিদীর্ণ না করি॥
ওগো ভূমি! গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির, বসন্ত তোমারই,
দিবস, রাত্রি, সংবৎসর—তোমারই;
আমাদের কল্যাণে বর্ষণ করো রস-পানীয়॥
এ ভূমিতেই মর্তের মানব আনন্দে গান করে,
নৃত্য করে, যুদ্ধ করে, চীৎকার করে;
এখানেই বেজে ওঠে দুন্দুভি;
ওগো ভূমি! দূর করো আমার শত্রু,
ওগো পৃথিবী! আমায় করো শত্রুহীন[২]॥
ওগো দেবী, তোমার গুহাতে রক্ষা করেছ অপরিমেয় সম্পদ্,
আমাদের দাও বহু ধন, মণি আর হিরণ্য।
মনস্বিনী তুমি, ধনদায়িনী তুমি,
আমাদের ভালোবেসে দাও অগাধ ঐশ্বর্য।
তুমি যোগ্য নিবাসে পালন করেছ মানবকে,

১। যস্তে গন্ধঃ পুরুষেষু, / স্ত্রীষু পুংসু ভগো রুচিঃ /
যো অশ্বেষু বীরেষু / যো মৃগেষূত হস্তিষু॥
কন্যায়াং বর্চো যদ্ ভূমে / তেনাস্মাঁ অপি সং সৃজ,
মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন॥
২। যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি / ভূম্যাং মর্ত্যা বৈ্যলবাঃ /
যুধ্যন্তে যস্যামাক্রন্দো, / যস্যাং বদতি দুন্দুভিঃ /
সা নো ভূমিঃ প্র ণুদতাং / সপত্নানসপত্নং মাং পৃথিবী কৃণোতু॥

নানা জাতি, নানা ভাষা তাদের।
পয়স্বিনী গাভীর মতো দাও সহস্রধারা সম্পদ্ ॥
ওগো পৃথিবী! তুমি পালন করো লঘু আর গুরুকে,
সহ্য করো ভাল আর মন্দের বিনাশ,
তুমি জান হিংস্র বরাহকে,
পথ ক'রে দাও বন্য শূকরকে ॥
দ্বিপদ বিহঙ্গ, সুপর্ণ হংস, আকাশচারীরা উড়ে চলে তোমাতে,
বহে যায় মাতরিশ্বা বায়ু—ধূলিজাল উড়িয়ে, বৃক্ষকে নাড়িয়ে,
ধাবমান বায়ুর পিছনে ছুটে যায় অগ্নিশিখা ॥
ভূমিতেই বিরাজিত গ্রাম, নগর, অরণ্য জনসভা ;
সেখানেই জেগে ওঠে সংগ্রাম, বাদ-প্রতিবাদ ,
আমরা সর্বত্র যেন তোমার প্রশংসায় মুখর হই ॥[১]
ওগো ভূমি-জননী!
কল্যাণ বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করো আমায় ;
হে কবি, ক্রান্তদর্শী!
দ্যুলোকের সাথে আমায় প্রতিষ্ঠিত করো ধী ও শ্রীতে ॥[২]

ঋগ্‌বেদ

কবি কণ্ব

[১৷৩৮৷১৪]

মুখে মুখে নির্মাণ করো শ্লোক,
মেঘের মতো বিস্তার করো তার বাণী,
গান করো গায়ত্রীছন্দোযুত স্তোত্র ॥

১। যে গ্রামা যদরণ্যং যাঃ সভা অধি ভূম্যাম্।
যে সংগ্রামাঃ সমিতয়স্তেষু চারু বদেম তে ॥

২। ভূমে মাতর্নি ধেহি মা / ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
সংবিদানা দিবা কবে / শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম্ ॥

কবি মেধাতিথি

[১।২১।৬]

হে দেবতা অগ্নি আর ইন্দ্র—
জাগ্রত হও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের ভূমিতে,
জাগ্রত হও পরম সত্যের দীপ্তিতে,
দাও আমাদের কল্যাণ ॥

কবি হিরণ্যস্তূপ

[১।৩১।৭, ১০]

হে অগ্নি!
তুমিই—তুমিই অমৃতত্বে ধারণ করো শ্রেষ্ঠ মানবকে,
ধারণ করো প্রতিদিবসের কীর্তিতে ;
উভয়ের তরে তৃষিত যে নর—
সেই ধীমানকে দাও সুখ আর সম্পদ।[১]
হে দেব অগ্নি—প্রকৃষ্টমতি তুমি,
তুমি আমাদের পিতা, আমাদের জীবনদাতা ;
আমরা তোমার সখা ;
দাও আমাদের দীর্ঘ আয়ু ॥

ওগো ইন্দ্র—আমায় সুখ দাও,
জীবনের পূর্ণতা দাও,
প্রেরণ করো লৌহধারার মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি,
গ্রহণ করো আমার এ বাণী,
তোমার দীপ্তিতে করো দীপ্তিমান ॥

১। ত্বং ত্বমগ্নে অমৃতত্বম্ উত্তমে / মর্তং দধাসি শ্রবসে দিবে দিবে /
যস্তাতৃষাণ উভয়ায় জন্মনে / ময়ঃ কৃণোষি প্রয় আ চ সূরয়ে ॥

কবি মধুচ্ছন্দা

[১।৩।১১, ১২]

দেবী সরস্বতী
শোভন ঋতের প্রেরয়িত্রী,
শোভন মতির জনয়িত্রী,
তুমি ধারণ করো আমাদের কর্ম[১] ॥
সরস্বতী অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র,
তিনি প্রেরণ করেছেন চৈতন্য-বারি,
অনন্ত বোধিতে তিনি বিশ্ব-বিরাজিতা[২] ॥

কবি প্রস্কণ্ব

[১।৪৯।১, ৪]

দেবী উষা—
দীপ্যমান দ্যুলোক হতে মঙ্গলবাহিনী হয়ে এসো,
অরুণ-কিরণমালায় তুমি এসো,
তুমি এসো গৃহীর গৃহে গৃহে—
যেখানে সোমরসের নৈবিদ্য সাজানো[৩] ॥
তুমি বিদীর্ণ করো এ আঁধার,
আলোকমালায় উদ্ভাসিত করো বিশ্ব,
সম্পদের অভিলাষী মানব,
তাই নিখিল তোমার বন্দনায় মুখর ॥

১। চোদয়িত্রী সূনৃতানাং / চেতন্তী সুমতীনাং /
যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥

২। মহো অর্ণঃ সরস্বতী / প্র চেতয়তি কেতুনা /
ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি ॥

৩। উষো ভদ্রেভিরা গহি / দিবশ্চিদ্ রোচনাদধি /
বহন্ত্বরুণপ্সব / উপ ত্বা সোমিনো গৃহম্ ॥

কবি কাক্ষীবান

[১।১২৩।১০]

কান্তিময়ী কন্যা তুমি উষা—
চলেছ দানশীল দীপ্ত সূর্যের অভিসারে
স্মিতহাস্যে অনাবৃত করো শুভ্র বক্ষ—
যেন হাস্যময়ী শুভ্রা শোভনা সুন্দরী[১] ॥

কবি কশ্যপ

[৯।১১৩।১১]

হে সোম-দেবতা—
যেখানে বিরাজিত আনন্দ,
যেখানে প্রমোদ, হর্ষ, সুখ,
সব কামনার যেখানে প্রাপ্তি—
সেখানে আমায় করো মৃত্যুহীন[২] ॥

কবি গোতম

[১।৮৯।১, ২, ৪]

সর্ব দিক হতে আসুক মঙ্গল চিন্তা—
দ্বেষহীন, স্বত-উৎসারিত, নির্মল।
দেবতারা আমাদের অপরিত্যাগী, প্রতিদিনের রক্ষক ;
তোমরা আমাদের বর্ধিত করো ॥
কল্যাণহৃদয় দেবগণ মানবের সখা,
আমাদের জীবনে নেমে আসুক

১। কন্যেব তন্বা শাশদানাঁ এষি / দেবি দেবমিয়ক্ষমাণম্ /
সংস্ময়মানা যুবতিঃ পুরস্তাদ্ / আবি র্বক্ষাংসি কৃণুষে বিভাতী ॥

২। যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ / মুদঃ প্রমুদ আসতে /
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মাম্ / অমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥

তাঁদের কল্যাণবুদ্ধি, শুভ অনুগ্রহ ;
আমরা চেয়েছি দেবতাদের মৈত্রী,
তাঁরা জীবন বর্ধন করুন জীবনের কল্যাণে ॥
বায়ু বহন করুক আরোগ্য ঔষধ
আমাদের কল্যাণে ;
পৃথিবী-জননী আর আকাশ-জনক দিক আরোগ্য ঔষধ
আমাদের কল্যাণে···[১] ॥

কবি গোতম

[১।৮৯।৮]

হে দেবগণ ! আমাদের কর্ণে হোক মঙ্গল শ্রবণ ;
হে পূজনীয়গণ ! আমাদের চক্ষে হোক মঙ্গল দর্শন ;
অচঞ্চল অঙ্গে যেন তোমাদের স্তুতি করি,
আর দেবদত্ত শুভ আয়ু লাভ করি[২] ॥

কবি বসিষ্ঠ

[৭।৩৫।৩]

কল্যাণকর হও আমাদের ধাতা, আমাদের ধর্তা ;
কল্যাণকরী হও অন্নময়ী বিস্তীর্ণা পৃথিবী,
দ্যুলোক, ভূলোক আর পর্বত,
কল্যাণকর হোক দেবতাদের শোভন আবাহন[৩] ॥

১। তন্নো বাতো ময়োভু বাতু ভেষজং /
তন্মাতা পৃথিবী তৎ পিতা দ্যৌঃ ।
২। ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা / ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ /
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ / ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥
৩। শং নো ধাতা শমু ধর্তা নো অস্তু / শং ন উরূচী ভবতু স্বধাভিঃ /
শং রোদসী বৃহতী শং নো অদ্রিঃ / শং নো দেবানাং সুহবানি সন্তু ॥

কবি বৃহস্পতি

[১০।৭১।২-৪]

যেমন চালুনীতে শক্তু-পরিষ্কার—
প্রাজ্ঞদের প্রজ্ঞায় বিশুদ্ধ হোল বাক্ ;
সখার সখ্যতা এ বাণীতেই রচিত,
কল্যাণী লক্ষ্মী বাণীতেই বিরাজিতা[১] ॥
যাগকর্ম থেকেই বাক্যের পদবী উদ্‌গত,—
অন্তরনিহিত সে বাণী প্রাপ্ত হলেন কবিরা ;
সেই বাক্ বিস্তার করলেন তাঁরা,
সপ্ত ছন্দে নির্মাণ করলেন তাঁর স্তব ॥
বাক্‌কে কেউ দেখেও দেখে না,
বাক্‌কে কেউ শুনেও শোনে না ;
পতির কাছে সুবাসা জায়ার মতো—
বিদ্বানসমক্ষে বাক্ আপন তনু প্রকাশ করেন[২] ॥

কবি কুৎস

[১।১১৫।১, ২, ৬]

বিচিত্র তেজঃপুঞ্জ আকাশে উদিত,
মিত্রা-বরুণ ও অগ্নির চক্ষু তিনি,
দ্যাবা-পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ তাঁর আলোয় উদ্ভাসিত,—
তিনি স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা দেব সূর্য[৩] ॥

১। সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো / যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত /
অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে / ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি ॥

২। উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচম্ / উত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্ /
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে / জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥

৩। চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং / চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ /
আ প্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং / সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥

প্রেমিক যেমন প্রেমিকার অনুসরণ করে—
দীপ্তিময়ী উষার পশ্চাতে তেমনি আসেন সূর্য,
দেবত্বের অভিলাষী মানুষ তাঁর উদয়ে নন্দিত হয়ে
যুগে যুগে কর্ম সম্পাদন করে চলেছে ;
তাই সবিতা কল্যাণ কর্মের প্রতিদান করেন ॥
হে দেবগণ—
আজ সূর্যের উদয় হলে
পাপ থেকে, নিন্দা থেকে আমাদের মুক্ত করো—
এ প্রার্থনা পূর্ণ করুন মিত্র ও বরুণ,
পূর্ণ করুন অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যুলোক ।

কবি বামদেব

[৪।২৬।১, ২]

আমি ছিলেম মনু, আমিই সূর্য ;
আমি ঋষি কাক্ষীবান, আমি মেধাবী ;
আমি অলঙ্কৃত করেছি আর্জুনী কুৎসকে ;
আমি ক্রান্তদর্শী উশনা ;
সর্বস্বরূপে দেখ আমায় ॥
আমি আর্যকে দান করেছি পৃথিবী,
আমি দানশীল মানবকে দিয়েছি বৃষ্টি,
আমি এনেছি শব্দায়মান জল ;
আমার সংকল্পের অনুগামী হোক দেবগণ ॥

কবি গোতম

[১।৯০।৬-৮]

সত্যের পথিক যিনি—তাঁর উদ্দেশে
মধু বর্ষণ করে বায়ু,

মধু ক্ষরণ করে নদ-নদী,
আমাদের জীবনে মধুময় হোক ওষধি,
মধুময় হোক উষা আর শর্বরী,
মধুসিক্ত হোক পৃথিবীলোক,
মধুময় হোক পালয়িতা দ্যুলোক,
সূর্য হোক মধুময়,
বনস্পতি মধুমান,
আলোক হোক মধুময় ॥[১]

কবি ত্রিশিরা
[১০।৯।১, ২]

ওগো জল—
তোমরা হও সুখদায়ক,
তুলে ধরো ঊর্ধ্বলোকে —
মহৎ ও রমণীয় দর্শনের তরে ॥
কল্যাণময় মাতৃস্তন্যের মতো—
কল্যাণতম তোমাদের রস,
সেই রসে পুষ্ট করো আমাদের[২] ॥

১। মধু বাতা ঋতায়তে / মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ /
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ ॥
মধু নক্তমুতোষসো / মধুমৎ পার্থিবং রজঃ /
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥
মধুমান্নো বনস্পতির্ / মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ /
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥
২। আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্ / তা ন উর্জে দধাতন /
মহে রণায় চক্ষসে ॥
যো বঃ শিবতমো রসস্ / তস্য ভাজয়তেহ / নঃ উশতীরিব মাতরঃ ॥

আমি অবগাহন করেছিঁ জলসমূহে,
সংগত হয়েছি তাদের প্রাণরসে ;
এসো দেব রসময় অগ্নি—
আমায় সংযুক্ত করো তেজে ॥

কবি সংবলন

[১০।১৯১।১-৩]

তোমরা সব মিলিত হয়ে গমন করো, বাক্য উচ্চারণ করো,
তোমাদের মিলিত হৃদয় সব অবগত হোক ;
যেমন যজ্ঞভাগী দেবগণ সম্মিলিতরূপে উপাসনা করেন,
—তোমরাও সম্মিলিত হয়ে সর্ব সম্পদ ভোগ করো ॥
এক হোক পরস্পরের মন্ত্র, এক হোক সমিতি ;
এক হোক হৃদয়, এক হোক মন ;
উচ্চারণ করবো একই মন্ত্র,
আহুতি দেব একই হবি ॥
এক হোক তোমাদের আকূতি,
এক হোক হৃদয়, এক হোক চিত্ত,
তাতেই ঘটুক শুভ মিলন ॥[১]

১। সং গচ্ছধ্বং, সং বদধ্বং, / সং বো মনাংসি জানতাম্ /
দেবা ভাগং যথা পূর্বে / সংজানানা উপাসতে ॥
সমানো মন্ত্রঃ, সমিতিঃ সমানী / সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্ /
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ / সমানেন বো হবিষা জুহোমি
সমানী ব আকূতিঃ, / সমানা হৃদয়ানি বঃ /
সমানমস্তু বো মনো / যথা বঃ সুসহাসতি ॥

যজুর্ব্বেদ

[৩২।৩]

যাঁর নাম মহৎ যশ,
নেই যে তাঁর তুলনা।[১]

[৩৫।৮, ৯]

তোমার জীবনে কল্যাণময় হোক সমীরণ
কল্যাণময় হোক সূর্যের কিরণ,
কল্যাণময় হোক সকল শুভ কর্ম,
কল্যাণময় হোক পার্থিব অগ্নি,
দূর হোক যত দুঃসহ পীড়া॥
কল্যাণময় হোক দিঙ্‌মণ্ডল,
কল্যাণতম হোক সব জল, সব নদী
কল্যাণময় হোক অন্তরিক্ষ,
কল্যাণময় হোক দিগ্‌দেশ॥

[৩৬।১৭]

দ্যুলোকের শান্তি, অন্তরিক্ষের শান্তি,
পৃথিবীর শান্তি, জলসমূহের শান্তি,
দেবগণের শান্তি, পরমাত্মার শান্তি,
নিখিলের শান্তি,—শান্তিই পরম আশ্রয় ;
আমার জীবনে আসুক পরমা শান্তি॥[২]

১। ন তস্য প্রতিমা অস্তি / যস্য নাম মহদ্‌যশঃ॥

২। দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ, বিশ্বে দেবাঃ শান্তিঃ, ব্রহ্ম শান্তিঃ, সর্বং শান্তিঃ, শান্তিরেব শান্তিঃ, সা মা শান্তিরেধি।

[১৭।২৭, ৪৯]

যিনি আমাদের পিতা, জনক, বিধাতা ;
যিনি জানেন বিশ্ব ভুবন, সর্ব ধাম ;
সর্ব দেববৃন্দে যিনি এক, অনন্য,—
বিশ্ব ভুবন পরমোৎসাহে তাঁরই সন্ধানী ॥[১]

[২।৩২]

হে পিতৃগণ, তোমাদের নমস্কার ! তোমাদের রসস্বরূপ বসন্তকে নমস্কার ! শোষস্বরূপ গ্রীষ্মকে নমস্কার ! জীবনস্বরূপ বর্ষাকে নমস্কার ! স্বধাস্বরূপ শরৎকে নমস্কার ! ঘোরস্বরূপ হেমন্তকে নমস্কার ! মন্যু-স্বরূপ শিশিরকে নমস্কার ! হে পিতৃগণ তোমাদের নমস্কার ! তোমরা আমাদের গৃহ দাও, জাগতিক ভোগ্য দাও ! তোমরা ধারণ করো আমাদের নিবাস ॥

[৪।৪]

হে চিৎপতি, আমাকে পবিত্র করো ; বাক্‌পতি, আমাকে পবিত্র করো ; দীপ্তিমান সবিতা, তোমার পবিত্র কিরণমালার দ্বারা আমাকে পূত করো ; হে পবিত্রপালক, তোমার যে শুচিতা ও পবিত্রতার কামনায় আমি পূতাত্মা—সেই শুচিতা যেন আমার জীবনে সার্থক হয়ে ওঠে ॥

[১১।৪৫]

হে অঙ্গিরা, তুমি দেব অগ্নি ! তুমি মানুষী প্রজাদের কল্যাণকর হও ! আকাশ ও পৃথিবীকে তাপিত কোরো না ! অন্তরিক্ষ আর বনস্পতিকে তাপিত কোরো না ॥

১। যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা / ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা / যো দেবানাং নামধা এক এব / তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যান্ত্যন্যা ॥

[১৩।১৮]

দেবী ! তুমি ভূ, তুমিই ভূমি, তুমি অদিতি, তুমি বিশ্বপালিকা ; তুমি নিখিল ভুবনের ধাত্রী ! পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত করো, পৃথিবীকে দৃঢ় করো, পৃথিবীকে হিংসা কোরো না[১] ॥

[১৫।৩৮]

হে সৌভাগ্য-দেবতা ! শুভঙ্কর হোক আমাদের আহুতি ; শুভঙ্কর হোক আমাদের দান ; শুভঙ্কর হোক আমাদের যজ্ঞ ; শুভঙ্কর হোক আমাদের সকল প্রশস্তি ॥

[১৬।২]

হে রুদ্র ! কল্যাণময়ী তোমার তনু সৌম্যা, পুণ্যপ্রকাশিনী। হে গিরিশন্ত ! সেই কল্যাণতমা তনুর দ্বারা আমাদের উপর চোখ রাখ[২] ॥

[১৬।২৫, ৩০, ৩২, ৪১]

প্রণতি জানাই গণ ও গণপতিদের ! প্রণতি জানাই ব্রাত ও ব্রাতপতিদের ! প্রণতি জানাই মেধাবীদের আর মেধাবি-পালকদের ! প্রণতি জানাই বিরূপ ও বিশ্বরূপদের ॥ হ্রস্ব ও বামনকে নমস্কার ; বৃহৎ ও বর্ষীয়ানকে নমস্কার ; বৃদ্ধ ও বৃদ্ধতমকে নমস্কার ; শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠতমকে নমস্কার ॥ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠকে নমস্কার ; পূর্বজ ও অপরজকে নমস্কার ; মধ্যম ও অপ্রগল্‌ভকে নমস্কার ; মঙ্গলকারক আর সুখকারককে নমস্কার ! কল্যাণকে নমস্কার, কল্যাণতরকে নমস্কার ॥

১। ভূরসি ভূমিরস্যাদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী।
পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃংহ, পৃথিবীং মা হিংসীঃ ॥

২। যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥

[১৯।৯, ৩০]

হে দেব ! তুমি তেজঃস্বরূপ, আমাকে তেজ দাও ; তুমি বীর্য-স্বরূপ, আমাকে বীর্য দাও ; তুমি বলস্বরূপ, আমাকে বল দাও ; তুমি কান্তিস্বরূপ, আমাকে কান্তি দাও ; তুমি মন্যুস্বরূপ, আমাকে মন্যু দাও ; তুমি সহঃস্বরূপ, আমাকে শক্তি দাও[১] ॥

এই ব্রতের দ্বারা দীক্ষা লাভ হয়। দীক্ষা থেকে দক্ষিণা ; দক্ষিণা থেকে শ্রদ্ধা ; শ্রদ্ধা থেকে হয় সত্যের উপলব্ধি[২] ॥

[২০।১৫, ১৬]

যদি দিনে অথবা রাত্রিতে পাপ অনুষ্ঠান ক'রে থাকি,—বায়ু আমাকে সেই পাপ থেকে মুক্ত করুন, নিখিল বিঘ্ন থেকে মুক্ত করুন ॥ যদি জাগরণে অথবা স্বপ্নে পাপ অনুষ্ঠান ক'রে থাকি—সূর্য্য আমাকে সেই পাপ থেকে মুক্ত করুন, নিখিল বিঘ্ন থেকে মুক্ত করুন[৩] ॥

[১৮।৫, ৬]

যাগ কর্মের দ্বারা পূর্ণ হয়ে উঠুক আমার জীবন : পূর্ণ হোক আমার সত্য, শ্রদ্ধা, জগৎ ও ঐশ্বর্য ; আমার বিশ্ব, দীপ্তি, ক্রীড়া ও আনন্দ ; আমার জাত ও জনিষ্যমাণ ; আমার শোভন কর্ম আর শোভন বাণী। সফল হোক আমার ঋত, অমৃত, রোগের ভয় থেকে

১। তেজোঽসি, তেজো ময়ি ধেহি। বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি। বলমসি, বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽসি, ওজো ময়ি ধেহি। মন্যুরসি, মন্যুং ময়ি ধেহি। সহোঽসি, সহো ময়ি ধেহি ॥

২। ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি, দীক্ষয়া আপ্নোতি দক্ষিণাম্ ; দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি, শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে ॥

৩। যদি জাগ্রদ্, যদি স্বপ্ন এনাংসি চকৃমা বয়ম্ ; সূর্যো মা তস্মাদ্ এনসো বিশ্বান্ মুঞ্চতু অংহসঃ ॥

মুক্তি ; আমার নিরাময় ও ঔষধ ; আমার দীর্ঘ আয়ু, সুখ ও সুনিদ্রা ; আমার সুপ্রভাত ও সুদিবস ॥

[২২।২২]

হে ঈশ্বর ! রাষ্ট্রে তেজস্বী, অধ্যয়নশীল ও ধার্মিক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করুক ! বীর ক্ষত্রিয় এবং লক্ষ্যভেদে নিপুণ তীরন্দাজ মহান্ যোদ্ধা জন্মগ্রহণ করুক ! দুগ্ধদাত্রী গাভী, ভারবহনপটু বৃষভ, দ্রুতগামী অশ্ব, সুন্দরী নারী, অপরাজেয় সৈনিক এবং বিচক্ষণ ও বাগ্মী যুবক জন্মগ্রহণ করুক ! ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বীর সন্তান লাভ করুক ! মেঘ আমাদের ইচ্ছানুসারে বর্ষণ করুক ! শস্য পরিপক্ক হোক ! আমরা যেন অলব্ধ বিষয় লাভ করতে পারি এবং লব্ধ বিষয় রক্ষা করতে পারি[১] ॥

অথর্ববেদ

কবি অথর্বা

[১।৩৪, ২, ৩]

আমার জিহ্বাগ্রে মধু, জিহ্বামূলে কুসুমের মধুরস,
আমার কর্মে হোক মধু, তুমি এস মধুচিত্তে ;
মধুময় হোক আমার বহির্গমন আর প্রত্যাগমন ;
মধুমতী হোক আমার বাণী—আমার সকল দৃষ্টি[২] ॥

১। আ ব্রহ্মন্, ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তাম্, আ রাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর ইষব্যোঽতিব্যাধী মহারথো জায়তাম্ ; দোগ্ধ্রী ধেনুঃ, বোঢ়া অনড্বান্, আশুঃ সপ্তিঃ, পুরন্ধ্রিঃ যোষা জিষ্ণু রথেষ্ঠাঃ, সভেয়ো যুবা অস্য যজমানস্য বীরো জায়তাম্ ; নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু ; ফলবত্যো ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাং ; যোগক্ষেমো নঃ কল্পতাম্ ॥

২। জিহ্বায়া অগ্রে মধু মে / জিহ্বামূলে মধুলকম্ /
মমেদহ ক্রতাবসো / মম চিত্তমুপায়সি ॥
মধুমন্মে নিক্রমণং / মধুমন্মে পরায়ণম্ /
বাচা বদামি মধুমদ্ / ভূয়াসং মধুসংদৃশঃ ॥

কবি ব্রহ্মা

[১৯।৬৭।১-৮]

শত শরতের প্রাজ্ঞ দৃষ্টি,
শত শরতের পূর্ণ জীবন,
শত শরতের বৃদ্ধ বোধি,
শত শরতের সার্থক বিকাশ,
শত শরতের কাম্য পুষ্টি,—
সুন্দর করুক এ জীবন ;
শত শরতে পূর্ণ হবে প্রাণ,
আমরা হব শতবর্ষের মানব[১] ।

কবি অথর্বা

[৩।৩০।১-৬]

সমানহৃদয়, সমানচিত্ত আর দ্বেষহীন করি তোমাদের,
জাতবৎস্যা গোজননীর সন্তানবাৎসল্যের মতো—
অবিচ্ছেদ্য অক্ষয় হোক তোমাদের ভালোবাসা ;
পুত্র হোক পিতার অনুব্রত, মাতার সহমর্মী,
জায়া পতিকে জানাবে শান্তির মধুমতী বাণী ।
ভাই যেন ভাইকে হিংসা না করে,
ভগ্নী যেন ভগ্নীকে দ্বেষ না করে ;
অনন্যব্রত তোমরা এক মনে উচ্চারণ করো প্রীতির ভাষা,

১। পশ্যেম শরদঃ শতম্ / জীবেম শরদঃ শতম্ /
বুধ্যেম শরদঃ শতম্ / রোহেম শরদঃ শতম্ /
পূষেম শরদঃ শতম্ / ভবেম শরদঃ শতম্ /
ভূয়েম শরদঃ শতম্ / ভূয়সী শরদঃ শতাৎ ॥
শরতেই ফসলের সমারোহ, তাই ঋতুশ্রেষ্ঠ শরৎ। আবার সংস্কৃত শরৎ ও পারসীক 'র্থদ' শব্দ বৎসর অর্থে সমার্থক ।

দূর হোক দেবতার ক্রোধ,
দূর হোক পরস্পরের দ্বেষ,
জ্যেষ্ঠ হোক কনিষ্ঠের অনুগামী।
এক পথ, এক আশা জাগাক কর্মের প্রেরণা,
তোমরা হও সমানব্রত, মধুরভাষী,
তোমাদের গৃহে গৃহে জাগাব সৌমনস্য।...
এক হোক পানপাত্র, এক হোক অন্নভাগ,
সমান ব্রতে নিয়োগ করি তোমাদের,
রথচক্রের সহযোগী শলাকাদের মতো
গার্হস্থ্য দেব অগ্নির উপাসনায় মুখরিত হও[১]।
—এই ঐক্যমন্ত্রের ব্রতে ঘটবে সংগমন,
তোমরা হবে পরস্পরের সহধর্মী, সহমর্মী;
স্বর্গলোকে দেবগণ এই ঐক্যমন্ত্রে নন্দিত,
তাঁরা যেমন রক্ষা করেন দৈব অমৃত—
সায়ং ও প্রাত তোমরাও রক্ষা করো প্রীতি আর ভালোবাসা।

১। সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ
অন্যো অন্যমভি হর্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা।
অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো, মাতা ভবতু সংমনাঃ
জায়া পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শান্তিবাম্।
মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্, মা স্বসারমুত স্বসা
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদতু ভদ্রয়া।
যেন দেবা ন বিয়ন্তি নো চ বিদ্বিষতে মিথঃ
তৎ কৃণ্মো ব্রহ্ম বো গৃহে সংজ্ঞানং পুরুষেভ্যঃ।
সমানী প্রপা, সহ বোঽন্নভাগঃ, সমানে যোক্ত্রে, সহ বো যুনজ্মি
সম্যঞ্চোঽগ্নিং সপর্যতারা নাভিমিবাভিতঃ।

রাত্রি

[১০।১২৭]

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে কবি কুশিক আটটি মন্ত্রে রাত্রির স্তুতি রচনা করেছেন। 'আকাশ-কন্যা' 'উষা-ভগিনী' রাত্রি যে রূপে মানুষের দেহের ক্লান্তি দূর ক'রে, আরণ্য প্রাণীর হিংস্রতা থেকে বরাভয় দিয়ে প্রতিদিন শুভ প্রাতের সূচনা করে—তারই আদিম ও অকৃত্রিম ভাবনা আলোচ্য সূক্তে প্রতিফলিত ঃ

চতুর্দিকে রাত্রির বিস্তার
সুন্দর উদ্বেল করে নক্ষত্র ফুটিয়ে।
দিব্য রাত্রি, বিস্তরণে তার
ঊর্ধ্বে অধে আচ্ছন্ন সকল।
আলোক কিরণে ভাঙে অন্ধকার।
রাত্রি টানে আলিঙ্গনে
সোদরপ্রতিমা উষা,
তাপসী স্খলিত হয়।
নীড়ে ফেরা ক্লান্ত বিহগের মতো
শর্বরী নিলয়ে আমরাও বলি—
রাত্রি! হও শুভদাত্রী।

স্তব্ধ গ্রাম,
পদাতিক পক্ষী দ্রুতগামী শ্যেন—
সব স্তব্ধ, শয়নে বিলীন।
পুরুষ ও নারী নেকড়েকে
আমাদের সান্নিধ্যের থেকে
দূরে রাখ ; তস্করও যাও।
রাত্রি। হও সুকল্যাণময়ী।

কৃষ্ণ তমঃ দীপ্র বিকশিত,
ঋণ শোধ যেন ;
তিমির বিদগ্ধ ক'রে হেসে ওঠো উষা।
আকাশ-তনয়া ধেনু-রাত্রি !
হও অপসৃত, ধরো স্তব সমর্পণ[১]।

পর্জন্য-বন্দনা

কবি ভৌম

[ঋগ্‌বেদ ৫।৮৩]

ওগো স্তোতা !
প্রার্থনা জানাও দেব পর্জন্যের কছে,—
স্তোত্র দিয়ে স্তব করো,
হব্য দিয়ে পরিচর্যা করো।
স্তনিত-গম্ভীর দাতা মেঘ ;—
বৃক্ষ-লতা-তৃণ-গুল্ম হয় গর্ভবতী,
হে বারিদ, তোমার জলসেকে।
আবার কখনো বা জীর্ণ হয় তরুদল,
অত্যাচারী রাক্ষসও হয় মৃতপ্রাণ,
নিখিল ভুবন ভয়ে ভীত তোমার ;
তুমি নাশ করো দুষ্কৃতকে,
শান্ত জীবনে হঠাৎ জাগাও উদ্বেগ !

১। উপ মা পেপিশত্তমঃ / কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত:
উষ ঋণেব যাতয় ॥
উপ তে গা ইবাকরং / বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥

হে পর্জন্য !
বিদ্যুৎ-চাবুকে ছুটাও জলদ মেঘ—
কশাঘাতে দ্রুতগামী তুরঙ্গের মতো,
দুরন্ত মেঘের ডাকে আকাশ কাঁপে—
মনে হয় দূর থেকে যেন সিংহের গর্জন[১] !
হে দেবতা !
পৃথিবীর গর্ভে যবে রেতঃসেক করো—
বায়ু বহে, বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়,
ওষধিরা নবাঙ্কুরে হাসে,
সারা আকাশ প্রাণরসে বিগলিত ;
ওগো পর্জন্য !
তোমারই ব্রতে আনতা হয় ধরণী,
গবাদি পশুর পরিপুষ্টি,
ফলবতী হয় ওষধি।

হে মরুদ্-দেবতার দল !
অন্তরিক্ষ থেকে বৃষ্টি দাও,
নামিয়ে আন পৃথিবীর বুকে
আকাশ-ছাওয়া বর্ষুক মেঘের পুঞ্জ ;
তুমি জলদায়ী দেব, আমাদের পিতা,
গর্জনকারী মেঘের সঙ্গে
এসো আমাদের মর্ত-গৃহে ;
গর্জন করো, হুংকার ছাড়,
তুমি মেঘরথে আকাশচারী—
বারি-বীর্যে ওষধিকে করো গর্ভবতী।

১। রথীব কশয়াশ্বাঁ। অভিক্ষিপন্ / আবির্দূতান্ কৃণুতে বর্ষ্যাঁ অহ।
দূরাৎ সিংহস্য স্তনথা উদীরতে / যৎ পর্জন্যঃ কৃণুতে বর্ষ্যং নভঃ॥

জলভরা কালো মেঘ যেন বিশাল চর্মপেটিকা,
তার বাঁধন খুলে দাও,
উচ্চাবচ হোক সমতল।
ওগো দেবতা!
মহান কোশের মতো মেঘ,
তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরো আজ,
পৃথিবীতে নামুক বরষা,
তটিনীরা হোক বেগবতী,
স্বর্গ-মর্ত হোক রসসিক্ত,
ধেনুরা বাঁচুক তোমার পানীয়ে।
তুমি এসে দূর ক'রে দিলে
জলশূন্য পাপিষ্ঠ মেঘের ভার,
নিখিল ভুবন হোল আমোদিত।

হে পর্জন্য!
তুমি তো অনেক জল দিলে,
ঊষর মরুকে করলে সুগম,
মানবের ভোগে জন্ম দিলে খাদ্য-শস্য;
জীবলোক তোমার প্রশংসায় হোল মুখর।
এবার বৃষ্টি থামাও।

অরণ্যানী

ঋগবেদের দশম মণ্ডলে ১৪৬ সূক্তে কবি দেবমুনি অরণ্যানীর বন্দনা করেছেন ঃ

অরণ্যানী! ওগো অরণ্যানী!
দেখতে দেখতে তুমি অন্তর্হিত হয়ে যাও
সীমাহীনতার মধ্যে;

কোথায় তোমার শেষ ?
আপনাতে আত্মস্থ তুমি জিজ্ঞাসা কর না গ্রামের পথ ;
একলা থাকতে কি ভয় করে না তোমার ?
বিচিত্র তোমার মায়ারাজ্য !
মনে হয় কোথাও যেন বৃষের শব্দ ;
আবার মনে হয়
কোথাও যেন চিঁচিঁ শব্দে আসছে তার উত্তর ;
বীণাযন্ত্রের ঘাটে ঘাটে সুর তুলে
যেন গাওয়া হচ্ছে গান !
আলো আর ছায়ায় বিচিত্রিত
অদ্ভুত তোমার মায়ারাজ্য !
মনে হয় কোথাও যেন গরুর পাল চরছে ;
কোথাও যেন দেখা যাচ্ছে একটি অট্টালিকা ;
সন্ধ্যাবেলা মনে হয়
অরণ্য থেকে বেরিয়ে আসছে কত শকট—
মায়াশকট তারা[১] ।
মনে হয় কে যেন তার হারানো গাভীকে ডাকছে
দূরাহ্বানের সুরে ;
মনে হয় কে যেন কোথায় কাঠ কাটছে ;
মনে হয় কে যেন কোথায় চীৎকার করে উঠল ।

এই অরণ্যানী কাউকে হনন করে না ;
ভয় শুধু এখানে বন্য পশুর ;
মানুষ এখানে বনের সুস্বাদু ফল খেয়ে বেঁচে থাকে স্বচ্ছন্দে ।
মৃগনাভীর ন্যায় গন্ধভরা এই অরণ্যানী !

১। **উত গাব ইবাদন্তি / উত বেশ্মেব দৃশ্যতে /**
উতো অরণ্যানিঃ সায়ং / শকটীরির সর্জতি ॥

অন্ন এখানে বহু ;
নিত্য যারা ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করে
সেই লোভী কৃষকদের দল নেই এখানে।
মৃগকুলের মাতৃস্বরূপা এই অরণ্যানী ;
হে অরণ্যানী ! গ্রহণ করো আমার এই স্তবগান।

পুরূরবা-উর্বশীর প্রণয়-সংলাপ

প্রস্তাবনা ঃ ঋগ্‌বেদে পুরূরবা-উর্বশীর সংবাদসূক্ত (১০।৯৫) সম্ভবত বিশ্বসাহিত্যের প্রাচীনতম রোমান্টিক প্রেমকাহিনী। বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এ কাহিনী নব নব রূপান্তর ও আদর্শের মধ্যে পরিণতি লাভ করেছে।

স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী মর্তের রাজা পুরূরবার প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধা হলেন ; স্বয়ং প্রেম নিবেদন ক'রে স্বয়ংবৃতা হলেন নৃপতির কাছে। দেবেন্দ্রবাঞ্ছিতা সুরললনাকে পেয়ে রাজার জীবন ধন্য হয়ে উঠল। অপ্সরার গর্ভে এল প্রথম সন্তান ; যথাকালে পুত্রের জন্ম হলে নব জাতককে রাজার হাতে অর্পণ ক'রে উর্বশী বিদায় চাইলেন। কিন্তু উর্বশীর বিচ্ছেদ পুরূরবার কাছে অকল্পনীয়, অপ্সরাহীন জীবন তাঁর কাছে মৃত্যুর তুল্য। তবু শত অনুরোধ, এমন কি আত্মহত্যার সংকল্পকেও উপেক্ষা ক'রে অকরুণা অপ্সরা ফিরে যাচ্ছে অমরাবতীতে আপন আলয়ে ; বিরহাতুর রাজা চলেছেন তাকে অনুসরণ ক'রে— মুখে অনুরাগের নির্ঝরিণী বাণী। দয়িত-দয়িতার প্রেম-সংলাপ আঠারটি কবিতায় রচিত।

পুরূরবা-উর্বশী সনাতন মানব-মানবীর ভাবমূর্তি ; অপ্সরা উর্বশী মানবীয় কামকল্পের মূর্তিময়ী বাণী। কিন্তু সে শুধু ইন্দ্রিয়বহ্নির দাবদাহই নয়, প্রেমের সৌন্দর্য ও লীলার প্রতীক, 'অনন্তযৌবনা' 'চিরন্তনী সৌন্দর্যপ্রতিমা' 'নন্দনবাসিনী বিশ্ব-বাসনা'।

পুরূরবা ঃ মানিনী জায়া, ওগো নিঠুরা, দাঁড়াও ক্ষণিক,
দুটি কথা কই দুজনে মিলে।
আমাদের গোপন কথা না হলে বলা
ভবিষ্যতে মিলবে না তো সুখ[১]।

উর্বশী ঃ তোমার এ-কথা শুনে কি করব আমি!
এসেছি চলে অগ্রগামিনী উষার মতো ;
পুরূরবা! আবার ফিরে যাও ঘরে,
আমি যে হলেম অধরা বায়ু!

পুরূরবা ঃ তীর স্তব্ধ তূণে, যুদ্ধে ঘটে নি তাই জয়শ্রী,
দৌড়-প্রতিযোগিতায় না পেলাম হাজার গাভী,
বীরহীন রাজকর্মে না হোল সমৃদ্ধি ;
তবে মানবসঙ্গিনীরা তো এ-আহ্বান বুঝবে
—যেমন মেষী বোঝে মেষের ডাক।
ওগো উষাদেবী! সেই উর্বশী শ্বশুরকে আহার দিতে গিয়ে
অন্তর্গৃহ থেকে শয়ন গৃহে প্রবেশ করত ;
সেখানে দিবারাত্র থাকত প্রণয়ীর সান্নিধ্যে,
আর অনুভব করত নিশ্চিন্ত রতিসুখ।

উর্বশী ঃ প্রতিদিন আমায় 'চাবুক' মারতে তিনবার,
প্রীত করতে—যদিও থাকতাম অকামা।
পুরূরবা, যখন এসেছিলেম তোমার ঘরে,
ওগো বীর, তুমি ছিলে আমার দেহের রাজা।

পুরূরবা ঃ সুজূর্ণি, শ্রেণি, সুম্নআপি, হ্রদেচক্ষু সখীরা—
তাদেরই সাথে বিচরণশীলা সে এসেছিল ;
সালংকারা অরুণবরণী তারা অপসৃত হোল না,
কাঁদলো না ঘরের জন্য—উচ্চকণ্ঠ গাভীর মতো।

১। 'হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে / বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈ নু /
ন নৌ মন্ত্রা অনুদিতাস এতে / ময়স্করন্ পরতরে চনাহন্ ॥'

উর্বশী : তুমি যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হ'লে—
দেব-পত্নীরাও এসে উপস্থিত হয়েছিলেন,
স্বেচ্ছাগতি তটিনীরা তোমায় পুষ্ট করেছিল,
দেবতারা তোমায় পালন করেছিলেন—
দস্যুহনন আর মহৎ সংগ্রামের জন্য।

পুরূরবা : পোষাক ছেড়ে তারা বিবসনা হ'লে—
অমানুষীদের ভোগ করেছিলাম মানুষ আমি ;
রজ্জুবদ্ধ রথাশ্বের মতো এস্ত তারা
তখনি রূপ ছেড়ে হারিয়ে যেত অরূপে।

উর্বশী : মর্তের রাজা স্বর্গকন্যাদের প্রণয়াসক্ত হলে
চাতুরী ক'রে সঙ্গিনীদের দেহ নিয়ে খেলা করে ;
দেবতনয়ারা রাজহংসীর মতো তনুর শোভা ছড়ায়
—যেমন দুরন্ত ঘোড়া লাগাম কামড়ায় !

পুরূরবা : আমার সিক্ত কামনা পূর্ণতায় ভরিয়ে সে শোভা পেত
আকাশ-হতে-নেমে-আসা বিদ্যুতের মতো,
মানুষের তেজে জন্ম নিল তার সার্থক সন্তান ;
উর্বশী তাঁকে দীর্ঘজীবী করুক !

উর্বশী : পৃথিবী-পালনের জন্যই তো এমন সন্তানের জন্ম ;
তাই ওগো পুরূরবা ! আমায় ধারণ করালে তেজ।
চতুরা আমি, সর্বদা পরামর্শ দিতাম,
শোনো নি, এখন প্রলাপে কি কাজ ?

পুরূরবা : পুত্র জন্ম নিয়ে কবেই বা দেখতে চায় পিতাকে ?
কিন্তু যখন জানবে মা নেই—ফেলবে চোখের জল।
যতক্ষণ শ্বশুরকুলে যজ্ঞের আগুন দীপ্যমান,
কেই বা চায় অভিন্নহৃদয় দম্পতীর বিচ্ছেদ !

উর্বশী : ছেলের চোখের জল দেখলে তাকে সান্ত্বনা দিও,
তার কান্না তো তারই মঙ্গল আনবে।
যা আছে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবো তোমাকে ;
ফিরে যাও ঘরে, নির্বোধ তুমি, পাওনি আমায়।

পুরূরবা : তবে আজ মহান পুরূরবা ঝাঁপ দিক উন্মুক্ত গহ্বরে,
হারিয়ে যাক দূর হতে দূরতম দেশে।
কিম্বা শয়ন করুক মৃত্যুর কোলে,
নয়তো তাকে ভক্ষণ করুক হিংস্র নেকড়েরা[১] !

উর্বশী : ওগো পুরূরবা ! আত্মহত্যা কোরো না,
হিংস্র নেকড়ের মুখে দিও না নিজেকে।
নারীর অন্তরে নেই প্রেম-ভালোবাসা,
হায়েনার মতো হৃদয় তাদের[২] !
স্বর্গের অপ্সরা মর্ত্য মানবীর রূপ ধরে অনেক ঘুরেছি,
চার বছর ধরে কেটেছে কতো সুখের রাত,
সারাদিন ভরে আহার ছিল এক ফোঁটা ঘি,
আমি তো তাই নিয়ে পরিতৃপ্তা ছিলাম তোমারই সাথে।

পুরূরবা : অন্তরিক্ষের রজোলোকে চলে যায় দীপ্তিময়ী উর্বশী ;
আমি ধীর-শান্ত পুরূরবা তাকে এই বলে যাই
'আমার পুণ্য সঞ্চয়ের সব ফল তোমারই হোক,

১। সুদেবো অদ্য প্রপতেদ্ অনাবৃৎ
পরাবতং পরমাং গন্তবা উ।
অধা শয়ীত নিঋতেরুপস্থে
অধৈনং বৃকা রভসাসো অদ্যুঃ ॥

২। পুরূরবো মা মৃথা মা প্র পপ্তো
মা ত্বা বৃকাসো অশিবাস উ ক্ষন্।
ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি
সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা ॥

এসো ফিরে, হৃদয় আজও ব্যথায় কাঁদে।'

*   *   *

দেবতারা বললেন: 'হে ইলাপুত্র পুরূরবা!
এমনি ক'রেই তুমি হবে মরণজয়ী।
হব্য দিয়ে দেবগণের স্তুতি করে,
তুমিও আমোদিত হবে স্বর্গলাভে॥'

বিশ্বামিত্র-শতদ্রু-বিপাশা-সংলাপ

ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের তেত্রিশ সূক্তে তেরটি মন্ত্রে এই সংলাপ বিধৃত। বিশ্বামিত্র ছিলেন ভারতদের পুরোহিত। ভারত, মৎস্য, অনু প্রভৃতি দশটি জাতি সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিল; শতদ্রু ও বিপাশা নদীর তীরে পৌঁছাতেই যোদ্ধাদের গতি রুদ্ধ হোল—তখন ধীমান বিশ্বামিত্র উভয়েব স্তুতি রচনা করলেন কয়েকটি কবিতায়। তৎকালে নদীদ্বয় শুতুদ্রু ও বিপাশ্ নামেই পরিচিত ছিল। বিশ্বামিত্রের স্তবে প্রীত হয়ে নদীদ্বয় আপন আপন স্রোতোবেগ রুদ্ধ করলে সেনাদল অবলীলায় পার হয়ে গেল।

বিশ্বামিত্র: মন্দুরাবিমুক্ত মত্ত অশ্বীদ্বয় যথা,
অকস্মাৎ প্রাণের নিরুদ্ধ চঞ্চলতা
দুরন্ত গতির মাঝে প্রকাশ করিয়া,
অব্যক্ত আনন্দবেগে হৃদয় ভরিয়া
ছুটে চলে লক্ষ্যহীন অজানা উদ্দেশে;
সেইমত, পর্বতের উৎসঙ্গ প্রদেশে
জন্ম লভি শুতুদ্রী বিপাশ দুই নদী;
অবিশ্রান্ত ছুটিয়া চলেছে নিরবধি
তরঙ্গের তালে তালে হ'য়ে আত্মহারা,
বহি লয়ে পরিপূর্ণ সলিলের ধারা

সুদূর সমুদ্রপানে।—এই আসিয়াছি
মাতৃরূপা শুতুদ্রীর অতি কাছাকাছি,
ভাগ্যবতী বিপাশার। গোষ্ঠ ত্যাগ ক'রে
আপন কুলায় পানে দ্রুত পদ ভরে
ছুটে চলে গাভীগণ বৎস্যাভিলাষিণী
যেই মত,—এই দুই চঞ্চলা তটিনী
চলিয়াছে সেইমত এক লক্ষ্য স্থানে
মুখরিয়া দুই তীর নৃত্য-ছন্দে গানে
পূর্ণদেহা নিতম্বিনী। আশীর্বাদ মাগি
আমাদের সকলের কল্যাণের লাগি
সুমধুর স্তবগীতে। তোমার প্রসাদ
বর্ষণ করুক শীরে স্নেহ আশীর্বাদ
নিত্য দিন।

শতদ্রু-বিপাশা: উত্তুঙ্গ পর্বতশীর্ষ হ'তে
ইন্দ্রের করুণাধারা বহি খরস্রোতে,
চঞ্চল তরঙ্গ-তাল-নৃত্যের ভঙ্গীতে,
লক্ষ মুখে কুলুকুলু ধ্বনির সঙ্গীতে
তরল আনন্দবেগে,—চন্দ্রকরে হেসে
চলিয়াছি দেবকৃত অতিদূর দেশে
আপন বল্লভ পানে। এই স্রোতোধার
নিবারণ করি হেন সাধ্য নাহি আর
শুনিতে মধুর স্তুতি। এই বিপ্রবর
তবু কেন দাঁড়াইয়া জুড়ি দুই কর
গাহিতেছে সমস্বরে হেন স্তুতি গান?

বিশ্বামিত্র: আমি বিশ্বামিত্র ঋষি কৌশিক সন্তান
গাহিতেছি স্তবগাথা। অয়ি নৃত্যশীলা
পর্বত-নন্দিনীদ্বয়! হে পূর্ণ-সলিলা!

অগ্নিহোতৃগণ যেই শ্রদ্ধাপ্লুত স্বরে
স্তব গাহি ইষ্টলাগি সোমযাগ করে,
আমি সেই উদাত্ত গম্ভীর মন্ত্রগানে
করিব তোমার স্তুতি অচঞ্চল প্রাণে
ভক্তিভরে, শুন তাহা, অয়ি স্রোতঃস্বতী !
ক্ষণকাল অবরুদ্ধ করি তব গতি—
অনন্ত নৃত্যের ছন্দ কুলুকুলু রব,
প্রসন্ন নয়নে থাকি সহাস্য নীরব ।

শতদ্রু-বিপাশা : কেন অনুরোধ ওহে বৃদ্ধ বিপ্রবর !
জান না কি চিরকাল—মোরা নিরন্তর
চঞ্চলা তরঙ্গময়ী ? এই স্রোতোধার-
রোধকারী বৃত্রাসুরে করিয়া সংহার
বজ্রহস্ত দ্যুতিমান ত্রিভুবন-পতি
করেছেন নিরূপণ আমাদের গতি
দুই তটরেখামাঝে ।

বিশ্বামিত্র : মহা শক্তিধর,
আপন বীর্যের 'পরে করিয়া নির্ভর
বিদীর্ণ করিয়াছিল যেই আশীবিষে
মেঘপতি, সেই বজ্রী ইন্দ্রের আশিসে
করিতেছে মেঘমালা বারি বরিষণ,
তটিনী সলিলধারা করিছে বহন
স্রোতোবেগে । সর্বরোধী মহাদম্ভকারী
যজ্ঞনাশী আত্মঘাতী অসুর দেবারি,
যে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ধরাশায়ী রয়,
সেই ইন্দ্র অবশ্যই স্তুতিযোগ্য হয়,
আজ্ঞা তাঁর শিরোধার্য ।

শতদ্রু-বিপাশা : ওগো মহামুনি !

তোমার উদাত্ত কণ্ঠে ইন্দ্র স্তুতি শুনি,
আনন্দে ভরিল চিত্ত। যেও না ভুলিয়া,
শ্রদ্ধাবেশে হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া
গাহ সেই স্তুতি-গাথা। কল্য হ'তে যবে
অগ্নিতে আহুতি দিবে—উচ্চ কণ্ঠ রবে
মন্ত্র রচি, সেই সুগম্ভীর পরিবেশে
সমর্পিও হোমাহুতি মোদের উদ্দেশে
হোমকুণ্ডে। নিবেদিয়া ভক্তি নমস্কার
অই ঋষি! চলি মোরা; করিও না আর
সকাতর অনুরোধ,—পুরুষের মত
কোর না প্রগল্ভা দোঁহে।

বিশ্বামিত্র ঃ হে ভগিনীভূত
নৃত্যপরা তরঙ্গিনী! করহ শ্রবণ
আমার প্রার্থনাবাণী। করিতে গমন
পরপারে আসিয়াছি দূরদেশ হ'তে
শীঘ্রগামী তুরঙ্গ যুজিয়া নিজ রথে
রয়েছি দাঁড়ায়ে তীরে। নম্র-নত হ'য়ে
অক্লান্ত সলিলবহ স্রোতোধারা ল'য়ে
হও ক্ষীণা; চলে যাই ওই পরপার।

শতদ্রু-বিপাশা ঃ হে ব্রাহ্মণ! শুনিলাম আমরা তোমার
সকাতর অনুরোধ। ক্রোড়মাঝে লয়ে
মা যেমন সন্তানেরে অনবত হ'য়ে
স্তন্য দেয় স্নেহভরে,—মোরা সেইমত
তোমা লাগি হইলাম ক্ষীণ অবনত,
চলে যাও পরপারে[১]।

১। আ তে কারো শৃণবামা বচাংসি / যযাথ দূরাদনসা রথেন /
নি তে নংসৈ পীপ্যানেব যোষা / মর্যাযেব কন্যা শশ্বচৈ তে ॥

বিশ্বামিত্র ঃ অসীম কৃপায়
অয়ি মাতঃ! নিরাতঙ্কে পার হ'য়ে যায়
ভরতবংশীয়গণ। হে অনিন্দ্যনীয়া,
এই করুণার বার্তা ছন্দে বিরচিয়া
সর্বত্র বেড়াব গাহি। কর আশীর্বাদ
তব বক্ষে যেন কভু না ঘটে প্রমাদ।

জনৈক জুয়াড়ীর আত্মচরিত

কবি কবষ

[ঋগ্‌বেদ ১০।৩৪]

বড় বড় পাশাগুলি ছকের উপর কেবলি ঘুরতে থাকে,
তারা আমায় আনন্দে মাতাল মাতাল ক'রে তোলে;
বয়ডা কাঠের তৈরি পাশা কেমন চটপটে!
মুজবৎ পাহাড়ের মিষ্টি সোম যেমন মাতিয়ে রাখে
—তেমনি করেই আমায় মাতিয়ে তোলে পাশা।
জুয়াড়ী ব'লে সুন্দরী বউ আমায় অবহেলা করে নি,
সবান্ধব আমাকে কতো আদর আপ্যায়ন করতো;
কিন্তু হায়! জুয়ার নেশায় মত্ত হ'য়ে দিনেরাতে
সতীসাধ্বী ঘরণীকে কতো গঞ্জনা দিয়েছি।
জুয়াড়ীকে শাশুড়ী গালমন্দ করে, বউ তিরস্কার করে,
দুর্ভাগ্যের দিনে সাহায্য করবে—এমন কেউ জোটে না!
বুড়ো ঘোড়ার যেমন খদ্দের মেলা ভার—

নদীদ্বয় ঃ ওগো স্তোতা! তোমার অনুরোধ আমরা শুনেছি; তুমি তো দূরের পথিক, তাই রথ আর শকট নিয়ে পার হয়ে যাও। সন্তানকে স্তন্য দেওয়ার জন্য মা যেমন, অথবা পুরুষকে আলিঙ্গন করার জন্য নারী যেমন অবনত হয়—তোমাদের জন্য আমরাও তেমনি নত হয়েছি।

তেমনি জুয়াড়ীরও নেই কোথাও কদর[১]।
সর্বনাশা পাশার চোখ পড়েছে যার ধনে,—
তার স্ত্রীকেও টানাটানি করে পাঁচজনে ;
মা-বাবা-ভাই সবাই নির্দয় হ'য়ে বলে,
'ওকে চিনি না আমরা, বেঁধে নিয়ে যাও[২]।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি কখ্‌খনো খেলব না পাশা,
তাই জুয়াড়ী সঙ্গীদের সর্বদা এড়িয়ে চলি।
হায়! তামাটে রঙের পাশা ছকের উপর শব্দ করে,—
আমিও আড্ডায় ছুটি, যেন ব্যভিচারিণী চলেছে নাগরের ঘরে।
ঝকঝকে পোশাকে সেজে আড্ডায় আসে জুয়াড়ী,
আস্ফালন করে 'কে আছিস খেলোয়াড়? হারিয়ে দেব।'
কি ভাগ্য! পাশাগুলো শুধু পয়মন্ত দান ফেলে,
আর জুয়াড়ীর মনস্কামনা পূরণ করে।
পাশা জুয়াড়ীকে গাঁথে, বিদ্ধ করে, বঞ্চনা করে, দগ্ধ করে,
কখনো প্রতিদ্বন্দ্বীকেও দেহমনে পুড়িয়ে মারে ;
বিজয়ীর কাছে পাশার দান—যেন পুত্রজন্মের আনন্দ,
আবার পরাজিতের কাছে সর্বহারক যম!
পাশাগুলো ছকের উপর ওঠে আর নামে ;
হাত নেই—অথচ হস্তবানেরা হার মানে।
ছকে সাজানো পাশা যেন স্বর্গীয় অঙ্গার!
—কতো শীতলস্পর্শ! তবু হৃদয় দহন করে।
তিপান্ন-ঘুঁটি পাশার দল ছকের উপর খেলা করে,

১। দ্বেষ্টি শ্বশ্রূরপ জায়া রুণদ্ধি / ন নাথিতো বিন্দতে মর্ডিতারম্ /
অশ্বস্যেব জরতো বস্ন্যস্য / নাহং বিন্দামি কিতবস্য ভোগম্ ॥
২। অন্যে জায়াং পরি মৃশন্ত্যস্য / যস্যাগৃধদ্ বেদনে বাজ্যক্ষঃ /
পিতা মাতা ভ্রাতর এনমাহুর্ / ন জানীমো নয়তা বদ্ধমেতম্ ॥

পাশা যেন সত্যপালক সূর্যদেব।
উগ্র বা ভয়ানক—কারো মেজাজের পরোয়া নেই ;
রাজা-মহারাজও তাকে প্রণাম জানায়।
জুয়াড়ীর অভাগিনী বউ অভাবের জ্বালায় কষ্ট পায় !
মা ভেবে মরে : ছেলে কোথায় ঘুরে বেড়ায় !
সে তখন ঋণের ভয়ে পালিয়ে উধাও,
আর রাত্রিবেলা হানা দেয়। পরের বাড়ীতে
যখন দেখে অন্যের সাধ্বী স্ত্রী, সুন্দর বাসগৃহ—
তখন নিজের স্ত্রীকে দেখে মনে মনে কি কষ্ট !
সকালে যে লালঘোড়ায় টানা জুড়িগাড়ীতে বেড়িয়েছে,
জুয়ায় সর্বস্বান্ত সে রাত্রিতে শীতের ভয়ে আগুন পোহায়।
হে পাশা ! যিনি তোমাদের বিরাট দলের নায়ক,
যিনি তোমাদের দলের প্রথম রাজা—
তাঁর উদ্দেশে দশ আঙুল এক ক'রে প্রণাম করছি,
আর শপথ করছি, জুয়োতে দান ধরবো না।

ওহে জুয়াড়ী ! পাশাখেলা ছাড়, কৃষিকাজ করো,
তার আয়েই খুশী হও, নিজেকে ধন্য মনে করো,
কৃষিতেই হবে গাভীলাভ আর পত্নীলাভ ;
মহান সবিতা অমায় দিয়েছেন এই উপদেশ[১]।
হে পাশা ! আমাদের বন্ধু হও, কল্যাণ করো ;
অসহ্য অভিচারে মোহমুগ্ধ কোরো না।
সব কোপ আমাদের শত্রুদের উপর পড়ুক,
পিঙ্গল পাশার বন্ধনে আবদ্ধ হোক ধূর্তেরা।

১। অক্ষৈর্মা দীব্যঃ, কৃষিমিৎ কৃষস্ব / বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ /
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া / তন্মে বি চষ্টে সবিতায়মর্যঃ ॥

উপনিষদ্

এক

যিনি অগ্নিতে যিনি জলে,
যিনি সকল ভুবন তলে,
যিনি বৃক্ষে যিনি শস্যে,
তাঁহারে নমস্কার—
তাঁরে নমি নমি বারবার।
যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে
পৃথিবী আকাশ তারা,
যাঁ হতে আমার অন্তরে আসে
বুদ্ধি চেতনাধারা—
তাঁরি পূজনীয় অসীম শক্তি
ধ্যান করি আমি লইয়া ভক্তি।
সত্য রূপেতে আছেন সকল ঠাঁই,
জ্ঞানরূপে তাঁর কিছু অগোচর নাই,
দেশে কালে তিনি অন্তহীন অগম্য—
তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ব্রহ্ম।
তাঁরই আনন্দ দিকে দিকে দেশে দেশে দেশে
প্রকাশ পেতেছে কত রূপে, কত বেশে—
তিনি প্রশান্ত, তিনি কল্যাণহেতু,
তিনি এক, তিনি সবার মিলনসেতু।

দুই

[ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৪. ৪.]

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললেন,
'ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করব, কী গোত্র আমার?'
তিনি বললেন, 'জানি নে, তাত, কী গোত্র তুমি।

যৌবনে বহুপরিচর্যাকালে তোমাকে পেয়েছি,
তাই জানি নে তোমার গোত্র।
জবালা আমার নাম, তোমার নাম সত্যকাম,
তাই বোলো তুমি সত্যকাম জাবাল।'

সত্যকাম বললেন হারিদ্রুমত গৌতমকে,
'ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মচর্যে উপনীত করুন।'
তিনি বললেন, 'সৌম্য, কী গোত্র তুমি?'
সে বললে, 'আমি তা জানি নে।
মাকে জিজ্ঞাসা করেছি আমাব গোত্র কী।
তিনি বলেছেন—যৌবনে যখন বহুপবিচারিণী ছিলেম
তোমাকে পেয়েছি।
আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম,
বোলো আমি সত্যকাম জাবাল।'

তিনি তখন বললেন, 'এমন কথা অব্রাহ্মণ বলতে পাবে না।
সত্য থেকে নেমে যাওনি তুমি।
সমিধ্ আহরণ কর সৌম্য, তোমাকে উপনীত করি[১]।'

১। স হ হারিদ্রুমতং গৌতমম্ এত্য উবাচ—'ব্রহ্মচর্যং ভগবতি বৎস্যামি, উপেয়াম্ ভগবন্তম্।' তং হ উবাচ—'কিং গোত্রো নু সৌম্য অসি?' স হ উবাচ—"নাহম্ এতদ্ বেদ ভো যদ্‌গোত্রঃ অহমস্মি। অপৃচ্ছং মাতরং, সা মা প্রত্যব্রবীদ্—'বহু অহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বাম্ অলভে; সা অহম্ এতৎ ন বেদ যদ্‌গোত্রঃ ত্বমসি। জবালা তু নাম অহমস্মি, সত্যকামো নাম ত্বমসি।' সোঽহং সত্যকামো জাবালোঽস্মি।" তং হ উবাচ—'ন এতদ্ অব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি; সমিধং সৌম্য আহর, উপ ত্বা নেষ্যে, ন সত্যাৎ অগাঃ।' ইতি

তিন

পূর্ণ সেই, পূর্ণ এই
পূর্ণ হ'তে পরিপূর্ণ জাগে ;
পূর্ণ যাহা পূর্ণ থাকে
পূর্ণ হ'তে পূর্ণের বিয়োগে[১] ।

চার

স্বর্ণপাত্রে ঢাকা সত্যের মুখ,
হে দেব পূষন্
খোলো আবরণ,
সত্য-ধর্ম হোক জাগরূক[২] ।

পাঁচ

গুরু-শিষ্যের প্রার্থনা
[তৈত্তিরীয় ২।১।২]

হে পরম ঈশ্বর !
রক্ষা করো আমাদের উভয়কে,—
অধ্যাপয়িতা ও অধ্যেতাকে ;
ভোগ করাও লব্ধ বিদ্যা ও জ্ঞানের পূর্ণ ফল,
সমবীর্যে করো বলীয়ান ;
দাও অধীত বিদ্যার সঞ্জীবনী তেজ,
দূর হোক পরস্পরের বিদ্বেষ-কলুষ,
দাও আমাদের ত্রিবিধ শান্তি ।

১। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং / পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে /
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় / পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
২। হিরন্ময়েন পাত্রেণ / সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ /
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু / সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥

ছয়

[তৈত্তিরীয় ১।৪।১, ২]

বিশ্বরূপ ওঙ্কার—
তিনি মহান জ্ঞান-ঋষভ,
অমৃত বেদ হ'তে তাঁর আবির্ভাব,—
সেই পরম ইন্দ্রের মেধায় আমি হবো তৃপ্ত।
হে দেব, হে দীপ্তিমান—
আমায় করো অমৃতের আধার ;
আমার তনু হবে বিচক্ষণ,
জিহ্বা হবে মধুমত্তমা,
শ্রুতি হবে আনন্দধারা।
হে প্রাজ্ঞ !
তুমি পরমাত্মার মধু-কোশ,
তুমি প্রজ্ঞার আবরণে আবৃত,
আমার সর্ববিদ্যা হোক পূর্ণ সফল[১]।
মহান ওঙ্কার—
তুমি দান করো, বর্ধন করো—
আমার অন্ন বস্ত্র পানীয়,
আমার গো-সম্পদ,
লোমশপশু-সমাবৃতা লক্ষ্মী,
বিধান করো চির-শ্রী ;
জানাই তোমাকে প্রণতি[২]।

১। শরীরং মে বিচর্ষণম্ / জিহ্বা মে মধুমত্তমা / কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্/ ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ / শ্রুতং মে গোপায়।

২। আবহন্তী বিতন্বানা / কুর্বাণা অচীরমাত্মনঃ / বাসাংসি মম গাবশ্চ / অন্নপানে চ সর্বদা / ততো মে শ্রিয়মাবহ / লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা।

সাত

[তৈত্তিরীয় ১।১০]

আমি সংসার-বৃক্ষের প্রেরয়িতা,
আমি পর্বত-শৃঙ্গের মতো কীর্তিমান,
আমি ঊর্ধ্বলোকের মতো পবিত্র,
আমি দেব সবিতার মতো অমৃত-আনন্দ,
আমি দীপ্তিমান সম্পদ্,
আমি অমৃতরস-স্নাত সুমেধা।

আট

[ঈশ ৯, ১৬]

জ্ঞানহীন কর্ম যার সে যায় আঁধারে,
কর্মহীন জ্ঞানে যায় আরও অন্ধকারে।

তুমি নিয়ন্তা সকল কালের
হে পূষণ, তুমি একা।
সংহর তব রুদ্র রশ্মি
শিবরূপ দিক দেখা।
তব অন্তরে যে প্রাণপুরুষ
নিত্য একাকী জাগে
আমারো মাঝারে সেই সে পুরুষ
তোমারি আশিস্ মাগে[১]।

১। পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥

রাম-রাবণের যুদ্ধ

[রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড]

গগনং গগনাকারং, সাগরঃ সাগরোপমঃ।
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রাম-রাবণয়োরিব॥

হাসংগ্রামে সজ্জিত হলেন রাম ও রাবণ। রাক্ষসরাজ রণসাজে হস্র সূর্যের মতো তেজস্বী; সারথিকে প্রোৎসহিত ক'রে তিনি লেন: 'আজ রাম ও লক্ষণকে নিহত ক'রে মন্ত্রিবধের প্রতিশোধ আর নগর অবরোধের প্রতিকার করব। লঙ্কাপুরীতে এ যুদ্ধের মূল াম-লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব ও বানরসেনারা তার শাখা-প্রশাখা; মূল বিনষ্ট 'লে সমগ্র তরুই যেমন বিনষ্ট হয়, তেমনি আজ রাম-লক্ষ্মণকে বিনাশ ক'রে সমগ্র শত্রুকুল নিধন করব। দশাননের আদেশ শুনে সারথি মস্ত বানরসেনাদের ভীতি জাগিয়ে বিপুল উদ্যমে রথ চালনা করতে াগলেন; রথচক্রের ঘর্ঘর নিনাদে পৃথিবী কম্পিত হ'য়ে উঠল। তারপর লঙ্কাধিপতি রাবণ সবেগে রামচন্দ্রের অভিমুখে অগ্রসর হলেন; পর্বতের তুল্য বিশাল রথে আষাঢ়ের মেঘধ্বনির মতো ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে প্রকাণ্ড ধনু বেগে ঘূর্ণিত ক'রে তিনি বীর দর্পে এগিয়ে আসছেন। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যে ভীত বানরবাহিনী রণে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে রাঘবের শরণাপন্ন হোল।

রামচন্দ্র দূর থেকে রাবণকে প্রত্যক্ষ ক'রে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন: 'রাক্ষসরাজ দুরাত্মা রাবণ ভাগ্যবশে আজ আমার দৃষ্টিপথে পতিত। একে বধ ক'রে সীতাকে উদ্ধার করলেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। এই ব'লে তিনি আকর্ণ শরসন্ধান ক'রে মহোল্লাসে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। রাবণ তৎক্ষণাৎ ভল্লপ্রহারে সেই অস্ত্র ছিন্নভিন্ন করলেন। এই সুযোগে ক্রোধোদ্দীপ্ত লক্ষ্মণ জ্যাশব্দে রাক্ষসবাহিনীকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুললেন; রামানুজের এমন স্পর্ধা দেখে ক্ষিপ্ত লঙ্কেশ্বর

ধনুর্বাণ গ্রহণ ক'রে তাকে তিরস্কার ক'রে বললেন ঃ 'ওরে লক্ষ্মণ, তুই মুহূর্তেই আমার হাতে যমালয়ে যাবি। এবার শক্রপীড়নে ভয়ঙ্কর রাবণের রূপ প্রত্যক্ষ কর্। ক্রুদ্ধ পশুরাজ যেমন হাতীর রক্ত পান করে, আমিও নির্মম শরাঘাতে তোমাকে নিহত ক'রে রক্ত পান করব। তুমি প্রথমে মনের সাধে যুদ্ধ কর, তারপর আমার অস্ত্রে প্রাণ বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হও। বায়ুভরে পক্ক ফল যেমন ভূপতিত হয়, আমিও বাণ নিক্ষেপে তোমার শির ভূলুণ্ঠিত করব। দেবগণের অমৃতপানের মতো তোমার রুধির পান করব'। এই ব'লে রাক্ষসরাজ অগ্নিবর্ষী অস্ত্র ত্যাগ করলে সৌমিত্রি শরজালে তার প্রয়াস ব্যর্থ করলেন। ক্রোধে প্রজ্বলিত রাবণ বাণ নিক্ষেপ করতে করতে সহস্র শরজালে রামানুজকে আচ্ছাদিত ক'রে সুগ্রীব ও বিভীষণের দিকে অগ্রসর হলেন।

শুরু হোল রাম-রাবণের প্রাণান্তকর সংগ্রাম। রাবণের শর একে একে ব্যর্থ হ'য়ে যেতে লাগল। রামচন্দ্র অস্ত্র প্রয়োগে আরও ক্ষিপ্র হলেন। তাঁর শত-সহস্র শরে রাবণ বিদ্ধ হলেন। তখন মহাবীর দশানন তামসাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, তার তেজে দগ্ধ হোল বানরচমূ। পলায়মান বানরসেনা ও ধাবমান রাক্ষস বাহিনীর পদাঘাতে ধূলিজাল আকাশে উত্থিত হোল। লঙ্কাধিপতির উৎপীড়নে আপন সেনাদলকে ছিন্নভিন্ন দেখে রাঘব রণক্ষেত্রের অগ্রগামী হ'লে রাবণও দ্রুতবেগে রথারোহনে তার সম্মুখে ধাবিত হলেন। অগণিত বানরসেনাকে নিহত দেখে রামচন্দ্র বিপুল উৎসাহে কার্মুক গ্রহণ করলেন ; ধনুর ভয়ঙ্কর টংকারে বহু রাক্ষস-সেনা প্রাণ দিল। কিন্তু অগ্নিশিখাতুল্য শরগুলি রাবণের বাণবর্ষণের দ্বারা ব্যর্থ হোল। তারা পরস্পর পরস্পরের নৈপুণ্যকে ছাড়িয়ে যেতে লাগলেন ; দুই বীর যেন সাক্ষাৎ যম ও রুদ্র ; গগনমণ্ডল অগণিত অস্ত্রে আচ্ছন্ন—ইন্দ্র আর বৃত্রাসুরের যুদ্ধের তুল্য ভয়ানক এ যুদ্ধ !

তারপর রামচন্দ্র মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে সক্রোধে রৌদ্রাস্ত্র নিক্ষেপ

করলেন! কিন্তু রাবণের গন্ধর্বাস্ত্র প্রয়োগে তা ব্যর্থ হ'য়ে ভূতলে প্রবেশ করল। এবার ক্রোধান্ধ রাক্ষসরাজ মহামারক এক অসুরাস্ত্র প্রয়োগ করলেন; রাম তার উত্তর দিলেন পাবকাস্ত্রে। দশাননের সহস্র সহস্র শর রাঘবের অস্ত্রাঘাতে প্রতিহত হ'য়ে আকাশে বিলীন হোল। তারপর রাবণ নিক্ষেপ করলেন ময়-দানবনির্মিত মহাবল রৌদ্রাস্ত্র; তার প্রতিকারে রামচন্দ্র প্রয়োগ করলেন গন্ধর্বাস্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে রাবণ অধিকতর তেজে প্রেরণ করলেন পৈশাচ অস্ত্র আর দ্রুতগামী ভয়ঙ্কর চক্রসমূহ। যখন রাক্ষসরাজের সব অস্ত্র ব্যর্থ হোল, তখন তিনি সুরক্ষিত দশটি বাণ দিয়ে রামের মর্মস্থল বিদ্ধ করলেন; তবু অবিচল অপরাজেয় রাম অবলীলায় জলধারার মতো শর নিক্ষেপ অব্যাহত রাখলেন।

যুদ্ধের অবস্থা বিবেচনা ক'রে রাবণ মায়ার আশ্রয় গ্রহণ ক'রে রণক্ষেত্র থেকে প্রস্থান করলেন। তিনি পুনরায় নতুন উদ্যমে বজ্রতুল্য ভয়ানক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে মানস সংকল্পের তুল্য দ্রুতগামী অশ্বে বাহিত রথে রামের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। আবার রাম-রাবণের যুদ্ধ শুরু হোল। দেবতারাও স্বর্গে বলাবলি করতে লাগলেন অভূতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব এমন যুদ্ধ। স্বয়ং ইন্দ্র রামচন্দ্রের জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠ রথ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন। রাম-লক্ষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি সকলে এই ঘটনাকে রাক্ষসের ছলনা ভেবে নিপুণভাবে যাচাই করতে লাগলেন। তারপর বিভীষণ সবার সন্দেহ দূর করলে রাম ঐ রথ গ্রহণ করলেন। রাক্ষসরাজ ভীষণতম নাগাস্ত্র নিক্ষেপ করলে মহা-বিষধর নাগসমূহ রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হোল; কিন্তু তাঁর গরুড়াস্ত্রে তারা সব নিশ্চিহ্ন। রাবণের বিবিধ শরজালে আচ্ছন্ন রামচন্দ্র রাবণরূপ রাহুর করাল গ্রাসে পতিত হ'লে রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ তাঁকে প্রহারের অভিলাষে মহাশব্দে অলঙ্ঘ্য শূল ধারণ করলেন। রাবণের হুংকার শুনে রাক্ষসেরা তার চতুর্দিকে ঘিরে বিকট চীৎকার আরম্ভ করল; সেই শব্দে দিগ্‌বিদিক কম্পিত হোল।

রাক্ষসাধিপ সদর্পে বলে উঠলেন : 'এই শূলের আঘাতে তোমার অনুজের তুল্য তোমাকেও যমলোকে প্রেরণ করব'—এই বলে তা নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু রাঘবের কঠিন অভেদ্য অস্ত্রে শূল ভস্মীভূত হোল।

এর পর রামচন্দ্র রণরসে মেতে উঠেছেন ; তাঁর অস্ত্রে রাবণের রথাশ্ব বিদ্ধ। অদম্য সাহসে তিনি পর পর তিনটি শরে প্রথমে রাবণের ললাট ও পরবর্তী আরও তিনটি শরে তার বক্ষস্থল বিদারণ করলেন। তার দেহ থেকে রক্তধারা বইতে শুরু করল ; তবুও ভয়ানক ক্রোধে তিনি অবিচ্ছিন্ন বাণবর্ষণে শত্রুকে আচ্ছাদিত করতে চেষ্টা করলেন। রাঘব তাকে উপহাস ক'রে বললেন : 'ওরে রাক্ষসাধম। তুমি সহায়শূন্যা আমার ভার্যাকে অপহরণ ক'রে লঙ্কায় এনেছ, তাই তোমার জীবনের আশা কম ! তুমি কি ভেবেছ সীতাকে চুরি ক'রে খুব বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ ? নারীর সম্মুখে বীরত্ব-প্রদর্শন তো কাপুরুষের কাজ। ওরে মর্যাদাহীন নির্লজ্জ, দুশ্চরিত্র, সীতাকে অপহরণের ফলই মৃত্যু ; অথচ তুমি এখনও বীরত্বের আত্মশ্লাঘা দেখাচ্ছ[১]। রাক্ষসেরা দুর্বল, তাই তোমার ভয়ে ভীত হ'য়ে তোমাকে পূজা করে ; কিন্তু তুমি ভেবো না বীর ব'লে তারা তোমাকে সম্মান দেখায়। তুমি তো সবার তিরস্কার আর নিন্দার পাত্র। সীতাহরণের পর আমার অনেক অনিদ্র রাত্রি কেটে গেছে ; তোমার পরিপূর্ণ পাপের ফল আজ ভোগ কর। আমার বাণে নিহত হ'লে তোমার মাংস শৃগাল-কুকুরের ভোজ্য হবে।'—এই বলে দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি দশাননকে শর প্রহারে আচ্ছন্ন করলেন।

১। বৈদেহীং বিবশাং হৃত্বা শূরোঽহমিতি মন্যসে /
স্ত্রীষু শৌর্য্যমনাথাসু পরদারপ্রধর্ষক /
কৃত্বা কাপুরুষং কর্ম শূরোঽহমিতি মন্যসে /
ভিন্নমর্যাদ নির্লজ্জ চরিত্রেষ্বনবস্থিতঃ /
দর্পান্মৃত্যুমিবাদায় শূরোঽহমিতি মন্যসে !

সারথি এই অবস্থায় রাবণকে ঈষৎ নিস্তেজ দেখে রথ অপসারিত করার চেষ্টা করলে তিনি সারথিকে ভর্ৎসনা করলেন : 'তুমি আমাকে ভীরু, কাপুরুষ ও ক্ষুদ্রচেতা ভেবে আমার অভিপ্রায় না জেনেই রথ ফিরিয়ে নিয়েছ ; তোমার মূঢ়তার জন্য আমার এতদিনের যশ, অহঙ্কার, গরিমা সব মুছে গেল। তুমি কি আমায় কাপুরুষ ভেবেছ ? না কি তুমি শত্রুর উৎকোচ গ্রহণ করেছ ?' প্রভুর কথা শুনে সারথি সবিনয়ে বলল : 'মহারাজ, আমি শত্রুর চরও নই, আপনাকে কাপুরুষও ভাবি নি এবং আপনার উপর আমার ভক্তিও বিন্দুমাত্র কমেনি। আপনাকে রণক্লান্ত দেখে স্নেহের বশবর্তী হ'য়ে আপনার বিশ্রামের জন্য এমন কাজ করেছি। এখন আপনার আদেশই আমার শিরোধার্য'। রাবণের রথ অগ্রসর হোল ; পুনর্বার দুই বীরের মহারণ শুরু হোল। শত্রুর শরবর্ষণে ক্রুদ্ধ হ'য়ে রামচন্দ্র রোষবশে ইন্দ্রের ধনু ধারণ করলেন ; দশাননও সর্পের ন্যায় হিংস্র ও মহাবেগশালী তীর গ্রহণ করলেন। জয়ের অভিলাষে দুজনেই প্রাণপনে যুদ্ধ করছেন। তাবপর শুরু হোল উভয়ের দ্বৈরথ সমর ; রাক্ষস ও বানর সৈন্যরা বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে সেই সংগ্রাম দেখতে লাগল। বিজয়ের উদ্যমে রাঘব নব নব অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে চলেছেন আর রাবণও মৃত্যুর আশঙ্কায় ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠেছেন। রামের দুরন্ত বাণে রথধ্বজ বিনষ্ট ও ভূপাতিত দেখে তেজস্বী দশানন গদা, চক্র, পরিঘ, মুষল, তোমর, শূল, মুদ্গর, অঙ্কুশ, ভল্ল ও ভূশণ্ডী নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ত্রে সবই নিষ্ফল হোল। রোমাঞ্চকর তুমুল সংগ্রাম শুরু হ'য়ে গেল, ক্ষণকালের জন্যও তার বিরাম নেই। সেই সময় সারথির পরামর্শে রাম মর্মঘাতী ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন এবং সেই অস্ত্রে রাবণের হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে তাঁকে ভূপাতিত করলেন ; তার রথও সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হোল। রাক্ষসসৈন্যরা ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করতে লাগল ; অন্যদিকে রাঘববাহিনী বিজয়-উল্লাসে মেতে উঠল।

গান্ধারী-বিলাপ

[মহাভারত, স্ত্রীপর্ব]

[কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের আঠারদিনব্যাপী রক্তক্ষয়ী কুরুক্ষেত্র সমর শেষ হয়েছে। এ যুদ্ধে কৌরবগণ পরাজিত, বিধ্বস্ত ; পাণ্ডবগণ বিজয়ী। উভয়পক্ষেই অগণিত রাজা-মহারাজ, সৈন্য-সামন্ত হস্তী-অশ্ব হতাহত ; ক্ষয়-ক্ষতি অপরিমেয়। এই ভয়াবহ স্বজন-সংঘর্ষের অবসানে উভয় পক্ষই শোকে মুহ্যমান ; বিষাদের কালো ছায়া গ্রাস করেছে দুই শিবির।]

রাজমাতা গান্ধারী রণস্থল পরিদর্শনে এসেছেন। যুদ্ধভূমি অস্থি, মাংস, কেশ ও রক্তে পরিপ্লুত ; অগণিত মৃতদেহ ; অশ্বারোহী, গজারোহী, রথারোহী যোদ্ধাদের মস্তকহীন দেহ। বক, কাক, হাড়গিলা আর নরমাংসভোজী পিশাচদের ভোজ শুরু হয়েছে ; কুরুলপাখীরা মাংসের লোভে জমি ছেয়ে ফেলেছে ; শৃগাল ও গৃধ্রের বিকট চীৎকার ভেসে আসছে।

হতভাগিনী নারীরা খুঁজতে লাগলেন স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা, পিতা ও প্রিয়জনদের দেহ। শৃগাল, কাক, ভূত, পিশাচ আর অসংখ্য নিশাচর মৃত মাংসের আনন্দে মজে আছে। শোকার্ত পাঞ্চাল ও কৌরব রমণীরা দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছেন ; তাদের আর্ত বিলাপে বিভৎস রণস্থল আরও ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠেছে।

তখন বিষণ্ণা গান্ধারী পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে করুণস্বরে বললেন : 'হে কৃষ্ণ ! আমার এই পতিপুত্রহীনা পুত্রবধূরা আলুলায়িত কেশে কুররী পাখীর মতো উচ্চকণ্ঠে কাঁদছে ; তারা লজ্জাভয়শূন্য হ'য়ে পতি-পুত্র-পিতার মৃতদেহের দিকে ছুটে চলেছে ; বীরপুত্রা, বীরমাতা, বীর-পত্নীরা বিধ্বস্ত রণভূমিকে আবৃত ক'রে ফেলেছে। মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অভিমন্যু, দ্রুপদ, শল্য—সবার নিষ্প্রাণ দেহ ইতস্ততঃ পড়ে রয়েছে; অসংখ্য কবচ, অঙ্গদ, কুণ্ডল, কেয়ূর, রত্নমালা ছিন্ন-ভিন্ন; শক্তি, পরিঘ, তীক্ষ্ণ বাণ, ধনু—কতো অস্ত্র নিপাতিত।

'এমন ভয়ানক দৃশ্য দেখে আমি কেমন ক'রে ধৈর্য ধারণ করি ? হে মহাত্মা, পাঞ্চাল আর কৌরবদের মৃত্যুতে পঞ্চভূতই কি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল ! জয়দ্রথ, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, অভিমন্যু—যুদ্ধে এদেরও বিনাশ হবে একথা কি কেউ বিশ্বাস করেছিল[১] ? কৃষ্ণ, আমি তো শুনেছিলাম এরা অবধ্য ; কিন্তু কালের এমনই অমোঘ বিধান—আজ তারা হতপ্রাণ, আর তাদেরই রক্তমাংস ভক্ষণ করছে নরভোজী পশু ও পক্ষীরা ! উন্মুক্ত কঠোর ভূমি আজ তাদের শয্যা ! চারণদের স্তুতি-বন্দনায় যাদের ঘুম ভাঙ্গত, আজ তারা অমঙ্গল শৃগাল, শকুন ও কাকের রবেও নির্লিপ্ত[২] ; এই সব ঘৃণ্য জন্তুরা তাদের অলংকার নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে ; সুঠাম সুন্দর দেহগুলি আজ মাংসাশী পশুরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে ।'

'হে জনার্দন ! দেখুন, যারা অস্ত্রহাতে মৃত্যু বরণ করেছে, পশুরা ভয়ে তাদের কাছে যাবার সাহস পাচ্ছে না । মহাবাহু বীরগণ প্রিয়তমার বাহুমৃণাল ছেড়ে কঠোর গদাকেই আলিঙ্গন ক'রে মৃত্যুর কোলে চিরসুপ্ত । হে কৃষ্ণ, একবার কান পেতে শুনুন বীরবধূরা কেমন করুণ বিলাপে দগ্ধ হচ্ছে ; দুঃখে, ক্ষোভে, হতাশায় তাদের সুন্দর মুখচ্ছবি উদীয়মান সূর্যের মতো তাম্রাভ হ'য়ে গেছে ; একই সঙ্গে সকলের করুণ ক্রন্দনে সব হাহাকার অর্থহীন বাক্যের মতো শোনাচ্ছে ; কোন কোমলপ্রাণ নারী দুঃখের ভার সহ্য করতে না পেরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে ; কেউ আত্মীয়-স্বজনদের ডেকে প্রিয়-জনের মৃত দেহটি দেখাচ্ছে ; কোন কোমলাঙ্গী কপালে করাঘাত করছে ।'

'বাসুদেব, একবার দেখুন—ছিন্নভিন্ন খণ্ডিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে

১ । জয়দ্রথস্য কর্ণস্য তথৈব দ্রোণ-ভীষ্ময়োঃ ।
অভিমন্যোর্বিনাশঞ্চ কশ্চিন্তয়িতুমর্হতি ॥

২ । বন্দিভিঃ সততং কালে স্তুবদ্‌ভিরভিনন্দিতাঃ ।
শিবানামশিবা ঘোরাঃ শৃণ্বন্তি বিবিধা গিরঃ ॥

কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গন আকীর্ণ; এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখে নারীরা মূর্ছা যাচ্ছে। কোন অনাথা প্রিয়জনের মস্তকশূন্য দেহটিই খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু মাথাটির সন্ধান করতে পারে নি; আবার কেউ ছিন্ন-কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মিলিয়ে স্বামীর দেহ সনাক্ত করতে চেষ্টা করছে। হে মধুসূদন! রক্ত-মাংস, অস্ত্র-শস্ত্র, অলংকার সবকিছু মিলে রণভূমি দুর্গম হ'য়ে উঠেছে। মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূরা কুরুক্ষেত্রের ধ্বংস-স্তূপে অশ্বশিশুর মতো বিচরণ করছে, আর চতুর্দিকে নারীকণ্ঠের আর্ত হাহাকার উঠছে;—হে কেশব, এর চাইতেও বেশী দুঃখ কি কল্পনা করা যায়[১]? নিশ্চয় এ আমার কৃতকর্মের ফল!'

শোকার্তা গান্ধারী কিছুক্ষণ পর পুত্র দুর্যোধনের মৃতদেহ দেখতে পেলেন; দুঃখ-বেদনায় তিনি কদলীবৃক্ষের মতো ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে পড়লেন। ক্ষণিক পরে চৈতন্য লাভ ক'রে 'হা পুত্র!' ব'লে তিনি বিলাপ ক'রে উঠলেন; চোখের জলে বুক ভিজিয়ে গান্ধারী কৃষ্ণকে পুনরায় বললেন: 'হে বৃষ্ণিনন্দন! যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আসন্ন, তখন দুর্যোধন আমার কাছে এসে বলল—মা, তুমি আমায় আশীর্বাদ কর, এই জ্ঞাতিযুদ্ধে আমি যেন জয়ী হই। আমি তখনি তার বিপদ আশঙ্কা ক'রে বলেছিলাম, বাছা, যে পক্ষে ধর্ম, সে পক্ষেরই জয় হবে[২]। তাকে বুঝিয়ে আরও বললাম, যুদ্ধ তো অবশ্যম্ভাবী, তুমি বীর, সতর্কতার সঙ্গে বীরের মতো যুদ্ধ করবে; তারপর যে পরিণতিই হোক না কেন,—দেবতাদের তুল্য স্বর্গলোক লাভ করবে।—এই ছিল পুত্রের প্রতি মাতার উপদেশ; তাই হে কেশব, দুর্যোধনের জন্য আমি শোক করি না; আমার দুঃখ আমার বৃদ্ধ স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের জন্য। হে কৃষ্ণ! দেখুন আমার বিচক্ষণ, বীর,

১। ইতো দুঃখতরং কিং নু কেশব, প্রতিভাতি মে।
যদিমাঃ কুর্বতে সর্বা রবমুচ্চাবচং স্ত্রিয়ঃ ॥

২। ইত্যুক্তে জানতী সর্বমহং স্বব্যসনাগমম্।
অব্রুবং পুরুষব্যাঘ্র, যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥

রণনিপুণ ও অমর্ষণ পুত্র বীরশয়নে শায়িত ; যে শত্রুনাশন নৃপতি সমস্ত রাজাদের সম্মুখে গমন করত, আজ সে ধূলায় লুণ্ঠিত,—এই তো কালের গতি[১]। পূর্বে জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ এসে আমার পুত্রের প্রশংসায় মুখর হতেন ; আর আজ গৃধ্র ও নরখাদক পাখীরাই তার স্তুতি করছে। এই দুর্যোধনই একদা একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা পরিচালনা করেছিল, আজ সে মৃত, নিষ্কণ্টক। পৃথিবী যার অধীনে দীর্ঘ তের বছর শাসিত হয়েছে, সেই বীর আজ কুরুক্ষেত্রের এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে নিষ্প্রাণ অবস্থায় পতিত।'

'হে বাসুদেব, আমার পুত্রবধূ দুর্যোধনের ভার্যাকে একবার দেখুন ; এই মনস্বিনী বীর পতির আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত সুখে নির্ভয়ে দিন কাটাত, আজ তার কি করুণ পরিণতি! হায়! আমি এতসব দেখছি, তবু কেন কঠিন হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে না[২] ? দেখুন—আমার পুত্রবধূ বারবার করতলে মস্তক আঘাত করতে করতে স্বামীর বুকে লুটিয়ে পড়ছে! যদি ধর্ম সত্য হয়, ঈশ্বর সত্য হয়,—তবে নিশ্চয় এই মৃত বীরেরা স্বর্গলাভ করবে। ভীমের গদাঘাতে আমার বীর পুত্রদের অনেকেই নিহত। আমার সুন্দরী পুত্রবধূদের রত্নরঞ্জিত চরণ প্রাসাদের মণি-ভূমি স্পর্শ করত, আজ তারা রুধিরসিক্ত রণভূমিতে বিচরণ করছে। কোন নারী নিহত পতি, পুত্র, পিতা বা ভ্রাতার হাত ধ'রে ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ছে ; প্রৌঢ়া আর বৃদ্ধারা ভীষণ ক্রন্দন করছে! হে কেশব, আপনি নিষ্পাপ ; মূঢ়মতি আমি আর এই সুন্দরীরা নিশ্চয় জন্মান্তরে ঘোর পাপ করেছিলাম! সুন্দরী, সৎকুলজাতা, লজ্জাশীলা আমার পুত্রবধূরা আজ ইতর-পামরদেরও চক্ষুগোচর হোল!'

গান্ধারী আরও বললেন : 'হে কৃষ্ণ, অর্জুন ও তোমার অপেক্ষা

১। যোঽয়ং মূর্দ্ধাভিষিক্তানামগ্রে যাতি পরন্তপঃ।
সোঽয়ং পাংশুষু শেতেঽদ্য, পশ্য কালস্য পর্যয়ম্ ॥

২। কথং নু শতধা নেদং হৃদয়ং মম দীর্যতে।
পশ্যন্ত্যা নিহতং পুত্রং পুত্রেণ সহিতং রণে ॥

বীর অভিমন্যুই ধরাতলে শায়িত, আর উত্তরা মৃত স্বামীকে আলিঙ্গন ক'রে বিলাপ করছে ; বিরাটরাজার কুলবধূরা তাকে গৃহে ফেরানোর জন্য আকর্ষণ করছে। অন্যদিকে কর্ণের পত্নী মৃত পতিকে ঘিরে রোদন করতে করতে মূর্ছা গেছে, এই সুযোগে মৃতভুক্ পশুপাখীরা কর্ণের দেহ ভক্ষণ করেছে, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর চাঁদের মতো অল্পই অবশিষ্ট আছে। অল্পবয়স্কা বালিকার মতো ক্রন্দনরতা আমার অভাগিনী কন্যা দুঃশলা আত্মহত্যার জন্য বক্ষে করাঘাত করছে আর পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি বর্ষণ করছে। এদিকে দেখুন, প্রলয়কালে পতনশীল সূর্যের মতো শৌর্যে বীর্যে অতুলনীয় শূর ভীষ্ম নিস্পন্দ হ'য়ে শর-শয্যায় শুয়ে আছেন। হে মাধব, মহামানব দেবতুল্য ভীষ্ম যদি আমাদের ছেড়ে স্বর্গে চলে যান, তাহলে কৌরবেরা কার কাছে ধর্মের উপদেশ শুনবে !'

'হে কেশব ! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও জয়দ্রথ—এই মহারথীদের সঙ্গে সম্মুখ সমরেও তোমরা জীবিত আছ ; এ কি সম্ভব ? আমার মনে হয়, আপনি ও পাণ্ডবেরা অবধ্য। স্বয়ং দেবগণও এই বীর ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধে বধ্য ছিলেন, অথচ তারাই নিহত হলেন ! হে কৃষ্ণ, কালের পরিবর্তন দেখছেন ? দৈবের কাছে কোন কিছুই দুষ্কর নয়, তাই বীরশ্রেষ্ঠ ক্ষাত্র নরপতিরা নিহত হোল। আপনি যখন শান্তির প্রস্তাব এনে বিফল মনোরথ হ'য়ে ফিরে গেলেন, আমার পুত্রদের তখনই মৃত্যু হয়েছিল। বুদ্ধিমান ভীষ্ম ও বিদুর আমাকে বলেছিল, দেবী আপনি পুত্রদের উপর মিথ্যা স্নেহ করবেন না। জনার্দন, তাদের দূরদৃষ্টি তো মিথ্যা হ'তে পারে না। তাই অচিরেই আমাদের পুত্ররা ভস্মীভূত হোল।' এই ব'লে গান্ধারী ক্ষণকালের জন্য মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়লেন।

তারপর কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা গান্ধারী কৃষ্ণকে পুনরায় বললেন : 'জনার্দন, যখন কৌরব ও পাণ্ডবেরা ক্রুদ্ধ হ'য়ে পরস্পর হানাহানিতে মেতে উঠল, তখন আপনি কেন তাদের উপেক্ষা করলেন ? মধুসূদন,

কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষ আপনাকে মান্য করত; আপনার যোগ্যতাও ছিল; কিন্তু আপনি কৌরবদের ধ্বংস উপেক্ষা করলেন। তাই আজ আপনাকেও তার ফল ভোগ করতে হবে। আমি সতী সাধ্বী গান্ধারী আজীবন যেটুকু সুকৃত সঞ্চয় করেছি, তারই শক্তিতে অভিশাপ দিচ্ছি—আপনি যেমন পাণ্ডব ও কৌরবদের স্বজনবিনাশ উপেক্ষা করেছেন, তার ফলস্বরূপ আপনি স্বয়ং আপন বংশের বিনাশের কারণ হবেন। মধুসূদন, আজ থেকে ছত্রিশ বছর পরে আপনিও পুত্রহীন, বন্ধুহীন, জ্ঞাতিহীন অবস্থায় বনে বনে বিচরণ-কালে কুৎসিত উপায়ে নিহত হবেন; আপনার স্ত্রীরাও আমার বংশের পতিপুত্রহীনাদের মতো আপনার মৃত্যুতে হাহাকার করবে।'

জৈন রামায়ণ

ভারতীয় সাহিত্যের দুই অভ্রংলিহ কীর্তিস্তম্ভ রামায়ণ ও মহাভারত। পৌরাণিক পরম্পরায় 'আদি-কবি' বাল্মীকির 'আদি-কাব্য' রামায়ণ—২৪০০০ শ্লোকে রামকথার বর্ণনা। ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর এর প্রভাব সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। রামায়ণকে কেন্দ্র ক'রে যেমন উপনিষদ্, মহাকাব্য ও অগণিত নাটক রচিত হয়েছে, তেমনি অধ্যাত্ম-রামায়ণ, অদ্ভুত-রামায়ণ, আনন্দ-রামায়ণ প্রভৃতিও আছে। আবার বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের আদর্শবাদে প্রভাবিত হ'য়ে পালি ও প্রাকৃত ভাষায় এবং তামিল, তেলুগু, মালয়ালম্, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষায় রামায়ণ বা তার উপাখ্যান অবলম্বনে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য রচিত হয়েছে। ভারতের বাইরে চীন, তীব্বত, যব-দ্বীপ ও বলিদ্বীপের ভাষাতেও রামায়ণের ছোট-বড় অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তরে মূল কাহিনীর অনেক পরিবর্তনও ঘটেছে। এগুলির মধ্যে জৈন রামায়ণ বিশেষ চিত্তা-কর্ষক।

প্রাকৃত ভাষায় রামকথাসম্বন্ধীয় প্রথম চরিতকাব্য হোল জৈন

আচার্য বিমলস্থুরির 'পউম-চরিঅ' বা পদ্মচরিত। রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্ঠীয় প্রথম শতক। জৈন পরম্পরা অনুসারে পরম জিন মহাবীরের কাছে তাঁর শিষ্য গৌতম ইন্দ্রভূতি এই রামায়ণ কাহিনী শুনেছিলেন এবং তারপর মগধের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী বিম্বিসারকে শুনিয়েছিলেন। রচয়িতা বিমলস্থুরি বাল্মীকির কাহিনীকে জৈন-ধর্মীয় পরিবেশের উপযুক্ত ক'রে রূপদান করেছেন। ইন্দ্রভূতি বিচার ক'রে দেখলেন বাল্মীকির রামায়ণ অবিশ্বাস্য, উদ্ভট, ও কাল্পনিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। তিনি আচার্যকে জিজ্ঞাসা করলেন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক কেন এমন ঘটনা বিশ্বাস করবে? মহাবীর বললেন: 'সৎ কবি সর্বদা সত্য কথা বলেন, কিন্তু অসৎ কবির রচনা মিথ্যায় ভরা; তাই বাল্মীকির কাব্যে মিথ্যা, অবিশ্বাস্য কাহিনীর ছড়াছড়ি। এই ব'লে তিনি দু-একটি উদাহরণ দিলেন, যেমন—রাজা রাবণ ছিলেন নরমাংসভোজী রাক্ষস: কিংবা, রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ছ মাস নিদ্রা যেতেন এবং নিদ্রাভঙ্গের পর জীবন্ত হাতী, মহিষ প্রভৃতি ভক্ষণ করতেন। তাই বললেন, এসব কাহিনী বিশ্বাস করলে একথাও সত্য হয় যে হরিণের দ্বারা সিংহ নিহত হয়েছে অথবা কুকুরের দ্বারা হাতী পরাস্ত হয়েছে।' জৈন আদর্শের বাতাবরণে দশরথ, রাম প্রভৃতি সকলেই জিনের ভক্ত অর্থাৎ জৈন; এমন কি রাবণও পরম ধার্মিক, কর্তব্যনিষ্ঠ জৈন রাজা।

কথা-সংক্ষেপ: সৃষ্টির প্রথম যুগে শুধু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের লোক বিদ্যমান ছিলেন, ব্রাহ্মণদের অস্তিত্ব ছিল না; সমস্ত লোকই ছিলেন জিনের ভক্ত এবং জৈন ধর্মে বিশ্বাসী।

অযোধ্যার অধিপতি মহারাজ দশরথ; তাঁর দুই মহিষী অপরাজিতা ও অমিত্রা। একদিন নারদ এসে সংবাদ দিলেন যে মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামের হাতে রাবণ নিহত হবেন। অন্যদিকে এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে বিভীষণ দশরথকে হত্যার অভিপ্রায়ে অযোধ্যায় অভিযান করেছেন; নারদের মুখে এই কথা শুনে দশরথ

রাজধানী ছেড়ে ছদ্মবেশে পলায়ন করলেন, এবং ঘুরতে ঘুরতে ভাগ্য-বলে কৈকেয়ীর স্বয়ংবরসভায় পৌঁছালেন। কৈকেয়ী দশরথের গলায় বরমাল্য অর্পণ করলে সমাগত রাজারা অত্যন্ত রুষ্ট হ'য়ে দশরথের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তখন কৈকেয়ী স্বামীর রথের সারথ্য গ্রহণ ক'রে যুদ্ধে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন; অবশেষে দশরথ জয়ী হলেন। পত্নীর কৃতিত্বে খুশী হ'য়ে মহারাজ তাঁকে এক বরদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

রাণী অপরাজিতার এক পুত্র; তার মুখ পদ্মের মত সুন্দর ব'লে নাম হয়েছিল পদ্ম। অন্য নাম রাম; এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। অমিত্রার পুত্র লক্ষ্মণ এবং কৈকেয়ীর ভরত ও শত্রুঘ্ন।

রাজা জনকের মহিষী বিদেহা; মহারাজের ঔরসজাতা কন্যা জানকী বা সীতা; জননীর নাম অনুসারে তার অন্য নাম বৈদেহী। একবার পদ্ম অর্থাৎ রাম বর্বর ম্লেচ্ছদের হাত থেকে রাজা জনককে উদ্ধার করেছিলেন, তাই তিনি আপন কন্যা সীতাকে তার হাতে প্রদান করার সিদ্ধান্ত করেন। জনকের শিশু পুত্র ভামণ্ডল শৈশবে এক বিদ্যাধরের দ্বারা অপহৃত হন। তারপর যৌবনে তিনি সীতার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে অজ্ঞতাবশতঃ তাকে পত্নীরূপে প্রার্থনা জানালেন। তখন জনক কন্যার স্বয়ংবরের আয়োজন করলেন। স্বয়ংবর সভায় রামচন্দ্র জনকের ধনু ভঙ্গ ক'রে সীতাকে বিবাহ করলেন।

আষাঢ়ের শুক্লা অষ্টমীতে রাজা দশরথ জিনের পূজা ক'রে মহিষী-দের কাছে পূজার ফুল ও গন্ধোদক পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রধানা পত্নী যথাসময়ে গন্ধোদক না পেয়ে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন এবং আত্ম-হত্যার ভয় দেখালেন। এরমধ্যে বৃদ্ধ পরিচারক পূজার জল নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন; তারপর মহিষীর ক্রোধ প্রশমিত হোল। সমস্ত ঘটনা শুনে দশরথের মনে সংসারের প্রতি নিস্পৃহা জাগল; তাই বৃদ্ধ বয়সে রামের হাতে রাজ্যভার অর্পণ ক'রে প্রব্রজ্যা গ্রহণে মনস্থির করলেন। পিতার উৎসাহে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ভরতও প্রব্রজ্যা

নিয়ে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করবেন এমন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু কৈকেয়ীর পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব নয়; তিনি ভাবলেন ভরত হয়ত রাজা হ'লে এমন কঠিন সংকল্প ত্যাগ করবে। তাই তিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে ভরতের জন্য অযোধ্যার সিংহাসন প্রার্থনা করলেন। দশরথ তরুণ পুত্রের মন সংসারের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য কৈকেয়ীর প্রার্থনা পূরণ করলেন। রামচন্দ্রও পিতার সিদ্ধান্তে সম্মত হলেন এবং স্বয়ং বনবাস করতে মনস্থ করলেন। লক্ষ্মণ ও সীতা রামচন্দ্রকে একাকী বনে পাঠাতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তাঁরাও সঙ্গে গেলেন। কিন্তু ভরতের পক্ষে এমন প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অসম্ভব; তবু অগ্রজের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। ভরতকে সংসারে অবরুদ্ধ করতে গিয়ে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে কৈকেয়ী তা কল্পনা করতে পারেন নি; দুঃখে, হতাশায় তিনি ভেঙ্গে পড়লেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনতে তিনি নিজেই পারিযাত্র বনে গমন করলেন; কিন্তু রাম প্রতিজ্ঞায় অটল; তিনি বিমাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে অযোধ্যায় ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন।

লংকার রাক্ষসবংশের প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা রাবণ। এই বংশের এক প্রাক্তন নরপতি লংকা ও অন্যান্য দ্বীপকে ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, সেই কারণে তাঁর বংশের নাম হয় রাক্ষসবংশ। রাবণের মাতা মন্দোদরী পুত্রের গলায় এক মহামূল্য হার পরিয়ে রাখতেন, তার সঙ্গে নটি লকেট বাঁধা ছিল। সেই সব লকেটে রাবণের মুখের প্রতিবিম্ব পড়ত, এই কারণে লোকে রাবণকে দশানন বা দশমুখ বলত।

দণ্ডকারণ্যে বিচরণকালে রামচন্দ্র একদা আপন শক্তিপরীক্ষার ছলে তরবারি দিয়ে এক গাছ কাটতে লাগলেন। সেই গাছের ঝোপে খরদূষণের পুত্র শম্বুক গোপনে তপস্যা করছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ রামের অস্ত্রাঘাতে তার মৃত্যু হোল। এদিকে শম্বুকের মাতা রাবণের

ভগিনী চন্দ্রনখা পুত্রের সন্ধানে দণ্ডকারণ্যে এসেছেন। তিনি রাম-লক্ষ্মণের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হ'য়ে এক ভ্রাতাকে বিবাহ করার প্রস্তাব করলেন; কিন্তু রাম-লক্ষ্মণ তাকে অপমান ক'রে সেখান থেকে বিতাড়িত করলেন। চন্দ্রনখা লংকায় ফিরে স্বামী খরদূষণের কাছে রাম-লক্ষ্মণের নামে মিথ্যা অভিযোগ করলেন। স্ত্রীর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য খরদূষণ রাম ও লক্ষ্মণকে বধের পরিকল্পনা ক'রে দণ্ডকে পৌঁছালেন; আবার তার সাহায্যের জন্যে রাবণও সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। সীতার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'য়ে রাবণ রাম-লক্ষ্মণের অনুপস্থিতির সুযোগে তাকে হরণ ক'রে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। বিরাধিত নামে এক বিদ্যাধরের পিতাকে হত্যা করে-ছিলেন খরদূষণ। এই বিরাধিতের সাহায্য নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ খর-দূষণকে হত্যা করলেন।

তারপর রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহযোগিতায় সীতাকে উদ্ধারের পরিকল্পনা করতে লাগলেন। এই সময় বানর-বংশের রাজা সুগ্রীবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও মৈত্রী স্থাপিত হোল। বিদ্যাধর রাজা অমরপ্রভ নিজ বংশের প্রাচীন প্রথা রক্ষা করার জন্য নগরের তোরণ ও পতাকায় বানরের ছবি অঙ্কিত করেছিলেন, তাই তাঁর বংশকে বানরবংশ বলা হোত।

রাবণ রূপের মোহে সীতাকে অপহরণ করেছিলেন; পরবর্ত্তী কালে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হচ্ছিলেন। তাই তিনি এক মুনির কাছে পরস্ত্রী ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করেন। মন্দোদরীও স্বামীকে বোঝালেন যে তিনি যখন অসংখ্য মহিষী গ্রহণ করেও সংসারসুখে তৃপ্ত হন নি, তখন সীতাকে গ্রহণ করলেও কামনার নিবৃত্তি হবে না; সুতরাং পরস্ত্রী ত্যাগ করাই বিধেয়।

অতঃপর রাম ও রাবণের যুদ্ধ শুরু হোল। দুই পক্ষের সেনা-পতিরা রণক্ষেত্রে প্রবল সাহস ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে লাগলেন। এই সময় রাবণ সাময়িকভাবে জিনের তপস্যায় মগ্ন হলেন। বিভীষণ

রামচন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন এই সুযোগে রাবণকে বন্দী করা উচিত। কিন্তু এমন অনুচিত প্রস্তাবে রাম সম্মত হলেন না। অবশেষে সুগ্রীবের সাহায্যে লক্ষ্মণ রাবণকে নিহত করলেন।

সীতাকে উদ্ধার ক'রে রাম ও লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে এলেন। ভরত ও কৈকেয়ী জৈন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। রামচন্দ্র ভরতের হাত থেকে রাজ্যভার গ্রহণ ক'রে পুনরায় লক্ষ্মণকে তার কর্তৃত্ব অর্পণ করলেন। সন্তানসম্ভবা সীতা মঙ্গলকামনায় জিনের পূজায় মনোনিবেশ করলেন।

এইভাবে কিছুদিন অতিক্রান্ত হ'লেও অযোধ্যার বিশিষ্ট নাগরিকদের মুখে সীতার চরিত্র সম্বন্ধে প্রজাদের নানান অপবাদ রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হোল। তার মনে হোল সীতার দ্বারা রাজবংশের যশ কলঙ্কিত হচ্ছে। তাছাড়া নারীজাতি স্বভাবতঃ কুটিল, নানা দোষের আধার; তাদের সারা দেহে কামের আবাস, নারী দুঃশ্চরিত্রতার মূল এবং মুক্তির অন্তরায়। এই ভেবে তিনি সীতাকে বিসর্জনের পরিকল্পনা করলেন এবং তার আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে বিসর্জন দিলেন। পুণ্ডরীক পুরের রাজা অভাগিনী সীতাকে গ্রহণ ক'রে ভগিনীর মত পালন করতে লাগলেন। সেখানে তার যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করল; তাদের নাম রাখা হোল লবণ ও অঙ্কুশ। তারা বড় হ'য়ে নানা দেশ জয় ক'রে জননীর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। অবশেষে পিতা ও পুত্রদ্বয়ের সানন্দ মিলন হোল। তারপর পতিব্রতা শুদ্ধাচারিণী সীতা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণা হলেন এবং রাম নিজ অপরাধের জন্য তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। কিছুদিন পর হঠাৎ লক্ষ্মণের মৃত্যু হোল; শোকে দুঃখে রামচন্দ্র আকুল হ'য়ে পড়লেন। মায়াময় সংসারের দুঃখ তার মনে আনল বৈরাগ্য। দুই পুত্রের সঙ্গে রাম ও সীতা জিনেন্দ্র মহাবীরের ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

পুরাণে ভারতবর্ষবর্ণনা

হিমালয়ের দক্ষিণে এবং সমুদ্রের উত্তরে ভারতবর্ষ নামে দেশ অবস্থিত। ভরতবংশীয়েরা এই দেশের অধিবাসী। ভারতবর্ষ দেশের বিস্তার নয় সহস্র যোজন। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাত্র এই সাতটি কুলপর্বত এখানে বিদ্যমান। ভারতের অধিবাসীরাই স্বর্গ ও মুক্তি লাভ করেন।

এই দেশ নটি দ্বীপে নয়-ভাগে বিভক্ত—ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব আর বারুণ। সাগরে বেষ্টিত সাগরদ্বীপ উত্তর ও দক্ষিণে সহস্র যোজন বিস্তৃত। ভারত-বর্ষের পূর্বাংশে কিরাত, পশ্চিমে যবন, মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের বাস। এই সব নানাজাতির মানুষেরা যাগ-যজ্ঞ, যুদ্ধ-বিগ্রহ বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে বাস করেন এবং জীবিকা নির্বাহ করেন। এখানে অনেক নদ-নদী রয়েছে। শতদ্রু, চন্দ্রভাগা প্রভৃতি নদীগুলি হিমালয় পর্বত থেকে উৎপন্ন ; বেদস্মৃতি ও অন্যান্য নদীগুলি পারিযাত্র থেকে ; নর্মদা ও সুরমা বিন্ধ্য পর্বত থেকে ; তাপী, পয়োষ্ণী, নির্বিন্ধ্যা ও কাবেরী ঋক্ষ পর্বতের পাদদেশ থেকে ; গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবেণ্যা প্রভৃতি সহ্যপর্বত থেকে ; কৃতমালা, তাম্রপর্ণী প্রভৃতি মলয়পর্বত থেকে এবং ত্রিযামা, আর্যকুলা প্রভৃতি মহেন্দ্রপর্বত থেকে প্রবাহিত। কুরু, পাঞ্চাল ও মধ্যদেশে অন্যান্য আরও অনেক নদনদীর উৎসধারা বর্তমান। আবার এই নদীগুলির অসংখ্য উপনদী এবং শাখানদীও আছে। কামরূপ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ, কুরু, পাঞ্চাল, মধ্যদেশ, দাক্ষিণাত্য, সুরাষ্ট্র, শাকল্য, মালব, অর্বুদ, পারিপাত্র প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা এই সব নদনদীর তীরে বসবাস করেন এবং তাদের আনুকুল্যে সুস্থ-সুন্দর জীবন যাপন করেন। ভারতবর্ষে চারটি যুগবিভাগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। এখানে মুনিরা তপস্যা করেন, গৃহীরা ধর্মসাধনা ও দান করেন।

নরক বর্ণনা

[বিষ্ণু-পুরাণ। দ্বিতীয় অংশ, ষষ্ঠ অধ্যায়]

মহাত্মা পরাশর আপন শিষ্যের নিকট নরকলোক ও তার অধিবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করলেন। ভূমণ্ডল ও জলরাশির নীচে বিভিন্ন নরক অবস্থিত। যারা পাপী তারাই মৃত্যুর পরে সেই লোকে গমন করে এবং নিজ নিজ কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করে।

বিভিন্ন নরকের নাম—রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজ্বাল, তপকুণ্ড, লবণ, বিমোহন, রুধিরান্ধ, বৈতরণী, কৃমীশ, কৃমিভোজন, অসিপত্র, বন, কৃষ্ণ, লালাভক্ষ, দারুণ, পূয়বহ, পাপ, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, কালসূত্র, তমঃ, অবীচি, শ্বভোজন ও অপ্রতিষ্ঠ। এগুলি প্রধান নরক, এছাড়া আরও অনেক সাধারণ নরক আছে।

মিথ্যাসাক্ষী, বিবাদে মিথ্যাবাদী বা কপট মধ্যস্থ এবং মিথ্যাভাষী প্রভৃতি পাপীরা রৌরব নরকে যায়। ভ্রূণহত্যাকারী, গৃহস্থান প্রভৃতি থেকে লোককে উৎখাতকারী ও গোঘাতক রোধ নামক নরক প্রাপ্ত হয় এবং শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মারা যায়। সুরাপায়ী, গুরু ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির হত্যাকারী এবং সুবর্ণ অপহরণকারী পাপীরা শূকর নরকের যন্ত্রণা ভোগ করে। ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যকে হত্যা করলে তাল নরকে গতি হয়। গুরুপত্নী-হরণকারী তাল নামক নরকে গমন করে। রাজদূতকে হত্যার পাপে রুধির নরক ভোগ করতে হয়। পতিব্রতা পত্নীকে বিক্রয়কারী, কারাগারের রক্ষক, অশ্ববিক্রেতা এবং ভক্ত অথবা অনুরক্ত ব্যক্তির প্রতারণাকারী তপ্তলৌহ নরকে পতিত হয়। কন্যা বা পুত্রবধূ গমন করলে মহাজ্বাল নামক ভয়ানক নরকপ্রাপ্তি ঘটে। গুরুকে অপমানকারী বা আঘাতকারী, বেদনিন্দুক, অগম্যাগমনকারী প্রভৃতির লবণ নরকে গতি হয়। পিতামাতা অতিথি বা দেবতার ভোজনের পূর্বে ভোজন করলে লালাভক্ষ নরকে গতি

হয়। বাণ নির্মাতার ভাগ্যে বেধক নরক এবং খড়্গ নির্মাতার বিশসন নরক। অসৎ ব্যক্তির দান গ্রহণ করলে কিংবা কারো কাছে উৎকোচ গ্রহণ করলে, পাপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যজন করলে অথবা পাপ কাজের জন্য গ্রহণক্ষত্র বিচার করলে অধঃশিরা নরকে স্থান হয়। একাকী ভোজনকারী পূয়বহ নরকে যায়। মাংস, লাক্ষা, তিল, লবণ বিক্রী করলে কিংবা অসমসাহসিক (হত্যা, অগম্যাগমন প্রভৃতি) কাজ করলে ব্রাহ্মণেরও একই নরকে গতি হয়। আবার ব্রাহ্মণ যদি রঙ্গোপজীবী হয় (অর্থাৎ নট বা নটীর কাজ ব্যবসারূপে গ্রহণ করে), জারজ ব্যক্তির খাদ্য গ্রহণ করে, স্ত্রীকে ব্যভিচারে নিযুক্ত করে, পক্ষীর ব্যবসা করে—তাহলে নরকবাস ভোগ করবে। গ্রাম নষ্টকারী, জমির সীমা লঙ্ঘনকারী, সর্বদা অশুচি এবং ইন্দ্রজাল ব্যবসায়ী (magician) কালসূত্র নামক নরকে পতিত হয়। বিনা কারণে বন বা গাছপালা নষ্ট করলে অসিপত্র নরকে যায়। ব্যাধ বহ্নিজাল নাম নরক লাভ করে। ব্রত নষ্টকারী ও আপন আশ্রম পরিত্যাগকারী সন্দংশ নরকে যায়। পুত্রের কাছে অধ্যয়নকারী শ্বভোজন নরকে স্থান পায়। বধ্য পশুর পালনকর্তা তপ্তলৌহ নরকে গমন করে।

উর্বশীর জন্ম

[বামন পুরাণ]

ভারতীয় সাহিত্যের উষালগ্নে উর্বশী[১] সুরলোকনন্দিনী অপ্সরা; অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় নৃত্যপটিয়সী গণিকা; আবার সামগ্রিক সাহিত্যতত্ত্বে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যভাবনার কল্পপ্রতিমা। গ্রীক ভেনাসের মতো উর্বশীও অখণ্ড-শাশ্বত সৌন্দর্যচেতনার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। দেহজ

১। উরু + অশ্ – ক + ঈ অথবা উরু + বশ্ + ঈ = উর্বশী অর্থাৎ বহু-বিস্তৃতা বা মহৎ যশের অধিকারিণী ; উরু দ্বারা বশীভূত করে যে ; মহান্ কাম যার অথবা যিনি 'বিশ্ব-বাসনা'।

কামনা থেকে যে অপ্সরার জন্ম, দেহাতীত প্রণয়ের চৈতন্যে তার পূর্ণতা, অধরা মাধুরীতে তার উত্তরণ ; প্লেটোর অনুকরণে বলা যায় **earthly Aphrodite** ও **heavenly Aphrodite** ।

একদা বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণের তপস্যায় চরাচর ব্রহ্মাণ্ড সংক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল। শঙ্কিত দেবরাজ অপ্সরাশ্রেষ্ঠ রম্ভাকে পাঠালেন সেই মহাশ্রমে। সঙ্গে উপস্থিত হলেন কুসুমায়ুধ কামদেব ও ঋতুরাজ বসন্ত ঃ

বনে বনে জাগল অকাল-বসন্তের উদ্দীপনা,
শুরু হোল কন্দর্প ও অপ্সরার লীলা,
কিংশুকের অগ্নি-আভায় সাজল ধরণী ;
সিংহ-বিক্রমে এগিয়ে এল মধুমাস,
কুন্দকুড্‌মল আর লোধ্রস্তবকে ছড়িয়ে পড়ল তার হাসি,
অশোকের রক্তিমায় রাঙা হোল বন,
নদীতীরে বেতসমঞ্জরীর বিলাস,
বদরিকাশ্রমে আবির্ভূতা বসন্তলক্ষ্মী।
হাতে তার অশোকের মাধুরী,
আননে বিকশিত কমলের শ্রী,
যুগল স্তনে বিল্ব-ফলের উপমা,
প্রস্ফুটিত কুন্দদলে হাসির ছটা,
ইন্দীবর যেন তার দীঘল চোখ,
লতামঞ্জরী ভুজ-আভরণ,
বন্ধুজীব যেন অনুপম অধর ;
মত্ত কোকিলের কূজন তার কলকণ্ঠে,
রাজহংসের অলস গমনে চরণবিন্যাস,

নরনারায়ণ আপন ঊরু থেকে জন্ম দিলেন উর্বশীকে।
কন্দর্প দেখলেন সুন্দরীর ভুবনমোহন রূপ—
সজ্জনের মতো সংহত ও পীবর দুটি স্তন,
বৃন্তগুলি ঈষৎ উন্মুক্ত;
ক্ষীণ কটিদেশে ত্রিবলীর ভূষণ,
মসৃণ উদরে সূক্ষ্ম রোমরাজি,
মণিমেখলায় বেষ্টিত গুরু নিতম্ব—
যেন ভুজঙ্গভূষণে মন্দারপর্বত;
কদলীকাণ্ডের মতো শীতল-সরস যুগল ঊরু,
প্রশস্ত গুল্‌ফ, শোভন জানু আর রোমশূন্য জঙ্ঘা,
রক্তাভ চরণতলে জেগে নেই শিরার স্ফীতি[১]।

ভগবানের মানসী কন্যা উর্বশীকে দেখে মদনদেবই কামনায় আতুর হলেন। তাঁর মনে হোল, এ কি কামের রাজধানী? নাকি সূর্যরশ্মির ভয়ে পলায়িত চাঁদের সম্মিলিত শোভা? ঊরুজন্মা উর্বশীকে মাধব সমর্পণ করলেন ইন্দ্রের হাতে।

১। তাবেবাহার্যবিরলৌ পীবরৌ ভগ্নচূচুকৌ।
রাজেতেঽস্যাঃ কুচৌ পীনৌ সজ্জনাবিব সংহতৌ ॥
তদেব তনুচার্বঙ্গ্যা বলিত্রয়বিভূষিতম্।
উদরং রাজতে শ্লক্ষ্ণং রোমাবলিবিভূষিতম্ ॥
জঘনং ত্বতিবিস্তীর্ণং ভাত্যস্যা রসনাবৃতম্।
ক্ষীরোদমথনে নদ্ধং ভুজঙ্গেনেব মন্দরম্ ॥
কদলীস্তম্ভসদৃশৈরূর্ধ্বমূলৈরথোরুভিঃ।
বিভাতি সা সুচার্বঙ্গী পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভা ॥
জানুনী গূঢগুল্‌ফে চ শুভে জঙ্ঘে ত্বরোমশে।
বিভাত্যস্যাস্তথা পাদাবলক্তকসমত্বিষৌ ॥

দেবশর্মা-বিপুল-ইন্দ্র-রুচির উপাখ্যান

[মহাভারত। অনুশাসন পর্ব, পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়]

মহামুনি দেবশর্মা। তাঁর পত্নী রুচি। শুচিস্মিতা অনিন্দ্যসুন্দরী তন্বী এই মুনিপত্নী। বরবর্ণিনী রুচির দেহে যৌবনশ্রীর পূর্ণ মাধুরী। সৌন্দর্য ও গুণগ্রামে ঋষিভার্যা অনুপমা; দেব-দানব-গন্ধর্বরাও তার চিত্তচাঞ্চল্যকর রূপের ছটায় মুগ্ধ। সব শুনে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র রুচির প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

তপোনিষ্ঠ দেবশর্মা ধর্মাচরণে দিবারাত্র অতিবাহিত করলেও সবার মনে স্ত্রীর রূপের উগ্র মাদকতার আসক্তি যে তীব্র সে খবর জানতেন। আবার অপ্সরাপ্রণয়ী ইন্দ্রের জারবৃত্তি দেবতা ও মানুষ সবার কাছে সুবিদিত। দেবশর্মাও জানতেন পরনারীর প্রমোদে দেবরাজ অতি লম্পট; সুতরাং রুচির প্রতি তার আসক্তি স্বাভাবিক। তাই আপন আশ্রমে অতি সতর্কতার সঙ্গে কালযাপন করতেন মুনি।

একদা দেবশর্মার মনে যজ্ঞানুষ্ঠানের বাসনা হোল। হোমের উপকরণ সংগ্রহ এবং নানান কাজে তাকে কয়েকদিনের জন্য আশ্রমের বাইরে যেতে হবে। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রীকে বহুদূরে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তাকে একা আশ্রমে রাখাও নিরাপদ নয়। বিশেষত ইন্দ্রের প্রণয়লোলুপতার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। গভীর চিন্তার পর মুনি একটা উপায় খুঁজে পেলেন। প্রিয় শিষ্য বিপুলকে ডেকে তিনি বললেন: 'বৎস, আমি যজ্ঞের কাজে কয়েক-দিনের জন্য আশ্রমের বাইরে যাচ্ছি। তুমি গুরুর সুযোগ্য শিষ্য, বিদ্যানুরাগী ও শ্রদ্ধাশীল; তাই তোমার হাতে আচার্যানী রুচির রক্ষণের সব দায়িত্ব অর্পণ করলাম। কপটচারী, মায়াবী আর বহুরূপী ইন্দ্রের কথা নিশ্চয় শুনেছ; সুতরাং সব সময় সাবধানে থাকবে[১]।'

১। তস্মাদ্ বিপুল যত্নেন রক্ষেমাং তনুমধ্যমাম্।
যথা রুচিং নাবলিহেদ্ দেবেন্দ্রো ভৃগুসত্তম॥

বিপুল গুরুবাক্য শিরোধার্য ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন: 'মায়াবী দেবতা ইন্দ্র মায়াশক্তিতে কি কি রূপ ধারণ করতে পারে?' দেবশর্মা বললেন: 'ইন্দ্র দেব-দানব-গন্ধর্ব-কিন্নর-রক্ষ-যক্ষ-বিদ্যাধর-মনুষ্য-পশু-পক্ষী যে কোন রূপ ধারণ করতে পারে। সে কখনো ধনুর্ধর, কখনো বজ্রধর; কখনো ব্রাহ্মণ, কখনো চণ্ডাল; কখনো সুন্দর, কখনো কদাকার; কখনো গৌর, কখনো কৃষ্ণ। চতুর ইন্দ্র গোপনচারী হ'য়ে সবার অলক্ষ্যে অদৃশ্যরূপে উপস্থিত হয়; এমন কি বায়ুর বেশ ধরতেও দক্ষ। যোগীর জ্ঞানচক্ষুতেও ধরা পড়ে না তার রূপ।' এই ব'লে শিষ্যকে আশীর্বাদ ক'রে গুরু যাত্রা করলেন।

বিপুল ভাবতে লাগলেন: 'ইন্দ্র মায়াবী, বলবান, দুর্ধর্ষ; তাই আশ্রম আবৃত না করলে রুচিকে রক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু আশ্রমের দ্বার রুদ্ধ করলেও তো তার প্রবেশ রুদ্ধ হবে না। তিরস্করিণী মায়ায় অদৃশ্য হ'য়ে অথবা বায়ুর রূপ গ্রহণ ক'রে সে তো যে কোন মুহূর্তে আশ্রমে প্রবেশ করতে পারে! তাহলে মুনিভার্যা রুচির মর্যাদাহানির আশঙ্কা পদে পদে! কিন্তু গুরুর আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়। এমন অসম্ভব কাজ কি ক'রে সম্ভব হবে আমার দ্বারা! যদি সফল হই, বুঝব এ আমার অভূতপূর্ব সিদ্ধি।' বিপুলের মনে হোল: 'তাহলে মানবীয় বলে বা কৌশলে দেবরাজের দূষণ থেকে রুচিকে রক্ষা করা অসম্ভব। অতএব যোগের শক্তিই বলীয়সী। তপোবলে আমি যদি গুরুপত্নীর প্রতি অঙ্গে আমার প্রতি অঙ্গের প্রভাব ন্যস্ত করি, আমাদের দুজনার তনু ও মন একীভূত করি—তবে ইন্দ্রের কোন প্রলোভনেই তিনি সংযম হারাবেন না। কিন্তু গুরুদেব আশ্রমে ফিরে এই ঘটনা শুনে নিশ্চয় ভাববেন তাঁর স্ত্রী তো আমার দ্বারাই কলঙ্কিতা হয়েছেন। তখন তিনি আমায় ভয়ঙ্কর অভিশাপ দেবেন[১]।'

১। যদ্যুচ্ছিষ্টামিমাং পত্নীমদ্য পশ্যতি মে গুরুঃ।
শপ্স্যত্যসংশয়ম্···

উপায়ান্তর না পেয়ে বিপুল আবার চিন্তা করতে লাগলেন : ইন্দ্রের ছলনাকে পরাস্ত করতে হ'লে অন্য কোন পথ নেই। সুতরাং যোগবলে রুচির দেহে প্রবেশ করাই বিধেয়। তখন তাঁর কামনা-বাসনা আমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। আমার চিত্ত নিষ্কলুষ, সুতরাং পাপের কোন আশঙ্কা রইল না। যেমন পদ্মপাত্রে জল, আমিও তেমনি রুচির দেহে লিপ্ত হয়েও নিরাসক্ত রইব ; পথিমধ্যে পথিক যেমন শূন্য গৃহের অভ্যন্তরে বাস করে, আমিও তেমনি তাঁর সর্বাঙ্গে উদাসীন হ'য়ে জড়িয়ে রইব। এইভাবে আমি দৈবী মায়াকে পরাজিত ক'রে আচার্যানীর সম্ভ্রম রক্ষা করব।'

একদিন অনিন্দ্যগাত্রী রুচি বসে আছেন আশ্রমে। এই সময় বিপুল এসে নানা কথার ছলে তাকে আনমনা করে তুললেন, তারপর আপন চোখের কিরণে তাঁর চোখের কিরণ যুক্ত ক'রে অঙ্গে অঙ্গে অণুতে অণুতে মিলিত হলেন। বায়ু যেভাবে আকাশে প্রবেশ করে, শিষ্যও তেমনি যোগের রহস্যবিদ্যার আশ্রয় নিয়ে গুরুপত্নীর সর্ব দেহে ও অন্তঃকরণে প্রবেশ করলেন, তাঁকে জড়িয়ে রইলেন ছায়ার মতো[১]। বিপুল তার মনের সমস্ত শক্তি ও চিন্তা তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত করতে লাগলেন, যাতে রুচির প্রতি অঙ্গে, প্রতি চিন্তায় আপন সদিচ্ছা প্রকাশ পায়। কিন্তু এ-সব ঘটনার বিন্দুমাত্র গোচর হোল না রুচির কাছে।

এদিকে দেবশর্মার আশ্রম পরিত্যাগের সংবাদ ইন্দ্রের কাছে পৌঁছে গেল। তিনি এমনই এক সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বহুদিনের অতৃপ্ত লালসা দ্বিগুণিত হোল। মুহূর্ত বিলম্ব না ক'রে দেবরাজ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তৎপর হলেন। অতুলনীয় রূপসম্পদে সজ্জিত হ'য়ে তিনি দেবশর্মার আশ্রমে পদার্পণ করলেন। প্রথমেই তার চোখে পড়ল বিপুল—স্থির অঙ্গ, নিশ্চল নয়ন, যেন

১। লক্ষণং লক্ষণেনৈব বদনং বদনেন চ।
অবিচেষ্টন্নতিষ্ঠদ্বৈ ছায়েবান্তর্হিতো মণিঃ ॥

চিত্রপটে আঁকা মূর্তি। তার অনতিদূরে রয়েছেন চারুগাত্রী উন্নত-পয়োধরা, পৃথুজঘনা, পদ্মপলাশাক্ষী, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা মুনিপত্নী রুচি।

হঠাৎ দিব্যকান্তি রমণীয়দর্শন পুরুষকে আশ্রমে প্রবেশ করতে দেখে রুচি সহসা হতচকিত; আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানাবার কৌতূহল জাগল তার মনে। কিন্তু গুরুপত্নীর সম্ভ্রম রক্ষাকারী বিপুল অন্তর থেকে প্রবল বাধা দিয়ে উঠলেন। তার ফলে অভ্যর্থনা দূরে থাক, রুচি নড়তেও পারলেন না, স্থির হ'য়ে বসে রইলেন।

ইন্দ্র স্বেচ্ছায় আপন পরিচয় প্রকাশ ক'রে স্মিতহাস্যে বললেন: 'বরবর্ণিনী, তোমার রূপমাধুরীতে প্রণয়াকুল হ'য়ে আমি ছুটে এসেছি তৃষিত চাতকের মতো। সুনয়না, আমায় গ্রহণ ক'রে তুরন্ত প্রেম পূর্ণ করো। তোমার অনুরক্ত প্রেমিকের প্রণয়নিবেদন প্রত্যাখ্যান কোরো না। সময় বৃথাই যায়[১]।'

রুচি সুরপতির আবাহন শুনলেন; কিন্তু পূর্ববৎ স্থির, নির্বাক। শিষ্য বিপুল তার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়া রুদ্ধ করেছেন; গুরুপত্নী তাই নির্বিকার, উদাসীন। ইন্দ্র ভাবলেন মুনিভার্যা হয়তো প্রবৃত্তি ও ধর্মের দ্বন্দ্বে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, সম্ভ্রম ও লোকলজ্জা তাকে বাধা দিচ্ছে। তিনি তখন আরও কাছে এসে অন্তরঙ্গ সুরে নিবেদন করলেন: 'সুন্দরী, দ্বিধা কেন? ভবিষ্যতে অমাদের প্রেমচরিতার্থতার এমন সুযোগ আর আসবে না। তাছাড়া, এই গোপন প্রণয়ের সংবাদ কেই বা জানবে?'

রুচির হৃদয়ে প্রবল বাসনা জাগল এ আহ্বানের প্রত্যুত্তর দিতে। ইন্দ্রের আবেদনে সাড়া দিতে মন চায়; কিন্তু বিপুলের দৃঢ় সংযমে তার সে ইচ্ছা নিরুদ্ধ। তার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল শান্ত-

১। ত্বদর্থমাগতং বিদ্ধি দেবেন্দ্রং মা শুচিস্মিতে।
ক্লিশ্যমানমনঙ্গেন ত্বৎসংকল্পভবেন হ।
তৎ সম্প্রাপ্নুহি মাং সুভ্রু পুরা, কালোঽতিবর্ততে॥

গম্ভীর অদ্ভুত প্রশ্ন: 'ভদ্র,. এ আশ্রমে আপনার আগমনের কি প্রয়োজন ঘটেছে!' তার কথায় ব্যাকরণ অলংকারের ঘাটতি নেই। কিন্তু এ প্রশ্ন করেই তার যেন লজ্জা হ'তে লাগল। ছি! ছি! এমন কথা আমি তো বলতে চাই নি!

ইন্দ্রের মুখে বিষণ্ণতা নেমে এল। অবাক বিস্ময়ে তিনি তাকিয়ে দেখতে লাগলেন মুনিপত্নীর এমন বৈপরীত্য। তিনি তখন দিব্য চক্ষু দিয়ে তাকালেন আর সঙ্গে সঙ্গে নির্মল দর্পণে প্রতিবিম্বিত বস্তুর মতো রুচির অন্তরে মুনিশিষ্য বিপুলকে দেখলেন। তার বুঝতে বাকী রইল না যে এই রক্ষাকুহকের মূলে স্বয়ং বিপুল। লজ্জায় ভয়ে দেবরাজ মুহ্যমান হ'য়ে পড়লেন।

সহসা বিপুল স্বদেহে ফিরে এলেন। তিনি ইন্দ্রকে রূঢ় ভৎর্সনা ক'রে ব'লে উঠলেন: 'দুর্বুদ্ধি, পাপ, কামুক পুরন্দর! আমার ঐকান্তিক চেষ্টায় তোমার কুপ্রবৃত্তি পাপ আচরণ থেকে রক্ষা পেল। আজ থেকে তুমি আর মানুষের শ্রদ্ধা পাবে না। অহল্যা দূষণের জন্য মহর্ষি গৌতমের অভিশাপে তোমার দেহে সহস্র ভগচিহ্নের পাপ কি বিস্মৃত হয়েছে? তুমি মূঢ়, অপরিণতবুদ্ধি, অস্থিরপ্রকৃতি। যদি ভাবো অমর বলেই এমন কাজ সহজেই করতে পারো, তাহলে বলি শোন—তপস্যার অসাধ্য কিছুই নেই। আমি তোমায় কৃপাবশে ক্ষমা করছি, ভবিষ্যতে কোনদিন এমন আচরণ কোরো না।'

কিছুদিন পর দেবশর্মা আশ্রমে ফিরলেন। বিপুল গুরুপত্নীর সম্মুখে দুরাচার ইন্দ্রের কাহিনী বর্ণনা করলেন। মুনি প্রীত হ'য়ে তাকে বর দান করলেন। কিন্তু বিপুল পাপ-আশঙ্কায় রুচির সর্ব অঙ্গে যোগবলে প্রবেশের ঘটনা গোপন রাখলেন। ইতিমধ্যে রুচির ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষ্যে চম্পা নগরী থেকে উপহারের দ্রব্য আনার প্রয়োজন দেখা দিল। পত্নীর অনুরোধে মুনি বিপুলকেই পাঠালেন। পথে যেতে যেতে বিপুল এক জায়গায় দেখলেন এক পুরুষ ও নারী পরস্পর হাত ধরাধরি ক'রে চাকার মতো ঘুরছে। হঠাৎ দুজনে কথা

কাটাকাটি আরম্ভ হোল। বিপুলকে সেখান দিয়ে পার হ'তে দেখে একজন ব'লে উঠল: 'আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, সে ব্রাহ্মণ বিপুলের মতো পরলোকে দুর্গতি লাভ করবে।' তার কথায় মুনিশিষ্য চমকে উঠলেন। ম্লান বিষণ্ণ বিপুল তাদের কথা ভাবতে ভাবতে চম্পার অভিমুখে এগোতে লাগলেন। কিছু পথ অতিক্রম ক'রে তিনি আবার দেখলেন পথের ধারে ছজন পুরুষ পাশা খেলছে। পাশার দান নিয়ে তাদের মধ্যে বিতর্ক চলেছে; হঠাৎ একজন বলল: 'আমাদের মধ্যে যে নিয়ম না মেনে দান ধরবে, মৃত্যুর পর বিপুলের মতো তার দুর্গতি হবে।' এবার বিপুল আরও বিস্মিত হলেন। তিনি কৃত কর্মের সূক্ষ্ম বিচার আরম্ভ করলেন। তার মনে হোল গুরুপত্নীকে রক্ষার কর্তব্যের সঙ্গে পাপবোধ মিশে আছে। তার হৃদয়ে অনুশোচনার আগুন জ্বলতে লাগল। তিনি নিজেই নিজেকে বললেন: 'আমি পাপবোধে সমস্ত ঘটনা গুরুর কাছে প্রকাশ করি নি!' বিপুল উপহার সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে আশ্রমে ফিরলেন, তারপর গুরুর কাছে অকপট হৃদয়ে পথের ঘটনা বর্ণনা করলেন।

মৃদু হেসে দেবশর্মা শিষ্যকে জানালেন: 'সেই পুরুষ ও স্ত্রী হোল দিন ও রাত্রি; তারা চক্রের মতো পরিবর্তিত হয়। পরবর্তী ছ-জন পুরুষ হোল ছটি ঋতু; তারা সবাই তোমার পাপ অবগত আছে। পাপাত্মা মানুষ গোপনে পাপ কাজ ক'রে মনে ভাবে ত্রিভুবনে কেউ তার আচরণ জানতে পারছে না। কিন্তু ছয় ঋতু, দিন ও রাত্রি জীবের সব আচরণ দেখতে পায়। কর্ম অনুষ্ঠানের পর যদি জিজ্ঞাসুর কাছে প্রকাশ করা না হয়, তাহ'লে অন্যায় হয়। তুমি আচার্যের ন্যস্ত দায়িত্ব পালন ক'রে গর্ব অনুভব করেছিলে, কিন্তু অন্তরে অন্যায়-বোধের দ্বন্দ্ব ছিল; তাই তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তারা এমন কথা বলেছে। অথচ গুরুপত্নীকে রক্ষা করার অন্য উপায় ছিল না। নারী ও পুরুষ সহজেই পরস্পর আসক্ত হয়; কিন্তু তুমি নিষ্পাপ

দেহ ও মনে রুচির সমস্ত ইন্দ্রিয়ে ও চৈতন্যে আসক্ত ছিলে। আমি তোমার উপর প্রীত। যথাকালে তোমার স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে।'

রাস-লীলা

[ভাগবতপুরাণ, দশম স্কন্ধ]

কিশোর কৃষ্ণ ও গোপাঙ্গনাদের অবলম্বন ক'রে পুরাণে যেসব প্রণয়-কাহিনী অতি প্রসিদ্ধ 'রাসলীলা' তাদের অন্যতম। বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ভাগবতপুরাণ ও পদ্মপুরাণে রাস বা হল্লীষক্রীড়ার মনোরম বর্ণনা পাওয়া যায়। কৌমুদীস্নাত নিশালগ্নে রমণীয় বনভূমিতে গোপীদের সঙ্গে প্রণয়ক্রীড়ার অভিলাষ জাগল কৃষ্ণের মনে। প্রেমিক কৃষ্ণের শ্রুতিসুখদ সঙ্গীতধ্বনিতে আকৃষ্ট ব্রজসুন্দরীগণ গৃহ পরিত্যাগ ক'রে ত্বরিতচরণে প্রিয়তমসকাশে উপস্থিত হলেন। তারপর মুগ্ধা গোপরমণীদের দ্বারা পরিবৃত গোবিন্দ শরচ্চন্দ্রমনোরম রাত্রিতে রাসক্রীড়ার আরম্ভরসে উৎসুক হলেন। সুন্দরীদের চঞ্চল বলয়-শিঞ্জনের সঙ্গে 'শরৎকাব্যগান' সহযোগে রাস শুরু হোল ; গোপীদের নূপুর-বলয়-কিঙ্কিনীর ঝংকারে রাসমণ্ডল আমোদিত হ'য়ে উঠল। নয়নাভিরাম ব্রজকিশোরকে দেখে গোপতরুণীদের চোখ জুড়োয়, বাণী শুনে কানে অমৃতবর্ষণ হয়, স্পর্শসুখে দেহ শীতল হয়, অঙ্গসুরভিতে নাসিকা পূর্ণ হয়। শিশু যেমন আপন প্রতিবিম্ব দেখে তার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তারই সঙ্গে ক্রীড়া করে, কৃষ্ণও তেমনি ব্রজনারীদের অনুরাগের আবেশে রাসের আনন্দরসে মেতে উঠলেন[১]। মিলন-পিয়াসী গোপীদের কাছে তখন কৃষ্ণবিরহের একটি মুহূর্ত যেন কোটি বৎসর। প্রিয়তম গোবিন্দের সান্নিধ্যে প্রেমবিধুরা সুন্দরীদের কবরী-বন্ধন, দেহবাস আর উত্তরীয় শিথিল হ'য়ে পড়ল, সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন বিকল হ'য়ে গেল ঃ

১। রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ।

লভি কৃষ্ণের কল্যাণপ্রদ
পরশন সুমধুর,
শুনি মনোহর বাণী, বিরহের
সন্তাপ হ'লো দূর।
প্রীতা অনুব্রতা যত গোপবালা,
বাহুগ্রন্থনে বিরচিয়া মালা,
গোবিন্দে ঘিরি মণ্ডল রচি
দাঁড়ালো তাহারা সবে।
তাহাদের সনে মিলিত হলেন
কৃষ্ণ রাসোৎসবে॥

গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত রাস
উৎসব হ'লো শুরু,
ব্রজসুন্দরী সঙ্গে লীলায়
মতিলেন লীলাগুরু।
প্রতি যুগলের মাঝে আপনায়
অভিন্নরূপে প্রকাশি মায়ায়,
নিবিড়াশ্লেষে তুষিলেন সবে
কণ্ঠে জড়ায়ে ধরি।
প্রতি অঙ্গনা হেরিল তাহারি
পার্শ্বে আছেন হরি॥

নৃত্যছন্দে রাসমণ্ডল
উদ্দাম উতরোল,—
কামিনী-চরণে ঝঙ্কারি ওঠে
নূপুর মত্ত বোল।
নৃত্যের দোলে বাজে শিঞ্জিনী

বাজে কঙ্কণ, বাজে কিঙ্কিনী,
শোভিলেন শ্যাম, অঙ্গনাদের
প্রতি যুগলের মাঝে,—
হৈম মণির অন্তরে যেন
মরকতমণি রাজে ॥

চপল চরণ, চঞ্চল কর,
সস্মিত ভ্রূবিলাস,
দোলায়িত কটি, কম্পিত চারু
কুচ, চঞ্চল বাস ।
কর্ণে দোদুল কুণ্ডল দোলে,
স্বেদধারা ঝরে তপ্ত কপোলে,
আলোল কবরী, শিথিল কাঞ্চী,
হরিগুণগানরতা,—
গোপিনীরা শোভে জলদচক্রে
যেন বিদ্যুৎল্লতা ॥

লভি সুনিবিড় শ্যাম-পরশন
তনুমন উচ্ছল,
নৃত্যের তালে গেয়ে ওঠে গান
মুগ্ধা গোপিনীদল ।
কণ্ঠে তাদের শ্যাম-অনুরাগে
সুললিত সুর-ঝঙ্কার জাগে,
সাতরঙ্গা যেন সপ্ত সুরের
সাতনরী মালা দোলে ।
মুখরিত হোল বিশ্বনিখিল
সেই সঙ্গীতরোলে ॥

কৃষ্ণের সাথে কণ্ঠ মিলায়ে
কোন বালা সুর তোলে ;
দোলায়িত কারো ক্ষীণ তনুলতা
নৃত্যের হিন্দোলে ।
খুলে খুলে পড়ে শিথিল কবরী
শ্লথ মল্লিকামালা পড়ে ঝরি,—
শ্রান্তিতে শ্যাম কণ্ঠে জড়ায়ে
শ্লথ বলয়িত করে,—
বক্ষোলগ্না হলো তার কেহ
মদির আবেশভরে ॥

প্রিয় পরশনে শিহরিত তনু
কোন বালা লীলাভরে
চুমে মুরারির সিত-চন্দন
চর্চিত বাহুপরে ।
কেহ বিহ্বলা রতি-অনুরাগে,
তপ্ত কপোল মিলালো সোহাগে,
মণি-কুণ্ডল-বিভা-মণ্ডিত
মুরারি গণ্ড'পর
প্রিয় চুম্বনে রাঙা হোল তার
স্ফুরিত বিম্বাধর ॥

কমলাকান্তে একান্তে লভি'
কান্ত বাহুর পাশে,
বন্দিনী ব্রজ-অঙ্গনা সবে
মাতি ওঠে উল্লাসে ।
ঝঙ্কারি ওঠে চরণে নূপুর,

মেখলায় বাজে রুনুঝুনু সুর।
কেহ কৃষ্ণের দুটি কল্যাণ
কান্ত-কোমল পাণি
রাখিল আপন স্তনদুটি পরে,
সাগ্রহে ল'য়ে টানি ॥

উৎপলদুল কর্ণে, কপোলে
স্বেদ পত্রাবলী আঁকা,
চূর্ণিত-চারু-কুন্তল দোলা
আননে মাধুরী মাখা ;
রাসবিহারিণী অঙ্গনা সবে
অচ্যুতসনে নৃত্যোৎসবে
মাতিয়া উঠিল পুলকে আকুল,
কুঞ্জ মুখরি' তোলে,
চারু চরণের মঞ্জীর, আর
কিঙ্কিনী কলরোলে ॥

নৃত্যছন্দে মঞ্জুল তনু-
বল্লরী ওঠে দুলি'
ছন্দিত চারু চরণে চরণে,
মালার বাঁধন খুলি
কবরী-কুসুম ঝরে ঝরে পড়ে,
যেন দক্ষিণ সমীরণ ভরে
দুলে দুলে ওঠে ফুলভারানতা
ব্রততী কুঞ্জবনে,—
রাসলীলাভূমি হ'লো মুখরিত
ভ্রমর গুঞ্জরণে ॥

মুরারি অঙ্গ সঙ্গ লভিয়া
বিকল বিবশ কায়,
আলোল অলক, কবরী খসিয়া
খুলিয়া পড়িতে চায়।
খসিছে নিচোল, আঁচল আকুল,
শ্লথ-নীবিখসা স্রস্ত দুকুল
পারে না অঙ্গে ধরিয়া রাখিতে
রতিবিহ্বলা বালা,—
বিশ্লথ হোল আভরণ, হোল
স্রস্ত কুসুমমালা॥

হেরি কৃষ্ণের লীলাসুন্দর
অপরূপ রাসকেলি,
রতি-অনুরাগে সুর-বনিতারও
হিয়া ওঠে উদ্বেলি।
ঊর্ধ্ব আকাশে মূক বিস্ময়ে
অপলক আঁখি মৃগাঙ্ক রহে
স্তব্ধ দাঁড়ায়ে গতিহারা, যত
তারাদলে ল'য়ে সাথী,—
সুদীর্ঘ হোল অচল প্রহর
রাস-পূর্ণিমা রাতি॥

প্রকৃতি ও জীবন-আলেখ্য

মাল্যবান্‌পর্বতে বর্ষাঋতু

[বাল্মীকিরামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড]

বালীকে নিধনের পর সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত ক'রে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সঙ্গে মাল্যবান্‌ গিরিতে উপস্থিত হলেন ; তখন বর্ষার সমারোহ ; কবি রামচন্দ্রের মুখে বর্ষার রূপটি চিত্রিত করেছেন :

সৌমিত্রি দেখ, বনে বনান্তরে এই সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত বর্ষার আগমন ঘটেছে। পর্বতপ্রমাণ মেঘমালায় সারা আকাশ আচ্ছন্ন ; সূর্যরশ্মির তেজে সমুদ্রের রস নয় মাস গর্ভে ধারণ ক'রে দ্যুলোক রসায়ণ বর্ষণ ক'রে চলেছে[১]। মেঘের সোপান-পংক্তিতে আরোহন ক'রে কুটজ ও অর্জুনের মালা দিয়ে কে যেন সূর্যকে সাজিয়েছে ; কোথাও আকাশের গায়ে ছোট ছোট কালো মেঘ যেন শুভ্র দেহে কালো তিল ; কোথাও স্নিগ্ধ মেঘমালা যেন সন্ধ্যারাগে তাম্রবর্ণ, মাঝে মাঝে তাদের অন্তরে ক্ষতচিহ্নের মতো পাণ্ডুবর্ণ আভা ; কোথাও আকাশ যেন কামনায় আতুর—মন্দ মারুত তার দীর্ঘ শ্বাস আর পাণ্ডুর মেঘরাজি চন্দনের প্রলেপ। কেতকীর গন্ধে আমোদিত জলভরা মেঘের স্পর্শে স্নিগ্ধ বায়ু কর্পূরের মতো সুবাসিত ও শীতল ; ইচ্ছা জাগে তাকে দুই হাতের মুঠোয় ভ'রে মনের আনন্দে পান করি। প্রকৃতি আজ নিদাঘের সব দোষ থেকে মুক্ত ; ধরণীর ধূলিজাল প্রশান্ত, বায়ু শীতলস্পর্শ ; রাজন্যবর্গের দিগ্বিজয়যাত্রা স্তব্ধ আর প্রবাসী মানুষ গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তনপিয়াসী ; চক্রবাক-চক্রবাকী মানস-সরোবরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে। আকাশ কোথাও কালো মেঘে ঢাকা, কোথাও প্রকাশমান, কোথাও অপ্রকাশমান ;

১। নবমাসধৃতং গর্ভং ভাস্করস্য গভস্তিভিঃ।
পীত্বা রসং সমুদ্রাণাং দ্যৌঃ প্রসূতে রসায়ণম্‌॥

কোথাও পর্বতে আশৃঙ্গ অবনত—যেন প্রশান্ত সমুদ্র[১]। নববর্ষার জল আরণ্যক মাটির মিশ্রণে গৈরিকবর্ণ, তার সঙ্গে মিশেছে কদম ও সর্জফুলের ঝরেপড়া পরাগ ; দ্রুতলয়ে ধেয়ে চলেছে পাহাড়ী ঝর্ণা, তার কুলুকুলু ধ্বনি ক্বচিৎ কেকারবে মুখরিত ; রসলোভী ভ্রমর ও মৌমাছির দল পরিপক্ক জম্বুফলগুলির রস আহরণে মত্ত, বাতাসের আন্দোলনে পক্ক আম্রফলগুলি শাখাভ্রষ্ট হ'য়ে মাটিতে পড়ছে। নদীরা বহে চলেছে, মেঘেরা বর্ষণ করছে, মত্ত হস্তীরা গর্জন করছে, বনপ্রদেশ রমণীয়, প্রিয়াহীন মানুষ চিন্তামগ্ন, শিখীরা আনন্দমুখর আর ভেককুল কলমুখর[২]। গর্জনশীল মেঘমালা পর্বতের সুউচ্চ শৃঙ্গে বিশ্রাম করতে করতে এগিয়ে চলেছে ; আনন্দমুখর বলাকাপংক্তি আকাশপথে উড়ে চলেছে—যেন মেঘের গায়ে শ্বেত-কুসুমের মালা। দ্রুতগামিনী স্রোতস্বিনী সাগরের অভিমুখে, সানন্দ বলাকারা মেঘের অভিমুখে আর অনুরাগিণী নারী প্রিয়জনের অভিমুখে চলেছে। বর্ষার মেঘদর্শনে ময়ূরেরা নৃত্যমুখর হোল, কদম্বের শাখা কুসুমিত, গাভীরা বৃষের প্রতি কামাতুর, শস্য-লতাতৃণগুল্মে ধরণী সাজল সুন্দরী[৩]। কেতকী-কুসুমের গন্ধ আঘ্রাণ ক'রে মদমত্ত হাতীর দল বননির্ঝরের উপকণ্ঠে কেকাধ্বনির সঙ্গে বৃংহণনাদ যুক্ত করল। জলভারে গুরুগম্ভীর মেঘের সঙ্গে যেন রাজকীয় আড়ম্বর—বিদ্যুৎচমক তার স্বর্ণবর্ণ বিজয়পতাকা, গুরুগুরু রব রণভেরীর নিনাদ। বন্য হাতীর দল মেঘধ্বনিকে বৃংহণ ভেবে ভুল ক'রে পথের মাঝে দাঁড়াল; ভ্রমরের মধুর ঝংকারে, ভেকের

১। ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং / নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্বতসন্নিরুদ্ধং / রূপং যথা শান্তমহার্ণবস্য ॥

২। বহন্তি বর্ষন্তি নদন্তি ভান্তি / ধ্যায়ন্তি নৃত্যন্তি সমাশ্বসন্তি।
নদ্যো ঘনা মত্তগজা বনান্তাঃ / প্রিয়াবিহীনাঃ শিখিনঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥

৩। জাতা বনান্তাঃ শিখিসুপ্রনৃত্তা / জাতাঃ কদম্বাঃ সকদম্বশাখাঃ
জাতা বৃষা গোষু সমানকামা / জাতা মহী সস্যবনাভিরামা ॥

গম্ভীর নির্ঘোষে আর মেঘের মৃদঙ্গনাদে বনভূমিতে যেন সংগীত-সমারোহ শুরু হয়েছে। গজেন্দ্ররা মদমত্ত, গবেন্দ্ররা আমোদিত, মৃগেন্দ্ররা বনে বনে বিক্রান্ত এবং নরেন্দ্ররা বিনীত। ঝরঝর বেগে ঝরছে বর্ষাধারা, বিপুল বেগে বইছে বায়ু, নদীরা ছুটছে দুকূল ছাপিয়ে ; সারা আকাশ ঘনমেঘে ঢাকা, রাত্রিতে তারা অদৃশ্য, দিনে সূর্য অদৃশ্য, চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ধারাসম্পাতে আজ ধরণী পরিতৃপ্তা।

নব ববষার দিন এলো আজ
ওই দেখো দূরে চেয়ে,
শৈল সমান ঘন কালো মেঘ
আকাশ ফেলেছে ছেয়ে।
এলো বাঞ্ছিত বর্ষণক্ষণ,
ঝরঝর ধারা ঝরে অনুখন,
নব জলধারে সিক্তা, দাহন-
তপ্তা ধরণীতল—
বেদনাবিধুর বৈদেহী সমা
ফেলে যেন আঁখিজল॥

সজল বাতাস, সুরভিত বন
কেতকীপরাগরাশে,
কহ্লার সম স্নিগ্ধ পরশ
মেঘপথে নেমে আসে।
ভাখো ভাখো চেয়ে শৈলশিখরে,
অর্জুন-তরু ফুলে ফুলে ভরে,—
কেতকী ছড়ালো সুরভি, অঝোর
বারিধারা মেঘ ঢালে,—
সজ্জিত যেন সখা সুগ্রীব

অভিষেক স্নানকালে ॥

অম্বর-ছাওয়া পুঞ্জ মেঘের
কজ্জল নীলিমায়,
ক্ষণে ক্ষণে ঐ উঠিছে চমকি
বিজলীউজল ভায়।
বিদ্যুল্লেখা হেরি কালো মেঘে
বারে বারে ওঠে আঁখি 'পরে জেগে
জানকীরই ছবি, মনে হয় যেন
রাবণ-অঙ্ক 'পরে
অসহায়া সীতা কম্পিতকায়া
ব্যাকুল শঙ্কাভরে[১] ॥

স্নিগ্ধ সজল পুঞ্জমেঘের
শ্যাম অঞ্জন মাখা
আকাশ-আঙ্গিনা কভু দেখা যায়,
কখনো বা পড়ে ঢাকা।
দূরে একফালি আকাশেরে ঘিরে
থরে থরে মেঘ জমে ওঠে ধীরে,
নিবিড় গহন ঘন অবকাশে
জাগে সুনীলাম্বর—
শৈল-মালার অবরোধে যেন
শান্ত রত্নাকর ॥

১। কশাভিরিব হৈমীভির্বিদ্যুদ্‌ভিরভিতাড়িতম্।
অন্তস্তনিতনির্ঘোষং সবেদনমিবাম্বরম্ ॥
নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী ॥

বিজলীঝলকে বিজয়পতাকা
হংসবলাকা হার,
সুশ্যামকায়, সুবিপুলদেহ,
ভেসে চলে মেঘভার।
গিরিসম সুবিশালকায়
রণগজ যেন বেগে ধেয়ে যায়,
ঊর্ধ্বে ঝলসে দীপ্ত কেতন
কণ্ঠে মালিকা দোলে
জাগে গম্ভীর বৃংহিত নাদ
ঘন বজ্রের রোলে[১] ॥

কোথাও বনানী অলিদল সনে
গুঞ্জনগীতি গায়,
কলাপীর তালে নৃত্যছন্দ
জাগে বনবীথিকায়।
কোথাও মত্ত বারণের সনে
জাগে উদ্দাম মত্ততা বনে,
ঘন মেঘে ঐ মিশিছে সজল
ঘন কালো মেঘ এসে ;
যেন দাবাগ্নি-দগ্ধ শৈল
দগ্ধ শৈলে মেশে ॥

শন্ শন্ স্বনে ছুটিছে পবন,
ঝরে ঝরঝর ধারা,
কলকল্লোলে কূল ভেঙ্গে

১। বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ / শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিসন্নিকাশাঃ
গর্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা / মত্তা গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ ॥

ছোটে বন্ধনহারা।
দিনের সূর্য, নিশীথের তারা
ঘন মেঘতলে হলো আজি হারা,
আঁধারে বিলীন বিশ্বনিখিল
দশদিশি মসীলিপ্ত।
নববারিধারা বর্ষণে হোল
তাপিতা ধরণী তৃপ্ত॥

শরদ্‌-বর্ণনা

[মহাকবি কালিদাসের ঋতুসংহার]

শরতের রূপ রমণীয় অতি
নববধূ বেশে সমাগত সুখে
কাশ অংশুক ধারণ করিয়া
বিকচ কমল মনোজ্ঞ মুখে,
পক্ক-ধান্য চারু-তনু-রুচি
মত্ত-হংস নিনাদ নূপুর,
কমনীয় সাজে সেজেছে ধরণী
পেলব কোমল দুঃখ হয় দূর।[১]

ধরণী কাশের গুচ্ছে সাজিয়া
রজনী চন্দ্র কিরণ শীকরে,
নদীজলে হাঁস, সরসী কুমুদে,
সপ্তপর্ণী অরণ্যে ধরে,
কুসুমের ভারে অবনত রহি
উপবন-তল শ্বেত মালতীতে,

১। কাশাংশুকা বিকচ-পদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা / সোন্মাদহংসনূপুরনাদরম্যা।
আপক্ব-শালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ / প্রাপ্তা শরন্নবধূরিব রূপরম্যা।

শুভ্র আভাসে দশ দিশি ভাসে
সবাকার মন হরণ করিতে।

যৌবন-মদ-গরবী প্রমদা,
মন্দ মন্দ গতি হেন নদী
মধুর চপল শফরীরসনা
বহি চলে ধীরে সদা নিরবধি!
প্রান্তেতে তার ধবল মরাল
বিহঙ্গকুল হারের আভায়
বিশাল বিপুল তট-নিতম্ব
ধরিছে জগৎ শরৎ-শোভায়।

দলিত আঁজন চিকন শোভন
মধুর সে রূপ কান্তিতে নভে,
বন্ধুক ফুলে রচিত অরুণ
পক্ক ধান্যে ভরা ক্ষেত যবে।
প্রকৃতির শোভা হেন কোন যুবা
হৃদয়ে না ভরে ব্যথা নিদারুণ,
এ হেন কালের অনুভূতি ভরি
জেগে রয় লয়ে ভাব সকরুণ।

রজনী তারকা ভূষণে সাজিয়া
বিমল চাঁদিনী কোমল বসনে,
তরুণ প্রমদা অনুদিন বাড়ে
সরাইয়া মেঘ ইন্দু-বদনে।[১]

১। তারাগণ-প্রবরভূষণমুদ্বহন্তী / মেঘাবরোধ-পরিমুক্ত-শশাঙ্ক-বক্ত্রা।
জ্যোৎস্না-দুকূলমমলং রজনী দধানা / বৃদ্ধিং প্রয়াত্যনুদিনং প্রমদেব বালা।

আঁখি উৎসব চিত্ত হরণ
মরীচি মালায় সুশোভার ভারে
খুশী ভরা চাঁদ শীতল কিরণে
বর্ষণ করি সুমধুর ধারে।
পতি-বিরহের বিষজ্বালা সয়
ক্ষত দেহটিরে জ্বালি করে ক্ষয়!
এ-হেন দিনেতে যদি চিরতরে
পতি সাথে ভাবে মিলন না হয়।

ফসলে আনত ধান্যের ক্ষেতে
সমীরণ বহি হিল্লোলি ধায়,
কুসুমের ভারে অবনত তরু
বিকশিত করি অরণ্যে তায়,
ফুল্ল কমল সরসীর বুকে
চল-চঞ্চলি দেয় তারি নীর,
এমনি একালে সকলি শোভন
যুবকের মন করিছে অধীর।

হংস করিছে অঙ্গনা জয়
অনুকারী তার সুললিত গতি,
মুখচন্দ্রিমা বিকচ কমল
কলতরঙ্গ-সুন্দর অতি;
ভ্রূবিলাস-ভাষ দেয় তারি নীরে
নীল উৎপল চাহনি সুনীল
বিকাশি ধরেছে নারী আঁখিটিরে,
ভরিছে তাহারি শোভায় নিখিল।

কুসুমের ছোঁয়া লাগিয়া শীতল
বায়ু বহে আজি শরতের কালে,
জলদের জালবৃন্দ বিগত
নির্মল শোভা দশদিক্ ভালে,
সুবিমল নীর শুষ্ক পঙ্ক,
অমল ধবল কিরণের ধারা
ইন্দুসঙ্গ লভিয়া ধরেছে
বিচিত্ররূপ গগনের তারা।

পথিকেরা হেরে উৎপল 'পরে
প্রিয়ার অসিত লোচনশোভা
হংসের কলনিঃস্বনে শোনে
কনক-মেখলা-ধ্বনি মনোলোভা,
বন্ধুক ফুলে ওষ্ঠ রাঙানো
হেরিছে রমণী রহিয়াছে সাজি
ভাবিয়া তাহারা ভ্রান্ত মনেতে
করিছে রোদন শরতেতে আজি।[১]

একটি নিদাঘ

[বাণভট্টকৃত হর্ষচরিতের দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস]

গ্রীষ্মের আবির্ভাব ঘটেছে। ললাট-পীড়নকারী সূর্যের তেজ প্রখর হ'তে লাগল ; সুন্দরী নারীদের লাবণ্যললিত চাঁদমুখ আজ যেন সূর্য-

১। হংসৈর্জিতা সুললিতা গতিরঙ্গনানাম্
অম্ভোরুহৈর্বিকসিতৈ-র্মুখচন্দ্রকান্তিঃ।
নীলোৎপলৈ-র্মদকলানি বিলোকিতানি
ভ্রূবিভ্রমাশ্চ রুচিরাস্তনুভিস্তরঙ্গৈঃ॥

উপাসনার ব্রত পালন করছে। সৌর সন্ন্যাসীদের মতো তাদেরও কপালে তিলক; বেণীবদ্ধ অলক ; চীরচীবরের তুল্য স্বল্প বাস ; অক্ষ-মালার মতো স্বচ্ছ স্বেদবিন্দুর বলয়, আর মুক্তার হার। কুমুদিনীরা যেমন সূর্যের আলোর স্পর্শে ঘুমিয়ে পড়ে, তেমনি অসূর্যম্পশ্যা সুন্দরীরা গায়ে শীতল চন্দনের প্রলেপ দিয়ে দিনের বেলাটা ঘুমিয়েই কাটাত লাগল; নিদ্রায় অলস তাদের চোখ রত্নের আলোকই সহ্য করতে পারে না,—তাহলে কেমন ক'রে সহ্য করবে সূর্যের উষ্ণ তাপ ? চক্রবাক-চক্রবাকী সন্ধ্যাবেলায় নদীকে অভিনন্দন জানিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হ'য়ে শীতল রাত্রিটুকু বিরহের মধ্যেই অতিবাহিত করে। নদীগুলি যেমন ক্ষীণস্রোতা হ'তে লাগল, চন্দ্রালোকিত রাত্রি-গুলিও ক্ষীণকায়া হ'তে লাগল। সবারই মনে ইচ্ছা জাগল নতুন ফোটা পারুল ফুলে সুবাসিত শীতল জল পান করি, তবু মন ভরে না,—তারা যেন শীতল হাওয়াকেও পান করতে চায়।

ধীরে ধীরে সূর্যের শৈশব পার হোল, খরতর হোল তার তেজ। সরোবর শুষ্ক, নদীরা শীর্ণ, ঝর্ণাগুলি স্তিমিত। বেজে উঠল ঝিল্লীর ঝংকার ; কাতর কপোতের আর্ত কুজনে বিশ্ব যেন বধির। পাখীরা দীর্ঘ শ্বাস ফেলেছে ; বাতাসে ভেসে বেড়ায় শুষ্ক গোময়। লতাগাছ বিরল; ধাই ফুলের গাছে গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল,—টকটকে লাল তাদের রঙ ; সিংহশিশুরা রক্তের কৌতূহলে সেগুলিই জিভ দিয়ে চাটতে থাকে[1]। ক্লান্ত হস্তিযূথের মদবারির উদগারে পর্বতের কটিদেশ আর্দ্র হোল। মদজলের ক্ষীণ ধারা ধীরে ধীরে শুকিয়ে কালো দাগ হ'য়ে গেল আর ভ্রমরেরা তার উৎকট গন্ধে আকৃষ্ট হ'য়ে নিশ্চলভাবে সেখানেই বসে রইল।

১। ক্রমেণ চ খরখগময়ূখে খণ্ডিতশৈশবে, শুষ্যৎসরসি, সীদৎস্রোতসি, মন্দনির্ঝরে, ঝিল্লিকাঝংকারিণি, কাতরকপোত-কূজিতানুবন্ধ-বধিরিত বিশ্বে, শ্বসৎপতত্রিণি, করীষংকষমরুতি, বিরলবিরুধি, রুধিরকুতূহলি-কেশরিকিশোর-কলিহ্যমান-কঠোরধাতকীস্তবকে…।

মন্দার গাছগুলি রাশী রাশী লাল ফুলে সেজেছে, তাই গ্রামের সীমান্ত সিঁদূরের মতো রাঙা হ'য়ে উঠল। রোদে মুহ্যমান মহিষেরা স্ফটিক পাথরগুলিকে দেখে জলভ্রমে এগিয়ে এল, তারপর জল না পাওয়ার ক্ষোভে শিঙের অগ্রভাগের গুঁতোয় সেখানে ফাটল ধরিয়ে দিল। গর্মুতি লতায় জাগল মর্মর ধ্বনি ; তুষানলের মতো তপ্ত লাল ধুলোয় কাতর হ'য়ে উঠল কুক্কুটের দল ; গর্তে আশ্রয় নিল শজারু। জলাশয়ের ধারে অর্জুনগাছের ছায়া থেকে ক্লান্ত কুরর পাখীরা বিকট শব্দ ক'রে ডাক দিল, তা শুনে পুকুরের পুঁটিমাছের গায়ে যেন জ্বর এসে গেল, ভয়ের চোটে তারা লাফ দিয়ে উঠল, আর অমনি চিৎ হ'য়ে পড়ল পাঁকের উপর। বনের দাবানলে যেন জগতের নীরাজনার বাদ্য বেজে উঠছে। রজনী কি রাজযক্ষ্মায় ভুগছে[১] ?

নিদাঘ আরও কঠোর হ'য়ে উঠল। বালুকাময় মরুপ্রান্তে দুর্বার দস্যুদলের মতো দুরন্ত হাওয়ারা ঘুরে বেড়ায়; আলকুশী গাছের পাকা ফলগুলি রোদের তাপে ফেটে গিয়ে বাতাসে উড়তে উড়তে লোকের গায়ে এসে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গা লাল হ'য়ে ফুলে গেল, আর তারা তাই কণ্ডূয়ন করতে থাকল—মনে হোল লাল কাঁকর-মেশানো মাটিতে কর্ষণ চলছে। ঝোড়ো হাওয়ায় ছোট ছোট কুঁচি পাথর ভেসে বেড়ায়; উষ্ণ বায়ু মুচুকুন্দের মুকুলগুলি পুড়িয়ে দিল। অসহ্য রোদে পীড়িত চিলের মুখ থেকে গাঁজা বেরোতে লাগল, আর তাতে সারা গা ভরে গেল; মধ্যাহ্ন সূর্যের তেজ মৃগতৃষ্ণিকায় নদী-তরঙ্গের মায়াজল রচনা করতে লাগল। মরুপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে শুকনো শমী পাতা, তাতে মর্মর জাগিয়ে ছুটে বেড়ায় তপ্ত হাওয়া ; ঘূর্ণীঝড়ে মণ্ডলাকারে উড়তে থাকে এলোমেলো ধূলোর রাশী—যেন রাসের আনন্দনৃত্যের শেষে আরভটি নাচের হৈহুল্লোড় চলেছে ;

১। ঘর্মমর্মরিতগর্মুতি, তপ্তপাংশুকুক্কুল-কাতরবিকিরে, বিবরশরণ-শ্বাবিধে, তটার্জুনকুররকূজাজ্বর-বিবর্তমানোত্তান-শফরশার-পঙ্কশেষপল্বলাম্ভসি, দাবজনিত-জগন্নীরাজনে, রজনীরাজযক্ষ্মণি···।

দাবাগ্নিতে বনের মাটি পুড়ে কালো হ'য়ে গেছে। জৈন সাধুরা যেমন ময়ূরপুচ্ছ পরে দলে দলে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি হাওয়ারা বন্য ময়ূরের ঝরেপড়া পেখমগুলি উড়িয়ে দিয়ে বইতে লাগল। করঞ্জ-গাছের শুষ্ক মঞ্জরী বাতাসে দুলতে দুলতে ঝন্‌ঝন্ ক'রে বাজছে—যেন বিজয়-প্রস্থানের বাদ্য। বন্য মহিষের নাক দিয়ে সশব্দে দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। বায়ুহরিণেরা দলবেঁধে ছুটছে—যেন বাতাসের শিশুরা মাতামাতি করছে।

ধান-মাড়াইয়ের জায়গা শুকিয়ে খট্‌খট্ করছে, সেখানে রোদে পোড়া তুষগুলি হাওয়ায় উড়ছে। গরমের দাহ যেন অবীচি-নরকের জ্বালা। শিমূলের পাকা ফলগুলি রোদে ফট্‌ফট্ শব্দে ফাটছে আর তুলোর আঁশ উড়ছে—যেন লোমশ হাওয়ারা দাপাদাপি করছে। দাদের রোগী যেমন গাত্র কণ্ডূয়ন করে, হাওয়া তেমনি শুক্‌নো পাতা-গুলিকে এলোমেলো উড়িয়ে বেড়ায়। মৃতপ্রায় লতাপুঞ্জ মাটিতে পড়ে আছে, তার ভিতর দিয়ে দমকা বাতাস ছুটে যাওয়ায় সেগুলো শিরার মতো ফুলে ফুলে ওঠে। শিহর লাগা যবের শীষ যেন হাওয়ার দাড়ি, ক্ষিপ্র শজারুদের কাঁটা তার তীক্ষ্ণ দাঁত; আগুনের লকলকে শিখা তার জিভ ; সাপের উড়ন্ত খোলস পাকা চুল।

উষ্ণ বায়ু ব্রহ্মাণ্ডের রস বুঝি নিঃশেষে পান করবে, এই খেয়ালে সে পদ্মবনের মধু অঞ্জলি ভরে পান করছে। বেণুবনে বাঁশ-ফাটার শব্দ যেন নিদাঘের দুন্দুভি বাজছে,—পৃথিবীর সমস্ত জলকে সে পান করবে তারই ঘোষণা। চাষ পাখীদের খসে-পড়া পালকে রাস্তা প্রায় ঢাকা। হাওয়ার শরীরটা রোদে ঝলসে কালো আর তামাটে হ'য়ে গেছে ; মাটিতে ছড়িয়ে পড়া কালোমুখ লালচে কুচফলগুলি যেন যেন তার শরীরের পোড়া দাগ! গিরিগুহার অভ্যন্তরে বুনো হাওয়ার সে কি হুংকার! পারিভদ্র গাছের স্তবকে স্তবকে রক্ত কুসুম—যেন ভুবনভস্মীকরণের অভিচার-চরু পাক ক'রে রক্তের আহুতি প্রস্তুত ; তারপর সেই ফুলগুলি ঝরে পড়ছে মাটিতে—যেন

বন-বিভাবসুর তর্পণ শুরু হয়েছে।[১] তপ্ত পাহাড়ের চূড়া থেকে গলে পড়া শিলাজতুর স্রোতে চতুর্দিক ব্যাপ্ত। গাছের কোটরে চটক পাখীদের ডিমগুলি দাবানলের তাপে ফেটে গেছে; বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে তার উৎকট গন্ধ; আর সেগুলি খাওয়ার লোভে পিঁপড়ের দল এসে জুটেছে! বনে বনে দাবাগ্নি জ্বলছে! গিরিগহ্বর থেকে বন্য হাওয়ার হুহু শব্দ আসে,—যেন বড় বড় জাঁতার চাপে ক্ষুব্ধ অজগরের ভয়ঙ্কর নিশ্বাস।

সবুজ ঘাসের সন্ধানে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায় হরিণেরা; তরুতলের বিবর থেকে বেরিয়ে আসে কপিলরঙের নেউল। দূরের দাবাগ্নি লাক্ষারসে রাঙানো অধরের মতো লাল; কোথাও শকুনের বাসাগুলি পুড়ে গেছে আর তাদের লম্বা লম্বা পালকগুলি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে বাতাসের বেগকে যেন বাড়িয়ে দিয়েছে; কোথাও দাবদগ্ধ লতাপাতার কটু গন্ধে আকাশ ভরে উঠেছে; বাঁশবনে বাঁশের ডগায় আগুন লেগেছে, কোথাও দগ্ধ গুগ্‌গুলের উগ্র সুবাস; শুষ্ক জলাশয়ের নীবার ধানগুলি ফুটে ফুটে খই হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে; শর আর মদন গাছের ফুল থেকে মূল পর্য্যন্ত দগ্ধ হ'য়ে গেছে; স্থলকচ্ছপগুলি বনের আগুনে ঝলসে গেছে, তাই বাতাসে আধপোড়া মাংসের উৎকট গন্ধ; তৃণলতার ভিতর থেকে পোকামাকড়রা বেরিয়ে আসছে; জলাশয়ের জল গরম, সেখানে শামুক ও ঝিনুকের চট্ চট্ শব্দ শোনা যায়।

বনগ্রামকের দৃশ্য

[বাণভট্টের হর্ষচরিত, সপ্তম উচ্ছ্বাস]

মহারাজ হর্ষ বিধবা ভগিনী রাজ্যশ্রীর সন্ধানে অশ্বারোহণে যাত্রা করেছেন; চলেছেন বিন্ধ্য অরণ্যানীর অভিমুখে। দূর পথ অতিক্রম

১। গিরিগুহা-গম্ভীরঝাংকার-ভীষণভ্রান্তয়ঃ, ভুবনভস্মীকরণাভিচারচক্র-পচনচতুরাঃ, রুধিরাহুতিভিরিব পারিভদ্রদ্রুম-স্তবকবৃষ্টিভিঃ তর্পয়ন্তঃ তারবান্ বনবিভাবসূন্...।

ক'রে তিনি উপস্থিত হলেন বিন্ধ্যসীমানায়; তারপর সেই পথে অগ্রসর হ'তে হ'তে দেখতে পেলেন দুপাশের আরণ্যক গ্রামগুলি।

হর্ষ দেখলেন—কোন গ্রামে জংলী ধান থেকে ছাড়ানো তুষের গাদায় আগুন লেগে বনপ্রদেশ ধূমেল হ'য়ে উঠেছে; কোথাও প্রকাণ্ড বটের তলায় শুষ্ক শাখাসঞ্চয় দিয়ে তৈরী গোবাট; বাঘে বাছুর মেরে ফেলেছে, তাই রুষ্ট রাখালের দল খড়ের উপর শুক্‌নো চামড়া দিয়ে বাছুরের প্রতিমূর্তি ক'রে পেতে রেখেছে বাঘমারার ফাঁদ। ভিন্ গাঁয়ের কাঠুরিয়ারা চুরি ক'রে কাঠ কাটতে এসেছিল বনে, ক্রুদ্ধ বনপালক জোর ক'রে তাদের কুঠার ছিনিয়ে নিয়েছে। কোথাও ঘন ঝোপের মাঝে চামুণ্ডা দেবীর মণ্ডপ; চতুর্দিকে গভীর জঙ্গল, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম।

কোথাও অল্পস্বল্প অনাবাদী জমি; ছেলেমেয়েদের পেট ভরাবে কি দিয়ে এই চিন্তায় ব্যাকুল চাষীরা হুম্ হুম্ শব্দ করতে করতে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে অনাবাদী খেতকে আবাদী বানাচ্ছে আর পাথর ও মাটির ঢেলা দূরে ছুঁড়ে দিচ্ছে; টুক্‌রো টুক্‌রো জমি, লোহার মতো কালো মাটি; কাশফুলে ভরে গেছে তড়াগ; এখানে ওখানে গোড়ায় কাটা গাছের মূল থেকে নতুন শাখাপ্রশাখার সমারোহ; কোথাও লজ্জালু ও কোকিলাক্ষ গাছের ঘন ঝোপ। চাষের জমি বিরল, দু-একটি খেতে ফসলবোনার কাজ চলেছে।

বনের মাঝে যাতায়াতের পথ, পথিকদের আনাগোনা কম, তাই রাস্তা অস্পষ্ট; কোথাও উঁচু মাচা বাঁধা হচ্ছে, বোঝা গেল রাত্রিতে সেখানে বুনো জানোয়ারের উপদ্রব ঘটে।

ধূলিলাঞ্ছিত নবপল্লবের ছায়ায় পথিকদের বিশ্রামস্থান। বনের ভিতর অসংখ্য শালগাছ, তাদের শাখায় গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল; নবখনিত কূপের উপকণ্ঠে নাগস্ফুট লতার ঝোপ, চতুর্দিকে নাগফণীর আবরণ। অচ্ছিদ্র কটতৃণ দিয়ে তৈরী ঝুপড়ী ঘর; মাটির শরায় যবের ছাতু খেয়ে ফেলে দিয়েছে উঠানের কোণায়; তার চারিদিকে মাছির ভীড়,

আর পিঁপড়ের সারি। পথিকেরা জাম খেয়ে আঁঠিগুলি ছুঁড়ে দিয়েছে পথের এদিক-ওদিক, রঙ-বেরঙের আঁঠিতে পথের শোভা বেড়েছে। স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত ধূলি-কদম্ব, মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছে তাদের রেণু—পৃথিবীর বুকে যেন রোমাঞ্চ জাগছে। বাঁশের মাঁচায় কন্টকিত কর্করীলতা ফুলে-ফলে ভরা; পুষ্ট সরস কাঁকুড়গুলি দেখেই যেন গৃহস্থের তৃষ্ণা মিটে যায়।

মাটির কুঁজোর গায়ে ভিজে কাপড় আর নীচে বালুকা; শেওলা-পড়া বড় বড় অলিঞ্জে (জালা) ঠাণ্ডা জল: ছোট ছোট ঘড়ায় পাটল রঙের কাঁকর দিয়ে জল ঠাণ্ডা হচ্ছে; ঘড়ার মুখ বেড়ি দেওয়া সুগন্ধিলতা আর পারুল ফুলে ঢাকা—জল শীতল ও সুবাসিত রাখার ব্যবস্থা। চারা আমগাছগুলির গায়ে জলের ছিটে দেওয়া হচ্ছে। পথিকেরা দলে দলে এসে কুয়োর জল পান করছে আর শীতল পরিবেশে দেহের তাপ দূর করছে।

বনে প্রবেশের মুখে পান্থ-পানশালা বুঝি গরমে ধুঁকছে। কোথাও কামাররা কামারশালার জন্য জ্বালানি সংগ্রহে ব্যস্ত; শক্ত কাঠ পুড়িয়ে কাঠ-কয়লা তৈরী হচ্ছে; কোথাও কাঠ কাটার নিদারুণ পরিশ্রমে কাজের মাঝেই গা ভেঙ্গে নিল মজুর। কাঠ-সংগ্রহে এগিয়ে চলেছে কাঠুরিয়া, তাদের কারো গলায় শুক্‌ন কালো বেতের তিনপাক বেড়ী, কাঁধে ধারাল কুঠার আর গলায় ঝোলানো খাবারের পুটলি। চোর-ডাকাতের ভয়েই পথিকদের পরণে ছিন্ন বস্ত্র। সম্মুখে দেখা যায় কোন চাষার গোয়ালে এক জোড়া হৃষ্টপুষ্ট বলদ। বনের গভীর গহনে কোথাও শ্বাপদ বধ করার জন্য ব্যাধের কুটপাশ পাতা; পাশাপাশি ঘুরছে শিকারীর দল—হাতে শক্ত জাল, হরিণের অন্ত্র থেকে তৈরী জালসেলাইয়ের দড়ি, কাঁধে পাখীধরার ফাঁদ, আঠা আর জন্তু-জানোয়ারের নাকের ফুটোতে বাঁধার জন্য শক্ত রশ্মি।

এগিয়ে যেতে যেতে হর্ষের চোখে পড়ল ছোট ছোট গ্রামগুলি—লোহার, ছুতোর, ব্যাধ, পাখমার এমনি কতো বিচিত্র বৃত্তির

গ্রামবাসী। পাখমারদের কাঁধে বাঁশের লাঠিতে ঝোলান খাঁচা, তার ভিতর হাজারো রকমের পাখী—বাজ (গ্রাহক), কয়ের (ক্রকর), তিতির (কপিঞ্জল), চাতক প্রভৃতি। ব্যাধ-গ্রামের ছেলেরা লুব্ধ হ'য়ে ঘুরছে এদিক-ওদিক—কোন্ সুযোগে ঘাসের ঝোপ থেকে বেরিয়ে পড়বে বধুলট্বা (চটক পাখী)। জোয়ান শিকারীদের ক্ষিপ্র কুকুরগুলো লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঘাসবনের তিতির পাখীর দিকে। বৃদ্ধ চক্রবাকের কণ্ঠবর্ণের মতো শীধু গাছের ছাই-রঙের বাকল ছাড়িয়ে ফেলে রেখেছে কারা; ধাইফুলের (ধাতকী) গাছগুলি রক্তবর্ণ ধাতুর মতো নবস্ফুটিত গৈরিক ফুলে রঙীন।

কোন গ্রামটি হয়ত জনপদের কাছাকাছি। সেখানে বনপথ দিয়ে চাষীরা ভারে ভারে বহে নিয়ে চলেছে বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভার—শিমূল তুলা, অতসী-পাটের গাঁট, গাছ-গাছড়ার শিকড়; আরো কত কি—ভাঁড়ে ভাঁড়ে মধু, ময়ূরপাখা, মোমের চাক, সুগন্ধি লামঞ্চক (বেণা) মূল, খদির গাছের ছাল-ছাড়ানো ছোট ছোট ডাল, সুরভি কুষ্ঠলতা, বৃদ্ধ সিংহের জটার মতো পিঙ্গল রঙের লোধ্র-বাকল। অন্য কোথাও গ্রাম্য মেয়েরা ফলের পেটী মাথায় নিয়ে দ্রুতপায়ে চলেছে; শহরে লেনদেন কেমন হবে, বিক্রী শেষে বাড়ী ফিরতে কতো সময় লাগবে—এমনি চিন্তায় তারা মশগুল। মেঠো রাস্তায় ছোট ছোট গরুর গাড়ী সারি দিয়ে জমির দিকে চলেছে; হৃষ্টপুষ্ট পোষমানা বলদ; গাড়ীতে পুরাণ গোবর আর পচা পাঁশের সার; গাড়োয়ানরা বলদ-গুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে; চাকার ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ উঠছে। ভারবাহী মহিষের গা পথের ধুলোয় রাঙা; তাদের উচ্চ কণ্ঠরব শুনে পথের ধারের ঝোপ থেকে চাকপাখীরা প্রাণভয়ে ছুটছে আর উচ্চকিত ডাক পাড়ছে।

হর্ষ আরও এগিয়ে যেতে যেতে দেখলেন—কোথাও রুক্ষ ডাঙা জমিতে চাষ হচ্ছে। কোন ক্ষেতে একপাল হরিণ নেমেছিল শস্যের লোভে; অমনি চাষী রদ্ থেকে ছুঁড়ে মেরেছে গাঁটওয়ালা বাঁশের

লাঠি, তৎক্ষণাৎ হাওয়ার বেগে এক লাফে বাঁশের বেড়া টপকে দৌড় দিল তারা। কোথাও চাষী তার জমির মাঝে খুঁটিতে মাথার খুলি বেঁধে নরকঙ্কাল তৈরী করেছে; খরগোসগুলো তাই দেখে ভয়ে ছোটা-ছুটি করতে গিয়ে ফসলের নবজাত অঙ্কুর মাড়িয়ে তছনছ ক'রে দিয়েছে ; ঘন সবুজ আখগাছে শ্যামায়মান প্রান্তর, শস্যের সমারোহে মাঠের রাস্তাগুলো প্রায় ঢাকা ; দু-একটি ছোটখাট পথ।

বনগ্রামের ঘরগুলি খাপছাড়া, একটি অন্যটি থেকে কিছু দূরে ; মাঝখানে মরকত মণির মতো স্নুহীগাছ, কাঁটাবাঁশের ঝাড় আর কণ্টকিত করঞ্জের বিস্তার। তাই চাষীদের গৃহবাটিকা ও গ্রামগুলি গাছ-গাছড়া তৃণলতাগুল্মে প্রায় দুষ্প্রবেশ্য ; উরুবক, বচ, হরিতকি, বহুমঞ্জরী, সূরণ (ওল) বংগক (বগুন) গাছ ; সুগন্ধি গ্রন্থিপর্ণ, শোভাঞ্জন, গর্মুতি লতা ও গবেধুকা ঘাস। কোন গৃহস্থের উঠানে শুক্ন ডালের মাচায় কাষ্ঠালুক লতার (লাউ গাছ) মোলায়েম ছায়া ; কোথাও বা গোলাকার কাপাস-কুঞ্জ, তার ভিতর খদির কাঠের শক্ত খুঁটিতে ছোট ছোট বাছুরগুলি বাঁধা ; দূর প্রান্তরের কোন কৃষকের ঘর থেকে মুরগীর ডাক ভেসে আসে। কোন গৃহস্থের আঙিনায় শুক্ন ডাল বেয়ে অঙ্গনা আর অগস্তি লতা উঠেছে ; সেই ডালে পাখীদের দানাপানির ব্যবস্থা আছে ; তলায় ছোট্ট চৌবাচ্চা ; বাড়ীর চালের উপর কাপাসের পাকা ফল ছড়িয়ে পড়েছে।

পায়েচলা রাস্তা থেকে কি অপূর্ব দেখা যায় এই সব বনগ্রামক ! কারো ঘরে বাঁশের বেড়া ; কোথাও বা কাশ, শর অথবা নলতৃণের ঘন আবরণ ; কোন বাড়ীর দাওয়ায় ভূতের উপদ্রব নিবারণে পলাশ ফুল আর গোরোচনার মণ্ডলীতে বল্বজ ঘাস দিয়ে অঙ্গার সাজান ; কোন চাষী শিমূল তুলোর পাকা ফল সংগ্রহ করেছে প্রচুর, কেউ উঠানে শালিধান, শালুক-বীজ, পদ্ম বীজ, বাঁশ-বীজ শুকোতো দিয়েছে ; কারো উঠানে ধানের গোলা ; ছাই-মেশানো কালো মাটিতে ঘরের মেঝে লেপে দেওয়া, সেখানে শোয়ার মাদুর পাতা। দূরের দিকে

চোখ মেলে দেখা যায়—ফলে পরিপূর্ণ পিয়াল (রাজাদন) ও ময়না (মদন) গাছ ; কোথাও তৈরী হচ্ছে মহুয়া (মধুকা) ফুলের মদ ; চাষীর ঘরে মাটীর হাঁড়িতে তোলা আছে বরবটী (রাজমাষা), শশা (এপুষ), কাকুড় (কর্কটিকা) কুমড়ো (কুষ্মাণ্ড) ও লাউয়ের (অলাবু) বীচি ; তাদের হাতে পোষ মানছে বন-বিড়াল, মালুধান, নকুল ও গন্ধমার্জারের শাবক ।

রাজতন্ত্র ও সমাজদর্পণ

রাজকুমার সর্বার্থসিদ্ধের বৈরাগ্য

[অশ্বঘোষ রচিত বুদ্ধচরিতের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গের সংক্ষেপ]

প্রাক্‌কথন: রামায়ণ মহাভারতের পরবর্তীকালে সংস্কৃতসাহিত্যে যে ধ্রুপদী পর্বের সূচনা সেই ক্রান্তিলগ্নের আদি কবি বৌদ্ধাচার্য অশ্বঘোষ। বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে তাঁর রচিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যায়; কিন্তু মূল রচনার বৃহদংশ আজও অনাবিষ্কৃত। 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরনন্দ' নামে দুই সংস্কৃত মহাকাব্য নিঃসন্দেহে অশ্বঘোষের রচনা। বুদ্ধচরিতে সর্বার্থসিদ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধের জন্ম থেকে নির্বাণপ্রাপ্তি পর্যন্ত কাহিনী বিবৃত। ঐতিহাসিক দৃষ্টি অপেক্ষা ধর্মীয় অনুরাগই এই রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধ-সম্পর্কে তাবৎকাল প্রচলিত কিংবদন্তী ও অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ ক'রে ধর্মনিষ্ঠ কবি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করেছেন:

উদয়াচলের তরুণ তপন, শুক্লপক্ষের চন্দ্রিমা ও বায়ুসমীরিত অগ্নির মতো কুমার সর্বার্থসিদ্ধ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে লাগলেন। আত্মীয়-বন্ধু ও প্রিয়জনদের কাছ থেকে মহামূল্য চন্দন, রত্নাবলী, সোনারূপার রথ ও হাতী-ঘোড়া আর নানান রকমের উপহার সামগ্রী আসতে থাকে। বিদ্যা-বুদ্ধি ও শাস্ত্রে কুমার অল্পকালের মধ্যেই প্রাজ্ঞতা লাভ করলেন এবং উপনয়ন সংস্কারের পর রাজোচিত শিক্ষা সমাপ্ত করলেন।

কিন্তু রাজপুত্র সর্বার্থসিদ্ধ রাজসুখে কেমন যেন উদাসীন। পুত্রের এই ভাবালুতা দেখে পিতা শুদ্ধোদন ঈষৎ চিন্তিত হলেন। মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তিনি সত্বর যশস্বিনী বিনীতা সুন্দরী কন্যা যশোধরার সঙ্গে কুমারের পরিণয় সম্পন্ন করলেন। ভোগ-ঐশ্বর্যে

নব দম্পতীর দিন যায়। তবুও রাজকুমার নিস্পৃহ বিমনা। তখন মহারাজ কুমারকে সংসারসুখে আসক্ত করার জন্য প্রাসাদের অভ্যন্তরেই সাধারণের অগোচর এক মনোরম বিলাসগৃহ নির্মাণ করলেন। অপ্সরাতুল্য সুন্দরী আর রত্নালংকারমণ্ডিত বিলাসিনীদের নৃত্যগীত ও আমোদ-আহ্লাদে প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠ ভরে উঠল। ললিতকলানিপুণ তরুণীরা হাব-ভাব-বিলাস-বিভ্রম-কটাক্ষে কুমারকে আনন্দে মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। মহারাজের তত্ত্বাবধানে বিলাসহর্মের অভ্যন্তরেই কুমার দিনরাত্রি অতিবাহিত করেন। কিন্তু শুদ্ধোদন সংযম, সদাচার ও ধর্মে নিষ্ঠা বজায় রাখলেন ; তাই পুত্রের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ বিধানের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

রমণীয় রাজোদ্যানে কুমার সর্বার্থসিদ্ধের বিহারযাত্রা স্থির হোল। মহারাজ শুদ্ধোদন মহা আড়ম্বরে পুত্রের বিলাসযাত্রার ব্যবস্থা করেছেন। রাজপথ সুশোভিত ; দুঃস্থ, বিকলাঙ্গ, জরাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। যথাসময়ে যুবরাজ প্রাসাদ থেকে অবতরণ ক'রে পিতার আশীর্বাদ নিয়ে সুবর্ণমণ্ডিত রথে এগিয়ে চললেন, সঙ্গে রয়েছেন শ্রেষ্ঠ সারথি ও বিনীত অনুচরগণ। পুষ্প-পতাকায় সজ্জিত বিচিত্র তোরণ ; রাজপুরুষদের মাঝে উপবিষ্ট কুমার যেন তারকাসমাকীর্ণ চন্দ্রমা। রাজপথে প্রতীক্ষ্যমাণ পুরবাসীরা অদম্য কৌতূহলে রাজপুত্রের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন ; নগরবাসীদের কেউ তাঁর বন্দনা করলেন, কেউ তাঁর গুণের প্রশংসায় মুখর হলেন, কেউ বা দীর্ঘায়ু কামনা করলেন ; আবার কিরাত, বামন ও কুব্জেরা রথধ্বজকে প্রণাম ক'রে অভিনন্দন জানাল। কুমার রাজমার্গে এসে গেছেন এই সংবাদ শুনে পুরনারীরা গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে গৃহপ্রাঙ্গণের উপরিতলে ছুটে এলেন, তাদের কটিবন্ধের কাঞ্চীধ্বনিতে ও চরণের নূপুরনিক্বণে গৃহপালিত বিহঙ্গেরা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। পীন পয়োধর ও গুরু উরুর ভারে ত্বরিতপদে মন্দগামিনী কোন বরাঙ্গনা কটিদেশের গোপন মেখলা

প্রদর্শনের লজ্জা ও ভয়ে হাত দিয়ে সেটি আবৃত করতে গিয়ে বেগ সংবরণ করল ; গবাক্ষপথে কুমারকে দর্শনরতা অবস্থায় একে অন্যকে আকর্ষণ করতে লাগল, তার ফলে কাণের মণিকুণ্ডলের দোলনে মুখশ্রী আরও রমণীয় হোল, তারা অশান্ত হ'য়ে উঠল ; সুন্দরীদের সুচারু মুখগুলি বাতায়নরন্ধ্রে অপূর্ব রমণীয়তা জাগাল, যেন পূজার মন্দিরে দেবার্চনার রক্তকমল। সবকিছু মিলে মনে হোল যেন আকাশযানে স্বর্গকন্যা অপ্সরাদের সমারোহ ! রাজকুমারকে দেখে তারা বলাবলি করল 'এমন পুরুষের ভার্যা যিনি, তিনি যথার্থই ধন্য'। মূর্তিমান কন্দর্পের মতো কুমারও সংসারে অনাসক্ত এই উদ্বেগে পৌরপতিরা তাকে সাদরে আপ্যায়িত করছেন। বিনীত, শুচি, ধীর ও শুদ্ধশীল নগরবাসীদের দেখে রাজকুমার ভাবলেন আজ বুঝি তার পুনর্জন্ম !

অন্যদিকে দেবগণ দেখলেন শুদ্ধোদনের রাজপুরী আজ স্বর্গপুরীর মতো আনন্দোচ্ছল। তখন পবিত্রমনা দেবতারা কুমারকে ধর্মপথে নিয়োগের জন্য রাজপথে এক জরাজীর্ণ পুরুষকে সৃষ্টি করলেন। হঠাৎ অনতিদূরে সমস্ত মানুষের মধ্যে অপরিচিত আকৃতির সেই বৃদ্ধকে অবাক হ'য়ে দেখতে দেখতে রাজকুমার সারথিকে রথ থামানোর আদেশ দিলেন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'সারথি, কে এই মানুষটী ? পলিত কেশ, বেত্রযষ্টিতে নির্ভর শিথিল চরণ, ভূমিতে নিবদ্ধ দৃষ্টি ! দেহের এমন পরিণতির কারণ কি ?' সারথি নিবেদন করলেন : 'কুমার ! এ মানুষটি জরায় আক্রান্ত। এই জরা রূপকে হরণ করে, বলকে বিনাশ করে, স্মৃতিকে ধ্বংস করে ; জরাই শোকের উৎপত্তিস্থান, অরতির নিদান।[১] এ লোকটিও শৈশবে স্তন্য পান করত, তারপর হামাগুড়ি দিতে শিখেছিল, ক্রমে সুন্দর যৌবন পেয়েছিল ; অবশেষে জরায় এই পরিণতি।'

চিন্তিতমনে কুমার এগিয়ে যেতে যেতে সারথিকে জিজ্ঞাসা

১। রূপস্য হন্ত্রী, ব্যসনং বলস্য, / শোকস্য যোনির্নিধনং রতীনাম্
নাশঃ স্মৃতীনাং, রিপুরিন্দ্রিয়াণাং / সৈষা জরা নাম যয়ৈষ ভগ্নঃ ॥

করলেন : 'আচ্ছা, এই জরাদোষ কি আমাকেও ভোগ করতে হবে ?' সারথি উত্তর দিল : 'আয়ুষ্মান ! কালের বশে নিঃসন্দেহে আপনারও এ পরিবর্তন ঘটবে। মানুষ জরাকে দুঃখদায়িনী জেনেও জীবনকে ভোগ করতে চায়।' তার কথায় উদ্‌বিগ্ন কুমার সারথিকে আদেশ দিলেন : 'সূত ! সত্বর রথ ফেরাও। জরার চিন্তায় আমার মন আকুল ; এ উদ্যানবিহারে শান্তি কোথায় ?' সারথি রথ ফিরিয়ে আনল। কুমারের মনে সুখ নেই ; জনকোলাহল-মুখর প্রাসাদ তাঁর কাছে শূন্য মনে হোল। 'জরা ! জরা !'—এই চিন্তা তাঁকে বিব্রত ক'রে তুলল। তবু পিতার আদেশে আবার উদ্যান ভ্রমণে যেতে হোল। দ্বিতীয় দিনে দেবতারা আবার এক রোগগ্রস্ত বিকলাঙ্গ পুরুষকে সৃষ্টি করলেন। সিদ্ধার্থের জিজ্ঞাসায় সারথি বলল : 'রাজপুত্র রোগ জীবদেহের সাধারণ দোষ ; রোগে আক্রান্ত হয়েও মানুষ সংসারের সুখ ভোগ করতে চায়'। চঞ্চল জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদের মতো সিদ্ধার্থের হৃদয় কেঁপে উঠল। তিনি বিষণ্ণচিত্তে সেদিনও প্রমোদকানন থেকে ফিরে এলেন। এইভাবে বারবার পুত্রের প্রত্যা-বর্তনের সংবাদ শুনে শুদ্ধোদন রাজপুরুষদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হলেন ; কিন্তু স্বভাবগুণে উগ্র দণ্ডের শাস্তি থেকে সকলকে নিষ্কৃতি দিলেন।

পুনরায় প্রমোদবিহারের ব্যবস্থা হোল। এবার নূতন রথ, নূতন সারথি, রাজপথেরও নূতন শোভা। রথারূঢ় কুমার দেবতাদের মায়ায় এবার দেখলেন চারজন পুরুষ একটি দেহ বহন ক'রে নিয়ে চলেছে। যুবরাজ সর্বার্থসিদ্ধ সারথিকে আবার প্রশ্ন করলেন : 'আচ্ছা, এই মানুষটিকে এভাবে বহন ক'রে নিয়ে চলেছে কেন ?' সারথি বলল : 'যুবরাজ, এই লোকটি প্রিয়জনের দ্বারা সযত্নে লালিত-পালিত হয়েছিল ; আজ সে মৃত, চিরকালের মতো সুপ্ত। এর ইন্দ্রিয় বিকল, বোধ লুপ্ত, প্রাণ নিশ্চল। তাই সবাই একে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু সমস্ত জীবেরই তো এই পরিণতি ; এর জন্য দুঃখের কি আছে !'

তিনি আদেশ দিলেনঃ 'রথ ফেরাও। মৃত্যু অবধারিত জেনেও সচেতন মানুষ কেমন ক'রে ভোগে প্রমত্ত হ'য়ে থাকবে?' কিন্তু এবার সারথি কুমারের আদেশে রথ ফেরাল না; সেখান থেকে মনোরম পদ্মখণ্ড বনে উপস্থিত হোল; পদ্মসরোবর ও লতাকুঞ্জে শোভিত সুরম্য উপবন।

চঞ্চললোচনা সুন্দরী বারাঙ্গনারা কুমার সর্বার্থসিদ্ধকে অভ্যর্থনা ক'রে প্রমোদকাননের অভ্যন্তরে নিয়ে চলল। কামনায় বিবশ বারবনিতারা গৌতমকে ঘিরে রইল আর স্থির কৌতূহলী চোখ দিয়ে তাকে যেন পান করতে লাগল। তাদের মধ্যে রাজকুমার যেন মূর্তিমান কামদেব; সুধাবিতরণকারী চন্দ্রের মতো ধীর সৌম্য তার মূর্তি। কুমারকে বশীকরণের ছলে তারা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করতে করতে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল, কেউ বা বিজৃম্ভণ করল। কিন্তু কেউ তার মনের নাগাল পেল না; কুমারের গাম্ভীর্য দেখে তারা মৌন হ'য়ে গেল; মুখের হাসিও বুঝি মিলিয়ে গেল। রাজপুত্রের এমন উদাসীনতায় সবাই নিরুৎসাহ।

যুবরাজ গৌতমের সঙ্গে এসেছেন পুরোহিতপুত্র তরুণ উদায়ী। বারাঙ্গনাদের নিরুৎসাহ দেখে উদায়ী ভর্ৎসনা ক'রে বললেনঃ 'তোমরা সবাই কামকলায় পণ্ডিত আর পুরুষের মনোহরণে নিপুণ; রূপ-গুণ-চাতুর্যে নগরনটীদের প্রধানা, ধনপতি কুবেরের বিলাসভূমির যোগ্যা। বীতরাগ মুনি ও অপ্সরাবিহারী দেবতারাও তোমাদের লীলাবিলাসে ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে আত্মসমর্পণ করেন; এমন কি তোমাদের হাবভাব দেখে রমণীরাও মুগ্ধ হয়। কুমার সর্বার্থসিদ্ধকে মোহিত করতে হ'লে নববধূর মতো লজ্জা অথবা গোপবধূর মতো সমাজভয় ত্যাগ করতে হবে। পুরুষবশীকরণে তোমাদের এত প্রসিদ্ধি, আর আজ কুমারকে মুগ্ধ করার এই কি প্রচেষ্টা? তোমাদের উদ্যম কিন্তু আমায় খুশী করতে পারে নি। যদি বল সিদ্ধার্থ বীর, মহাসত্ত্ব, তাহলে বলি শোন—সুন্দরী নারীর ছলাকলায় মুগ্ধ হয় না এমন পুরুষ

কেই বা আছে! জানো তো—দীর্ঘতপা মুনি গৌতম নীচকুলোদ্ভবা এক রমণীর রূপে মজেছিলেন; মহর্ষি ব্যাস কাশীসুন্দরী নামে পণ্যাঙ্গনার চরণাঘাতে কৃতার্থ হয়েছিলেন; গান্ধার গৌতম অপ্সরা জঙ্ঘার চাতুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন; দেবকন্যা ঘৃতাচী হরণ করেছিলেন তেজস্বী বিশ্বামিত্রকে; দশরথতনয়া শান্তা নারী সম্পর্কে অপণ্ডিত মুনিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গের মনে অদম্য কৌতূহল জাগিয়ে তাকে বশীভূত করেছিলেন; অথচ তোমরা মহারাজ শুদ্ধোদনের তরুণ সুদর্শন পুত্রের মনোরঞ্জন ক'রে ভোগে আসক্ত করতে নিষ্ফল হ'লে? কুমার সর্বার্থ-সিদ্ধ শাক্যরাজার বংশশ্রী; সুতরাং তোমরা বিস্রব্ধচিত্তে এমন আচরণ করবে, যার ফলে বিষয়-পরাঙ্মুখ কুমার সংসারসুখে মগ্ন হন।'

উদায়ীর নম্র ভর্ৎসনায় রাজগণিকারা ক্ষুব্ধ হলেও কপট হাসি হেসে পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে ইঙ্গিতে রাজাজ্ঞা পালনের অভিপ্রায় নিবেদন করল। কামনার মদে আর সুরার আমোদে তাদের লজ্জাভয় অপগত হোল। হাস্য লাস্য-কটাক্ষে ভীতিবিহ্বলতা ছেড়ে কুমারকে আকর্ষণ করার ছলে তারা যেন একে অন্যকে উত্তেজিত করতে লাগল। তারপর মদাকুলা কোন কামিনী সুঠাম পীনদ্ধ পয়োধর দিয়ে স্পর্শ করল কুমারকে; ছল ক'রে স্খলিতা কোন বিলাসিনী ললিত-কোমল বাহুলতা দিয়ে আলিঙ্গন করল তাকে; কোন যুবতী আসবগন্ধী তাম্রাধর তার কর্ণমূলে স্থাপন ক'রে বলল: 'ওগো যুবরাজ, আমার মুখে শুনুন এক গোপন কথা।' কামবিহ্বলা কতিপয় তরুণী বসন-সংযমের চাতুরীতে দেখাতে লাগল কটির কাঞ্চীবন্ধন, সূক্ষ্ম বসনে আবৃত অনুপম শ্রোণী আর সুবর্ণ-কলশের তুল্য পীন পয়োধর। সুচারুজঘনা কোন কামিনী কর্ণকুহরে মৃদুস্বরে গুঞ্জন করল: 'এবার তবে সাঙ্গ হোক শেষ মিলন।' কোন যৌবনবতী উপহাস ক'রে বলল: 'কুমার, আপনি বঞ্চিত হলেন।' পীনস্তনী কোন তরুণী উচ্চ হাসিতে তাকে সচকিত ক'রে বলল: 'এবার আমায় চরিতার্থ করুন।' যুবরাজকে গমনোদ্যত দেখে কেউ তাকে

ফুলেব মালায় বাঁধল, কেউ বা মধুর বাক্যে তিরস্কার ক'রে উঠল ; চূতমঞ্জরী হাতে কোন চতুরা প্রণয়াকুল ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করল : 'কুমার, এ মঞ্জরী কার?' পুরুষের গতি অনুকরণ ক'রে কোন বিলাসিনী বলল : 'রাজপুত্র! আপনি যে নারীর কাছেও হার মানছেন! এবার আমাদের পরাজিত করুন।' নীলোৎপল আঘ্রাণ করতে করতে কোন চপলা মৃদুকণ্ঠে জানাল : 'নাথ, সুগন্ধি আম্র-মঞ্জরীর দিকে একবার তাকান।' এমনি ক'রে বিলাসিনী রাজ-গণিকাদের মুখে কথার ফোয়ারা ছুটতে লাগল : 'ওগো প্রিয়! কামনার আগুন ঐ অশোককে অনুগ্রহ করুন; দেখুন চূতলতিকা আজ কেমন আলিঙ্গন করেছে প্রিয় তিলক তরুকে[১]; অশোক আমাদের রক্তাভ করশোভাকেও হার মানিয়েছে। কুমার, নারীর মাহাত্ম্য দেখুন,—চক্রবাক চক্রবাকীর পশ্চাতে চলেছে! বসন্তে প্রকৃতির এ উন্মাদনা কি বিহঙ্গকুলের অন্তরেই আনন্দের শিহরণ জাগাবে? পণ্ডিতমানী চিন্তাশীলের চিত্তে তাব আবেদন কি ব্যর্থ হবে?'

পণ্যাঙ্গনাদের অতুলনীয় কামকেলিকৌতুকেও ধীর-প্রশান্ত কুমারের মুখে সুখের হাসি ফুটল না। আজ তার অন্তর উদ্বিগ্ন, কারণ মানুষের মৃত্যু অবধারিত এই চিন্তা তাকে নিরন্তর আকুল ক'রে তুলেছে। সর্বার্থসিদ্ধ মনে মনে ভাবতে লাগলেন : এরা কি জানে না যে নারীর যৌবন কতো চপল! একদিন জরা এসে এই রূপ আব

১। ললিতং গীতমন্বর্থং কাচিৎ সাভিনয়ং জগৌ।
স্বয়ং তু সূচয়ন্তীব বঞ্চিতোঽসীতি বীক্ষিতৈঃ ॥
বল্গুপীনস্তনী কাচিদ্ বাতাঘূর্ণিতকুন্তলা।
উচ্চৈরবজ্ঞহাসৈনং সমাপ্নোতু ভবানিতি ॥
অশোকে ক্ষিপতাং দৃষ্টিঃ কামিশোকবিবর্ধনে।
রুবন্তি ভ্রমরা যত্র দহ্যমানা ইবাগ্নিনা ॥
চূতযষ্ট্যা সমাশ্লিষ্টো দৃশ্যতাং তিলকদ্রুমঃ।
শুক্লবাসা ইব পতিঃ স্ত্রিয়া পীতাঙ্গরাগয়া ॥

যৌবনকে বিনাশ করবে। এরা নিশ্চয় জানে না যে মৃত্যু সব কিছু হরণ করবে, তাই নির্ভয় হ'য়ে ক্রীড়া-কৌতুকে মগ্ন হ'য়ে আছে। জরা-ব্যাধি-মৃত্যুকে জেনেও সচেতন কোন্ মানুষ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে কিংবা সুখের স্বপ্ন দেখতে পারে[১] ?'

যুবরাজ সর্বার্থসিদ্ধকে এমন মৌন-গম্ভীর দেখে নীতিশাস্ত্রে নিপুণ উদায়ী বললেন : 'কুমার, তোমার উপযুক্ত ও প্রিয় বন্ধু ব'লেই মহারাজ আমায় এখানে পাঠিয়েছেন। হিতকর বিষয়ে প্রবৃত্ত করা আর অহিতকর বিষয় থেকে নিবৃত্ত করাই বন্ধুর কর্তব্য। সুন্দরী নারীর প্রতি তোমার মতো তরুণ ও সুদর্শন যুবকের যোগ্য নয় এ ব্যবহার। নারীর হৃদয়কে বন্ধন করে নম্রতা আর আনুগত্য ; মানই তাদের সম্পদ্ ; কপট প্রীতিও রমণীকে প্রীত করে—তাই হৃদয় পরাঙ্মুখ হলেও তরুণীদের চিত্ত বিনোদন কর। দাক্ষিণ্যই নারীর মনঃপীড়ার ঔষধ ; দাক্ষিণ্য না পেলে তাদের রূপ কুসুমহীন কাননের মতো[২]। তুমি সানন্দ চিত্তে এই পণ্যাঙ্গনাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর, এমন দুর্লভ ভোগসুখ অবজ্ঞা কোরো না। কাম তো জীবনের বন্ধন নয়, মুক্তি। তাই গুরুপত্নী অহল্যার প্রণয়ে আসক্ত হয়েছিলেন দেব পুরন্দর ; চন্দ্রের ভার্যা রোহিণীর প্রেমে মুগ্ধ অগস্ত্যমুনি তারই মতো

১। কিং ন্বিমা নাবগচ্ছন্তি চপলং যৌবনং স্ত্রিয়ঃ।
যতো রূপেণ সম্পন্নং জরেদং নাশয়িষ্যতি ॥
জরাং ব্যাধিং চ মৃত্যুং চ কোহি জানন্ সচেতনঃ।
স্বস্থস্তিষ্ঠেন্নিষীদেদ্বা স্বপ্যাদ্বা কিং পুনর্হসেৎ ?

২। অনৃতেনাপি নারীণাং যুক্তং সমনুবর্তনম্।
তদ্‌ব্রীড়া পরিহারার্থমাত্মরত্যর্থমেব চ ॥
সন্নতিশ্চানুবৃত্তিশ্চ স্ত্রীণাং হৃদয়বন্ধনম্।
স্নেহস্য হি গুণা যোনির্মানকামাশ্চ যোষিতঃ ॥
দাক্ষিণ্যমৌষধং স্ত্রীণাং দাক্ষিণ্যং ভুষণং পরম্।
দাক্ষিণ্যরহিতং রূপং নিষ্পুষ্পমিব কাননম্ ॥

সুন্দরী লোপামুদ্রাকে পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন ; তপোনিষ্ঠ বৃহস্পতি সহোদর উতথ্যের তরুণী ভার্যা মমতার রূপলাবণ্যে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে তার গর্ভে এক পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। ধর্মনিষ্ঠদের প্রধান বৃহস্পতি ছিলেন চন্দ্রের আচার্য, দেব চন্দ্রমা কামনায় বিবশ হ'য়ে আচার্য-পত্নীকে প্রেমনিবেদনে চরিতার্থ ক'রে পুত্র বুধের জন্ম দিয়েছিলেন ; সংসারবিরাগী মুনি পরাশর যমুনাতীরে উচ্ছলযৌবনা মৎসকন্যা কালীকে দেখে আত্মসংবরণে অসমর্থ হ'য়ে নদীতীরেই তার সঙ্গে সহবাস করেন। ঋষি বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর রতিরভসে চরিতার্থ হয়েছিলেন।...তোমার রূপ-গুণ-যৌবন আছে, আবার রাজশক্তিও আছে ; সমস্ত জগৎই ভোগে আসক্ত, অথচ তুমি একা উদাসীন!'

উদায়ীর কথা শুনে সর্বার্থসিদ্ধ মেঘগম্ভীরকণ্ঠে যুক্তিনিষ্ঠ ভাষায় প্রত্যুত্তর দিলেন: 'তুমি বন্ধু, তাই তোমার এ অনুরোধ যুক্তিহীন ব'লে দাবি করি না ; কিন্তু যে বিষয়ে আমার দোষ দিচ্ছ, তার উত্তরে বলি—আমি জানি বিশ্বসংসার কামের দ্বারা বশীভূত, সুতরাং কামকে তুচ্ছ ব'লে উপহাস করি না। কিন্তু সবই অনিত্য, তাই আমার মন হয়েছে নিরাসক্ত। যদি জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর চিন্তা না থাকত, তবে আমিও বিষয়ভোগে অনুরক্ত হোতাম। নারীর রূপলাবণ্য যদি চিরস্থায়ী হোত, তাহলে প্রাজ্ঞ মানুষ হয়ত তাতে মগ্ন থাকত। একদিন জরা এসে এই মনোহারিণী রূপ হরণ করবে ; তখন মোহের অনুরাগ কেটে যাবে, আর এমন পরম প্রিয় বস্তুর উপরও আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। মৃত্যু আছে, জরা আছে, ব্যাধি আছে,—তবু মানুষ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে ভোগে লিপ্ত হ'লে পশুপক্ষীর সঙ্গে তার ভেদ কোথায়? কামের বশেই মহাত্মারা ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন, সেই তো তাদের পতনের কারণ ; যাদের আত্মসংযম নেই, তারা কি মহাত্মা! তাছাড়া শোন, দাক্ষিণ্যের জন্য ছলনার আশ্রয় করতে আমি জানি না। যে আনুগত্যের মধ্যে সরলতা নেই, অন্তরের স্পর্শ নেই—তেমন অনুরাগে ধিক্। সংসারী মানুষ যদি এমনি ক'রে কপটতার

আশ্রয়ে কৃত্রিম সম্পর্ক গড়ে তোলে, তবে পুরুষ ও নারী প্রত্যেকে প্রত্যেককে ছলনা করবে। যারা মিথ্যা ছলনাকে সত্যি ভেবে বিশ্বাস করে এবং ভোগসুখের নেশায় অনুরক্ত জনের দোষ দেখতে পায় না—সেই সব সরলবিশ্বাসীদের বঞ্চনা করলে পাপ হয়। আমি জরা-মরণ-ব্যাধির চিন্তায় আকুল, সুতরাং অনুচিত কামসুখে উৎসাহ জোগানো তোমার উচিত নয়। আমি ধৈর্য্যহারা অশান্ত, দৃশ্যমান জগৎ আমার অন্তরকে যেন দগ্ধ করছে।'···

এই ব'লে কুমার সর্বার্থসিদ্ধ ভোগের সমস্ত উপকরণ অবহেলায় পরিত্যাগ করলেন। এদিকে সূর্য অস্তাচলে আরোহণ করেছে। মাল্যপ্রসাধনমণ্ডিতা বারবিলাসিনীরা যুবরাজের অদ্ভুত ঔদাসীন্য দেখে হতাশায় নগরে ফিরে এল। সমস্ত সংবাদ শুনে উৎকণ্ঠিত মহারাজ শুদ্ধোদন বাণবিদ্ধ মহাগজের মতো বিনিদ্র রজনী যাপন করতে লাগলেন।

রাজকুমার চন্দ্রাপীড়ের প্রতি শুকনাসের উপদেশ

[বাণভট্টের কাদম্বরী]

মহারাজ তারাপীড় পুত্র চন্দ্রাপীড়কে উপযুক্ত আচার্যের হাতে অর্পণ ক'রে ক্ষত্রিয়োচিত সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী ক'রে তুলেছেন। তারপর যখন কুমারের যৌবরাজ্যে অভিষেকের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ, তখন কুলগুরু শুকনাস এসেছেন তাকে আশীর্বাদ জানাতে। রাজপুত্রের মহৎ গুণাবলীর সম্যক্ পরিচয় জেনেও শুকনাস তাকে শোনালেন রাজনীতির সার উপদেশ ঃ

'তাত চন্দ্রাপীড়! তুমি সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম আর ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতব্য সবই জান ; তাই তোমাকে উপদেশ দেওয়ার মতো হয়তো কিছুই নেই! তবু বলি—যৌবনের মোহ-অন্ধকার অতি গহন ; যেমন সূর্য-রশ্মি, রত্নালোক বা প্রদীপশিখা কেউই ঘন তমিস্রা বিদূরিত করতে পারে না—এও তেমনি। ঐশ্বর্যের অহংকার অতীব দারুণ, পূর্ণ

বয়সকালেও তার উপশম হয় না। শুধু জ্ঞানাঞ্জনের শলাকাস্পর্শেই ভোগের মোহকালিমা ঘুচে যায় না।···ধনসম্পদের অভিমান যেন প্রবল জ্বরের দাহ—শীতল উপচারেও তার নিবৃত্তি হয় না; বিষয়-ভোগের বাসনা বড়ই বিষম—যেন বিষের তেজ; রাজ্যসুখের সন্নিপাতনিদ্রা এমনই ভয়ঙ্কর যে, নিশার অবসানেও জাগরণ হয় না। সর্বনাশের এত সব কারণ বর্তমান, তাই আমি তোমায় সবিস্তারে বলতে উৎসুক হয়েছি।

শিশুকাল থেকে অগাধ ঐশ্বর্যের মধ্যে লালনপালন, নবীন যৌবন, অনুপম রূপ, আর অমানুষিক দেহবল—এ-সবই অনর্থের মূল। এদের এক একটিই সমস্ত অবিনয়ের কারণ; যেখানে সবগুলির সমাহার, সেখানে কি না ঘটে[১]! শাস্ত্রবিদ্যার নির্মল জলে বুদ্ধি পরিষ্কৃত হলেও, যৌবনের প্রারম্ভে বিবেক স্বভাবতই কলুষিত হয়। তারুণ্যের দৃষ্টি স্বচ্ছ হলেও রমণীয় অনুরাগের আবেশে তা রক্তিম হ'য়ে ওঠে। ঘূর্ণি ঝড় যেমন শুক্‌নো পাতার দলকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বহুদূরে নিয়ে যায়, তেমনি যৌবনে রজোগুণের আবেশে স্বভাব মানুষকে নাচিয়ে বেড়ায়। বন্য হরিণীর মতো ইন্দ্রিয়গুলি ভোগসুখরূপ মৃগতৃষ্ণিকার আকর্ষণে আরও দুরন্ত হ'য়ে ওঠে। কষায় রস আস্বাদনের পর জলপান করলে যেমন বেশ মধুর লাগে, তেমনি নবীন যৌবনে কাম-ক্রোধ প্রভৃতির তাড়নায় কষায়িত চিত্তে ইন্দ্রিয় সেবা বড়ই মধুর মনে হয়! ভোগবিলাসে অতিরিক্ত আসক্তি দিগ্‌-ভ্রান্ত পথিকের মতো অতি সহজেই মানুষকে কুপথে পরিচালিত করে। তোমার মতো মানুষকেই উপদেশ দিয়ে লাভ; স্বচ্ছ স্ফটিকে চাঁদের আলো যেমন—তেমনি নির্মল হৃদয়ে উপদেশের গুণ প্রকাশ পায়।···সদ্‌গুরুর উপদেশ প্রদোষচন্দ্রের ন্যায় মন থেকে অজ্ঞান-

১। গর্ভেশ্বরত্বম্, অভিনবযৌবনত্বম্, অপ্রতিমরূপত্বম্, অমানুষশক্তিত্বং চেতি মহতী ইয়ং খলু অনর্থপরম্পরা। সর্বাবিনয়ানাম্ ঐকৈকমপি আয়তনম্, কিমুত সমবায়ঃ।

অন্ধকার নাশ করে, আর সব মালিন্য ধুয়ে অন্তরকে নির্মল করে। তোমার চিত্ত এখনও ভোগের আস্বাদে লিপ্ত হয় নি, তাই উপদেশের পক্ষে এই হোল উপযুক্ত সময়।···শিক্ষা-দীক্ষা, সদ্‌বংশ কোন কিছুই দুষ্টকে বিনীত করতে পারে না। ভেবে দেখ—চন্দনতরুর আগুনও মানুষকে পোড়ায়, সমুদ্রের বাড়বানল জলের মধ্যেও প্রচণ্ড হয়। গুরুর বাক্য অবগাহন স্নানের মতো সব মালিন্য দূর করে—বিশেষতঃ রাজাদের কাছে। কারণ তাদের উপদেশদাতা অতি দুর্লভ, সকলেই সভয়ে রাজার আদেশ প্রতিশব্দের ন্যায় পালন করে।···রাজলক্ষ্মী অলীক অভিমানের বশে নরপতিকে উন্মাদ করে, ঐশ্বর্য-বিষের বিকার তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

বৎস চন্দ্রাপীড়, তুমি কল্যাণের অধিকারী, তাই প্রথমেই তাকিয়ে দেখ ঐশ্বর্যলক্ষ্মীর আচরণ কেমন।·· কমলকাননে ভ্রমরীর মতো চঞ্চলা লক্ষ্মী বহুজনের সঙ্গে সহবাস করে, তাই সারা দেহে তাদের বিনোদ চিহ্ন। তার স্বভাবে ফুটে উঠেছে—ক্ষীরোদসাগরের পারিজাত কুসুমের রক্তিমা, চন্দ্রকলার বক্রতা, উচ্চৈঃশ্রবার চঞ্চলতা, কালকূটের মোহনশক্তি, মদিরার মত্ততা, কৌস্তুভ-মণির উগ্রতা! জগতে এই লক্ষ্মীর মতো নীচ আর কিছু নেই ; মানুষ একে সহজে লাভ করেও বহু দুঃখে রক্ষা করে।···ঐশ্বর্যলক্ষ্মী প্রণয়বন্ধন মানে না, অভিজন মানে না, রূপের বিচার করে না, বংশমর্যাদা গ্রাহ্য করে না, চরিত্র বিচার করে না, পাণ্ডিত্যকে স্বীকার করে না, শাস্ত্রজ্ঞানে কান দেয় না, ধর্মের অনুরোধ রাখে না, ত্যাগকে আদর করে না, বিশেষজ্ঞতার বিচার করে না, লোকাচার পালন করে না, সত্যকে স্বীকার করে না, শাস্ত্রবিধির মূল্য দেয় না[১]।

১। ন পরিচয়ং রক্ষতি, ন অভিজনম্ ঈক্ষতে, ন রূপমালোকয়তে, ন কুলক্রমম্ অনুবর্ততে, ন শীলং পশ্যতি, ন বৈদগ্ধ্যং গণয়তি, ন শ্রুতমাকর্ণয়তি, ন ধর্মম্ অনুরুধ্যতে, ন ত্যাগম্ আদ্রিয়তে, ন বিশেষজ্ঞতাং বিচারয়তি, নাচারং পালয়তি, ন সত্যমনুবুধ্যতে, ন লক্ষণং প্রমাণীকরোতি ॥

গন্ধর্বনগরীর রূপরেখার মতো সর্বসম্পদের অধিকারিণী লক্ষ্মী চোখের সামনে অন্তর্হিতা হয়,…লতার ন্যায় কালে কালে আশ্রয় থেকে আশ্রয়ান্তরে যায়,…সূর্যের মতো বিবিধ সঞ্চারিণী, পাতালগুহার মতো অন্ধকারময়ী, বিদ্যুতের মতো ক্ষণপ্রভা। স্বল্পসত্ত্বকে সে উন্মত্ত করে, সরস্বতীর অনুগৃহীত ব্যক্তিকে কখনো আলিঙ্গন করে না, গুণবানকে অপবিত্রের ন্যায় স্পর্শ করে না, উদারচেতাকে অমঙ্গলের মতো মান্য করে না, সজ্জনকে কুলক্ষণের মতো পরিত্যাগ করে, অভিজাতকে সর্পের মতো লঙ্ঘন করে, বীরকে কণ্টকের মতো পরিহার করে; দানশীল ব্যক্তিকে দুঃস্বপ্নের মতো স্মরণ করে না, বিনয়ীকে পাপীর মতো কাছে আসতে দেয় না, মনস্বীকে উন্মত্তের মতো উপহাস করে।

ধনের অহংকার একদিকে মানুষের মনে উষ্ণতা জন্মায়, অন্যদিকে সদসদ্‌বিবেচনাশূন্য ক'রে শীতলতা এনে দেয়; অবস্থার উন্নতি ঘটায়, অথচ মনের অবনতি আনে,—দেহের বল বৃদ্ধি করে, কিন্তু মনকে লঘু করে; লক্ষ্মী উত্তম পুরুষে আসক্তা হয়েও নীচ ব্যক্তির প্রিয়া; এই চপলা যেখানে যেখানে আবির্ভূতা হয়, সেখানে সেখানে দীপশিখার কজ্জলের মতো পাপকর্ম প্রকাশ পায়।

রাজলক্ষ্মী হোল ভোগতৃষ্ণারূপ বিষবল্লরীর সংবর্দ্ধন-বারি; ইন্দ্রিয় মৃগদের ব্যাধ-গীতি; সচ্চরিত্র-চিত্রের আবরণ-ধূম; মোহ নিদ্রার বিভ্রম-শয্যা; অভিমান পিশাচীর নিবাস-বলভি; জ্ঞান-চক্ষুর তিমির-অন্ধকার; অবিনয়ের সম্মুখপতাকা; বিষয়-মধুর পানশালা; অহংকার-নাটকের সংগীতশালা; দোষ-ভুজঙ্গের নিবাসভূমি; সদ্‌ব্যবহার বিতাড়নের বেত্রযষ্টি; গুণ-কলহংসের অকাল-বর্ষা; কাপট্য-নাটকের প্রস্তাবনা; কাম-করীর কদলীবৃক্ষ; সাধুতার বধ্যভূমি; ধর্ম-চন্দ্রের রাহু-জিহ্বা।

দুরাচারিণী লক্ষ্মীর এমনই স্বভাব! ভাগ্যবলে কোন নরপতি তাকে লাভ করলেও প্রতারিত হন। অভিষেকের সময় মঙ্গলকলশের জল

তরুণ নৃপতিদের হৃদয় থেকে যেন দাক্ষিণ্যগুণকে দূর ক'রে দেয়; মস্তকের উষ্ণীষবন্ধন বয়সের চিন্তাকে ভুলিয়ে দেয়; চামরবায়ুর আরাম সততাকে অপহরণ করে।...তরুণ নৃপতি কামবাণে মর্মাহত হ'য়ে মুখে নানান ভাবভঙ্গী করেন, যেন ধন-বহ্নির দাহে বিব্রত। যেমন পঙ্গুরা অন্যের সাহায্যে বিচরণ করেন, তেমনি নৃপতিগণও অধর্মের পাপে কর্তব্যপথে চলার শক্তি হারিয়ে অন্যায়-মার্গে গমন করেন। মুমূর্ষুদের মতো রাজারা পরিচতদের চিনতে ভুল করেন।...চক্ষুপ্রদাহের ফলে মানুষ যেমন তেজস্কর পদার্থের দিকে লক্ষ্য দিতে পারে না, তেমনি নৃপতিরা তেজস্বীকে সহ্য করতে পারেন না।...ধনলালসার বিষ-বেগে বিভ্রান্ত হ'য়ে তারা সমস্ত বস্তুকেই স্বর্ণময় দেখেন, ..গণিকা-গৃহ যেমন কামুকদের আশ্রয়স্থল, নৃপতির গৃহও তখন নীচাশ্রয়ে পরিণত হয়।

ধূর্ত চাটুকরেরা রাজাদের এমনই বোঝান যে তাদের পক্ষে দ্যূত-ক্রীড়া হোল বিনোদ, পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি হোল বৈদগ্ধ্য, মৃগয়া ব্যায়াম, সুরাপান বিলাসিতা মাত্র, অনবধানতাই বীরত্ব, ধর্মপত্নীকে ত্যাগ অনাসক্তি, গুরুর উপদেশ না শোনা স্বনির্ভরতা,...নৃত্য-গীত-গণিকাসক্তি হোল শিল্পকলা, গুরুতর অপরাধের প্রতি উদাসীন হওয়া মহানুভবতা, অপবাধ সহ্য করাই ক্ষমাগুণ, স্বেচ্ছাচারিতাই প্রভুত্ব, স্তুতিপাঠকের স্তাবকতাই যশ, চাপল্য হোল উৎসাহ, সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির অভাবই অপক্ষপাত—এমনিভাবে প্রতারণা-কুশল স্তাবকেরা রাজার দোষগুলিকে গুণ ব'লে বুঝিয়ে দেয়। একদিকে তারা মনে মনে লোকনায়ককে উপহাস করে, অন্যদিকে প্রকাশ্যে দেবযোগ্য তোষা-মোদবাক্যে প্রীত করে। ধনগর্বিত নৃপতিরা তাদের স্তুতিবাদে বিচার-বুদ্ধি প্রায় হারিয়ে ফেলেন এবং অলীক অভিমানের বশে নিজেদের দেবতারূপে ভাবতে থাকেন,...আর তাঁদের মনে হয় প্রজাদের কাছে নিজেদের দর্শনদানই অনুগ্রহ, দৃষ্টিপাতই উপকার, সম্ভাষণই অনুগ্রহ, আজ্ঞাই বরপ্রদান, স্পর্শই পাবক। তখন সব কিছুতেই অবজ্ঞা

জাগে ; তাই, 'অনর্থক বুদ্ধির বোঝা বহে পেল না এরা বিষয়সুখের আস্বাদ'— এই ভেবে পণ্ডিতদের উপহাস করেন ; বিচক্ষণ জ্ঞান-বৃদ্ধদের উপদেশকে জরা-বৈক্লব্যের প্রলাপ ব'লে তাচ্ছিল্য করেন ; দক্ষ সচিবদের পরামর্শ গ্রহণ করলে স্বকীয় বিচার বুদ্ধির প্রতি অবমাননা করা হয়—এই ভেবে তাদের সদুপদেশেও দোষ আবিষ্কার করেন। যে ব্যক্তি দিবারাত্র জোড়হাতে দেবতার মতো তাঁর স্তুতিপাঠ ও গুণ-কীর্তন করে, মহারাজ তাকেই পাশে রাখেন, তার সাথে আলাপ করেন, তারই উন্নতি করেন, তাকেই দান করেন, তার কথাই শোনেন তাকেই সমাদর করেন এবং একমাত্র তাকেই বিশ্বাস করেন[১]।

···তাই, হে কুমার, একদিকে অতি কুটিল, ক্লেশকর কর্তব্যবহুল ভয়ানক রাজতন্ত্র, অন্যদিকে বিবেকবিহ্বলকারী নবযৌবন ; তুমি সেইভাবে কাজ করবে, যাতে লোকেরা উপহাস না করে, সাধুরা নিন্দা না করে, গুরুজনেরা ধিক্‌কার না দেয় এবং সুধীরা দুঃখপ্রকাশ না করে।

গণিকাশিক্ষা ঃ কিশোরী বারবনিতার প্রতি গণিকামাতার উপদেশ

[দশকুমারচরিত, দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস]

[কাঞ্চী নগরীর অধিবাসী 'দশকুমারচরিতের' রচয়িতা দণ্ডী প্রাচীন ভারতের (৭ম শতক) প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও আলংকারিক। দুই পীঠিকা ও আট উচ্ছ্বাসে বিভক্ত তাঁর গ্রন্থে আট জন রাজকুমারের অভিযান বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীগুলি কাল্পনিক ও অতিবাস্তব আখ্যানকে অবলম্বন ক'রে রচিত হলেও তৎকালীন ভারতীয় সমাজে রাজতান্ত্রিক জীবনধারা ও নগরজীবনের অবক্ষয় সার্থক কলাকুশলতার সঙ্গে তাঁর লেখনীতে চিত্রিত।]

১। তম্ আলপন্তি, তং পার্শ্বে কুর্বন্তি, তং সম্বর্দ্ধয়ন্তি, তস্মৈ দদতি, তস্য বচনং শৃণ্বন্তি, তং বহুমন্যন্তে, তম্ আপ্ততামাপাদয়ন্তি—যঃ অহর্নিশম্ অনবরতম্ উপরচিতাঞ্জলিঃ অধিদৈবতমিব স্তৌতি, যো বা মাহাত্ম্যম্ উদ্ভাবয়তি।

কিশোরী বারাঙ্গনা কামমঞ্জরী—যেন অঙ্গপুরীর অবতংস। সে এসেছে মহর্ষি মরীচির আশ্রমে। চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল তারার মতো ফুল কেটে টপ্‌টপ্ ক'রে পড়ছে তার পুষ্ট পয়োধরে। সংসারের উপর বীতরাগ কামমঞ্জরী মুনির পায়ে মাথা নোয়াল—মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল তার রাশী রাশী কালো চুল।

ঠিক সেই সময় গণিকার মা লোভমঞ্জরী ও অন্যান্য আত্মীয়েরা ত্বরিতপদে আশ্রমে হাজির। দয়ালু মুনি মিষ্টি কথায় তাদের আশ্বস্ত ক'রে কামমঞ্জরীকে জিজ্ঞাসা করলেন তার দুঃখের কারণ। লজ্জায় দুঃখে আকুল গণিকা বলল : 'মুনিবর, এই জীবনে তো সুখ পেলাম না,...তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।'

তখন তার মা চোখের জলে বুক ভিজিয়ে বলতে শুরু করল : 'প্রভু, আমি আপনার দাসী ; না হয় সব দোষ আমারই। তাই ব'লে নিজের দায়িত্ব পালন করব তাতেও অপরাধ! এ যে গণিকা-মায়ের অধিকার! জন্মের পর থেকে মেয়ের গায়ে তেল, হলুদ—এসব কে মাখায়? ওর তেজ, বল, গায়ের রঙ, মেধা--সব কিছুর তদ্বির আমিই করি। ঠিক ঠিক মতো খাইয়ে বায়ু-পিত্ত-রক্ত আর অন্য সবের সামঞ্জস্য ক'রে এমন গোলগাল ক'রে গড়েপিটে লালন পালন করে এই মা। পাঁচ বছর বয়স থেকে জানতে দিইনি ওর বাপ কে ছিল, কোথায় গেল। জন্মদিন, সংক্রান্তি, ব্রতপালন সব ওকে শেখালুম্। পুরুষের সঙ্গে আলাপ, কটাক্ষ, প্রেমের ভান, ন্যাকামি, ছলনা—বেশ্যাতন্ত্রের আরো কতো সব শিক্ষা পেল আমারই কাছে। নাচ-গান-বাজনা, ছবি আঁকা, গন্ধদ্রব্য তৈরী, রান্না, ফুলের সাজ তৈরী, অক্ষর-পরিচয়, ইনিয়েবিনিয়ে কথা বলা—সব শিক্ষার মূলে আমি[1]। আবার ব্যাকরণ, দর্শন, জ্যোতিষ শাস্ত্রের আসল

১। এষ হি গণিকামাতুঃ অধিকারো যৎ দুহিতুর্জন্মনঃ প্রভৃত্যেব অঙ্গক্রিয়া, তেজোবলবর্ণমেধা-সংবর্দ্ধনেন দোষাগ্নিধাতুসাম্যকৃতা, মিতেন আহারেণ শরীরপোষণম্, আপঞ্চমাৎ বর্ষাৎ পিতুরপি অনতিদর্শনম্, জন্মদিনে পুণ্যদিনে

কথাগুলো শেখালুম। বশীকরণ, কামকৌতুক, মুরগী-ষাঁড়-ভেড়ার লড়াই, পাশাখেলা—সব কিছুতেই হাতেখড়ি এই মায়ের কাছে। বিশ্বাসী লোক মারফৎ রতিক্রীড়ার শিক্ষাদীক্ষায় একেবারে ঝানু বানিয়ে দিলুম। কত রকমের গয়না আর ঢিলেঢালা জামাকাপড় পরিয়ে নাচ-গান-যাত্রাব আসরে ওকে এনে পুরুষ মানুষের চোখে তাক লাগিয়ে দিতুম। বড় বড় নাচিয়ে গাইয়েদের আগে থেকে বশ ক'বে রাখতুম, তারপর ওরা সব আমার মেয়ের নাচগানের আসর জমিয়ে বসত, আর চারদিকে ওর প্রশংসা ছড়িয়ে বেড়াত। এমনি ক'রে দৈবজ্ঞদের দিয়ে ওর দেহের শুভ লক্ষণ, বিট-বিদূষক পামর ও পরিব্রাজকদের দিয়ে সমাজের ওপরমহলের চাঁইদের কাছে ওর গতর, স্বভাব এবং রূপ-গুণের প্রস্তাবনা গাইয়েছি। কোন যুবক ওর কথা শুনে ঢলে পড়লে আমিই টাকাপয়সা খরচা ক'রে ওর কাছে তাকে নিয়ে আসতুম; কারণ যে কোন পুরুষকে নিয়ে মজে গেলে তো গণিকার চলে না,—তার জাতি-বংশ, রূপ-যৌবন, ধনসম্পদ, গায়ের জোর, দক্ষতা-সারল্য-পবিত্রতা, টাকাপয়সা খরচার হাত, গানবাজনায় আসক্তি, মিষ্টি স্বভাব, মধুর আলাপ—এত সব বিচার করেই ভালো মানুষের হাতে ও মেয়েকে তুলে দিত কে? এই মা। কখনো বা তেমন পুরুষ মানুষ পাওয়া গেলেও—হয়তো সে 'লায়েক' হয় নি, বাপকে ভয় পায়; তখন কেমন ক'রে তাকে ফাঁদে ফেলতে হয়—এই সব আরো কত কি ওকে শিখিয়েছি! হয়তো গুণবান বিচক্ষণ পুরুষ জুটে গেল; কিন্তু সে পরাধীন, তখন তার কাছে অল্প লাভ করেও বহু পেয়েছি এমনি ছল ক'রে মেয়েকে সপে দিয়েছি। কখনো নাবালকের সঙ্গে গান্ধর্বমতে ওর বিয়ে দিয়ে তার গুরুজন বা পিতামাতার কাছে টাকাকড়ি আদায় করা, স্বীকৃত অর্থ আদায় করতে

চ উৎসবোত্তরো মঙ্গলবিধিঃ, অধ্যাপনম্ অঙ্গবিদ্যানাম্ সাঙ্গানাম্, নৃত্য-গীত-বাদ্য-নাট্য-চিত্রাস্বাদ্য-গন্ধ-পুষ্পকলাসু লিপিজ্ঞান-বচনকৌশলাদিষু চ সম্যগ্-বিনয়নম্।

রাজার কাছে বা বিচারালয়ে যাওয়া, অনুরক্ত প্রেমিকটির জন্য মেয়ে আমার 'সতীর ব্রত' করবে, তার উদ্যোগ করা— কত রকম কাজ ছিল এই মায়ের।

নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা-পার্বণে কখনো লোভী অথচ নিখরচে নাগর এসে বসে রইল, নড়তে চায় না—তখন তাকে তাড়ান আমারই দায়। প্রতিবেশীকে দিয়ে ধনী অথচ কৃপণ পুরুষকে উৎসাহিত ক'রে ঘরে নিয়ে আসা, তার হাত খালি করা; আবার নির্ধন প্রেমিক এসেছেন, তাকে কটুকথা ব'লে, সমাজে তার নিন্দা রটিয়ে, মেয়েকে ঘরে আটকে রেখে গঞ্জনা দিয়ে, ছলছুতোয় অপমান ক'রে তাকে তাড়ান; দেনেওয়ালা নাগর এলে কি পরিমাণ টাকা দিতে পারবে, সব নিশ্চয় ক'রে তার সঙ্গে ওকে ভিড়িয়ে দেওয়া—সবই করেছি।

আসলে গণিকা নাগরের উপর উদ্‌যোগ দেখাবে মাত্র, তাকে নিয়ে ঢলে পড়াটা সাজে না; না হয় তার উপর একটু ভালোবাসা জন্মাল, সে কিন্তু কখনোই কুট্টনী বা বৃদ্ধাকুট্টনীর আদেশ অমান্য করবে না। বেশ্যাদের এত সব নিয়মকানুন রয়েছে, আর স্বয়ং ভগবান তার বিধান দিয়েছেন। অথচ আমার মেয়ে কামমঞ্জরী নিজের ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে এক আগন্তুক 'শিমুল ফুল' ব্রাহ্মণ-যুবককে নিয়ে মজে রইল, নিজেই তার জন্য টাকা খরচ করতে লাগল—এমনি করে তার সঙ্গে একটা মাস কাটিয়ে দিল। 'রাঙা-বাবুরা' কতো এল; কিন্তু সবাইকে হটিয়ে দিল; আয়ের রাস্তা বন্ধ ক'রে নিজের আত্মীয় স্বজনকে ডোবাল। সব দেখে আমি নিষেধ ক'রে বললুম, 'ওলো, এমন দুর্বুদ্ধি তোর, এতে ভাল হবে না।'··· তাই শুনে মেয়ে আমার উপর দেমাক দেখিয়ে চলে এল, নাকি বন-বাস করবে।'

রাজকুমারের শিক্ষাসূচী

[কুবলয়মালা]

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় রাজকুমারদের শিক্ষাপদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অনেক সময় পৃথকভাবে নির্মিত বিদ্যাগৃহে মন্ত্রীপুত্র ও অমাত্যপুত্রদের সঙ্গে রাজপুত্র বাল্য থেকে কৈশোর কাল পর্য্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করতেন। সাধারণ নিয়ম অনুসারে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতেন ; তাই সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় তাকে পারদর্শী ক'রে তোলা হোত। আচার্যদের তিনটি শ্রেণী—কালাচার্য, শিল্পাচার্য ও ধর্মাচার্য। বাহাত্তরটি বিষয় এই শিক্ষা-সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ

১. আলেখ্য (ধূলিচিত্র, সাদৃশ্যচিত্র ও রসচিত্র), ২. নাট্যকলা ৩. জ্যোতিষ, ৪. গণিত, ৫. মূল্যপরিজ্ঞান, ৬. ব্যাকরণ, ৭. বেদশ্রুতি, ৮. গন্ধযুক্তি (গন্ধদ্রব্যের দোষ-গুণ নির্ণয়ের পারদর্শিতা), ৯. গন্ধর্ব (নৃত্য-গীত-বাদ্য), ১০. সাংখ্য, ১১ যোগ, ১২. বৎসর পরিজ্ঞান, ১৩. হোরা (জাতকশাস্ত্র), ১৪. হেতুশাস্ত্র (ন্যায়দর্শনাদি) ১৫. ছন্দঃশাস্ত্র, ১৬. বৃত্তিভাষ্যজ্ঞান (ধর্মশাস্ত্রাদির টীকা, ভাষ্য, বৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান), ১৭. নিরুক্তশাস্ত্র (পদ ও পদার্থের জ্ঞান), ১৮. স্বপ্নশাস্ত্র, ১৯. আয়ুর্জ্ঞান, ২০. অশ্বলক্ষণ, ২১. গজলক্ষণ, ২২. শকুনশাস্ত্র (বিবিধ পাখীর লক্ষণ, স্বর, উপকারিতা প্রভৃতি), ২৩. বাস্তুবিদ্যা, ২৪. বার্তাক্রীড়া (কৃষি বাণিজ্য), ২৫. গুহাজ্ঞান, ২৬. দন্তকর্ম, ২৭. ইন্দ্রজাল, ২৮. তাম্রকর্ম, ২৯. লেপকর্ম, ৩০. বিনিয়োগ (ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতির জ্ঞান), ৩১. পত্রচ্ছেদ (অলংকরণ-বিদ্যা) ৩২. কাব্যকলা, ৩৩. পুষ্পবিধি, ৩৪. অল্লকর্ম (সেলাই), ৩৫. ধাতুবিদ্যা, ৩৬. আখ্যানবিদ্যা (আখ্যায়িকা, গল্প প্রভৃতিতে জ্ঞান), ৩৭. তন্ত্র, ৩৮. শারীরবিদ্যা, ৩৯. অক্ষরনিঘণ্টু (বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শিতা), ৪০. পদজ্ঞান, ৪১. রামায়ণ মহাভারত শিক্ষা,

৪২. লৌহকর্ম (অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য বস্তুতে লৌহের ব্যবহার), ৪৩. সেনানির্গমন, ৪৪. সুবর্ণকর্ম, ৪৫. চিত্রবিদ্যা, ৪৬. দ্যূতবিদ্যা, ৪৭. যন্ত্রবিদ্যা, ৪৮. বাণিজ্য, ৪৯. মাল্যনির্মাণ, ৫০. ভস্মনির্মাণ, ৫১. বস্ত্রনির্মাণ, ৫২. বস্ত্রকর্ম, ৫৩. অলংকারকর্ম, ৫৪. জলস্রোতপরিজ্ঞান, ৫৫. পঞ্চদশ তন্ত্রে পাণ্ডিত্য, ৫৬. নাটকযোগ, ৫৭. কথা-নিবন্ধ, ৫৮. ধনুর্বেদ, ৫৯. আয়ুর্বেদ, ৬০. ভূবিদ্যা, ৬১. আরোহ-জ্ঞান (বৃক্ষারোহণ, পর্বতারোহণ প্রভৃতি), ৬২. লোকবৃত্তান্ত, ৬৩. ঔষধনির্মাণ, ৬৪. কীলকবিদ্যা (তালা নির্মাণ ও উন্মোচন), ৬৫. মাতৃকাপরিজ্ঞান (ভাষাবিজ্ঞান), ৬৬. তিতির লড়াই, ৬৭. কুক্কুট-যুদ্ধ (মুরগী লড়াই), ৬৮. শয়নবিন্যাস, ৬৯. আসনবিন্যাস, ৭০. ঋণদান ও গ্রহণ, ৭১. খাদ্যদ্রব্যের মাধুর্য পরীক্ষা, ৭২. আলতা, মোম প্রভৃতি তৈরীর নিয়ম।

কামশাস্ত্রের চৌষট্টি কলা

কামসূত্রের রচয়িতা বাৎস্যায়ন (আনুমানিক খৃ. পূ. ২য় শতক) তাঁর গ্রন্থে কামশাস্ত্রবিষয়ক চৌষট্টি কলার উল্লেখ এবং নর-নারীর জীবনে এগুলি শিক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় প্রাচীন ভারতে ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কামশাস্ত্রের theory ও practice দুরকম শিক্ষার ব্যবস্থাই ছিল। বাৎস্যায়ন বুঝেছিলেন নরনারীর যৌন জীবন জীবনের সর্বাপেক্ষা জটিলতম ও বৃহত্তম অধ্যায়ঃ

পুরুষগণ ধর্মবিদ্যা, অর্থবিদ্যা ও তদীয় অন্যান্য অঙ্গবিদ্যার সঙ্গে কামশাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন ; এগুলির পরস্পরের মধ্যে মূলতঃ কোন বিরোধ নেই।

ধর্মবিদ্যা ঃ চার বেদ, ছয় বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ), চৌদ্দ পুরাণ এবং ন্যায় মীমাংসা স্মৃতি প্রভৃতি।

অর্থবিদ্যা : শুক্রনীতি, কৌটিল্যনীতি, কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ প্রভৃতি।

নারীও প্রাগ্‌যৌবনে কামশাস্ত্র ও তার সমস্ত অঙ্গ অধ্যয়ন করবেন। যাদের ভাষাজ্ঞান বা ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি নেই, তারা কামশাস্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগগুলি শিক্ষা করবেন। অনেক সময় দেখা যায় বিদগ্ধা গণিকা, রাজকন্যা, মহামাত্রকন্যা প্রভৃতি কামশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত হন। গণিকারা কুট্টনী বা বিশ্বাসী পুরুষের মারফৎ, কুলাঙ্গনারা অভিজ্ঞ স্ত্রীলোকের মারফৎ এবং বিদুষী কন্যারা স্বয়ং কামশাস্ত্রের সমগ্র বিষয় অথবা নির্বাচিত বিষয় শিক্ষা করবেন। সাধারণ স্ত্রীলোকেরা বিশ্বাস্য গুরুর কাছে নির্জনে এই শাস্ত্রের সমগ্র আংশিক শিক্ষা প্রয়োগে পারদর্শিতা লাভ করবেন। কিশোরী অথবা তরুণী কন্যারা নির্জনে এই চৌষট্টি কলা শিক্ষা করবেন। যৌন সম্পর্কের অভিজ্ঞতাসম্পন্না সহসংবর্দ্ধিতা ধাত্রীকন্যা, বান্ধবী, সমবয়স্কা মাতৃস্বসা, বৃদ্ধা দাসী, ভিক্ষুকী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী—এই ব্যক্তিরাই কন্যার শিক্ষিকা হওয়ার যোগ্যা।

কামশাস্ত্রের চৌষট্টি কলা বা অঙ্গবিদ্যা হোল :

(১-৪) গীত, বাদ্য, নৃত্য ও আলেখ্য বা চিত্রাঙ্কন ও চিত্র নির্মাণবিদ্যা,

(৫) বিশেষকচ্ছেদ্য (অঙ্গের প্রসাধনে তিলক, পত্র প্রভৃতি রচনা),

(৬) তণ্ডুলকুসুমবলিবিচার (অখণ্ড তণ্ডুল, তণ্ডুলচূর্ণ ইত্যাদির দ্বারা ফুল, আলপনা প্রভৃতি তৈরী),

(৭) পুষ্পাস্তরণ (ফুলের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার সাজসজ্জা),

(৮) দশন-বসন-অঙ্গরাগ (দশনরঞ্জন, বসনরঞ্জন ও অঙ্গরাগ),

(৯) মণিভূমিকা (আসল বা নকল মণিমাণিক্যের দ্বারা গৃহ-ভিত্তি, প্রাকার প্রভৃতি সাজানো),

(১০) শয়ন রচনা (দেহ-মন-স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা ক'রে শয্যা তৈরী),

(১১) উদকবাদ্য (হাতের আঘাতে জলের মধ্যে বিবিধ শব্দ করা),

(১২) চিত্রযোগ (বশীকরণ, অভিচার প্রভৃতি),

(১৩) উদকাঘাত (পিচ্‌কারী প্রভৃতি দ্বারা জলক্রীড়া),

(১৪) মাল্যগ্রথনবিকল্প (মালা গাঁথার কলাকৌশল),

(১৫) শেখরক-আপীড়কযোজন (টুপী, পাগড়ী, খোঁপা প্রভৃতি সাজ),

(১৬) নেপথ্যপ্রয়োগ (নট-নটীকে সাজানো),

(১৭) কর্ণপত্রভঙ্গ (হাতীর দাঁত, শাঁখা প্রভৃতির দ্বারা কানের অলংকার নির্মাণ),

(১৮) গন্ধযুক্তি (গন্ধদ্রব্য তৈরী। বৃহৎ সংহিতায় ১,৭৪৭২০ প্রকার সুগন্ধি (scent) তৈরীর প্রণালী বলা আছে),

(১৯) ভূষণযোজন (কটক, কুণ্ডল প্রভৃতিতে লকেট গাঁথা ও সাজানোর কলাকৌশল),

(২০) ইন্দ্রজাল,

(২১) কৌচুমার-যোগ (কুরূপাকে সুরূপা, সুরূপাকে কুরূপা করা),

(২২) হস্তলাঘব (হাতসাফাই ও হাতের নানারকম ম্যাজিক),

(২৩) বিচিত্রশাকযূষ-ভক্ষ্যবিকারক্রিয়া (শাক ও নিরামিষ রান্না এবং মিষ্টান্ন প্রস্তুত),

(২৪) পানকরস-রাগাসব-যোজন (চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় প্রস্তুত),

(২৫) সূচীবানকর্ম (সীবন অর্থাৎ কাটা কাপড় সেলাই, উতন অর্থাৎ রিপু করা এবং বিরচনা বা নক্সার কাজ),

(২৬) সূত্রক্রীড়া (সুতা বা রশির ম্যাজিক),

(২৭) বীণা-ডমরুবাদ্য (মুখের সাহায্যে বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি অনুকরণ),

(২৮) প্রহেলিকা (হেঁয়ালি প্রভৃতি),

(২৯) প্রতিমালা (কবিতায় প্রশ্নোত্তর),

(৩০) দুর্বাচকযোগ (দুরুচ্চার্য ও দুর্বোধ্য কবিতার ব্যবহার),

(৩১) পুস্তকবাচন (কাব্য পাঠ ও আবৃত্তি),

(৩২) নাটক আখ্যায়িকা দর্শন,

(৩৩) কাব্যসমস্যাপূরণ (শ্লোক, শ্লোকপদ প্রভৃতি পূরণ),

(৩৪) পট্টিকা বেত্রবানবিকল্প (দড়ি ও বেতের দ্বারা খাট, মোড়া ইত্যাদি তৈরী),

(৩৫) তর্কুকর্ম (কোঁদান, পালিশ করা ইত্যাদি),

(৩৬) তক্ষণকর্ম (ছুতারের কাজ),

(৩৭) বাস্তুবিদ্যা (স্থাপত্যশিল্প),

(৩৮) রূপ্যরত্নপরীক্ষা (রৌপ্য, ধাতব মুদ্রা, মুক্তা, হীরক প্রভৃতির পরীক্ষা),

(৩৯) ধাতুবাদ (সোনারূপার পাতন, শোধন ও যোজনা),

(৪০) মণিরাগ-আকরজ্ঞান (মণিতে রঙ করা ও খনিবিদ্যা),

(৪১) বৃক্ষায়ুর্বেদজ্ঞান (গাছ-গাছড়া রোপণ, পালন ও চিকিৎসা),

(৪২) মেষ-কুক্কুট-লাবক যুদ্ধবিধি (ভেড়া, মুরগী প্রভৃতির লড়াই),

(৪৩) শুক-সারিকা-প্রলাপন (টিয়া, চন্দনা প্রভৃতিকে কথা শেখান),

(৪৪) উৎসাদন, সংবাহন ও কেশমর্দনের কৌশল,

(৪৫) অক্ষরমুষ্টিকা (সাংকেতিক লিখন, ইঙ্গিতে অর্থজ্ঞাপন প্রভৃতি),

(৪৬) ম্লেচ্ছিতবিকল্প (সংস্কৃতের পরিবর্তে ম্লেচ্ছ বা বিদেশী ভাষার ব্যবহার),

(৪৭) দেশভাষাজ্ঞান (প্রাদেশিক ভাষার জ্ঞান),

(৪৮) পুষ্পশকটিকা (ফুলের দ্বারা গাড়ী সাজান),

(৪৯) নিমিত্তজ্ঞান (হাঁচি, টিকটিকি, শকুনশাস্ত্র ইত্যাদি),

(৫০) যন্ত্রমাতৃকা (যন্ত্রের জ্ঞান, পরিচালনা প্রভৃতি),

(৫১) ধারণমাতৃকা (অধীত গ্রন্থ পুনরালোচনা)

(৫২) সংপাঠ্য (গ্রন্থের সাহায্য ছাড়া পাঠ্য বিষয় আবৃত্তি),

(৫৩) মানসী কাব্যক্রিয়া (অপরের মানসিক ভাব অনুভব ক'রে তদ্বিষয়ক কবিতা রচনা),

(৫৪) অভিধানকোষ (অভিধান গ্রন্থ অর্থাৎ শব্দার্থের জ্ঞান এবং কোষ বা সংকলন কাব্যে পাণ্ডিত্য),

(৫৫-৫৬) ছন্দোজ্ঞান ও অলঙ্কারজ্ঞান,

(৫৭) ছলিতকযোগ (আত্মগোপনপূর্বক পরকে ছলনা করা),

(৫৮) বস্ত্রগোপন (বস্ত্র পরিধানের কলাকৌশল),

(৫৯-৬০) দ্যূতক্রীড়া ও আকর্ষ-ক্রীড়া,

(৬১) বালক্রীড়নক জ্ঞান (বালকোচিত ক্রীড়ায় ও পুতুল প্রভৃতি নির্মাণে পারদর্শিতা),

(৬২) বৈনয়িকী (বিনয়াচার শিক্ষা),

(৬৩) বৈজয়িকী (যুদ্ধ প্রভৃতিতে বিজয়ালাভের জন্য নানাবিধ অভিচার ও দৈব অনুষ্ঠান পালন),

(৬৪) বৈয়ামিকী (মৃগয়া, কুস্তি, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি)

বিবাহ বাসরে পার্বতীর কৌতুক-মঙ্গল

[কুমারসম্ভব, সপ্তম সর্গ]

গিরিরাজ হিমালয়ের আলয়ে আত্মীয় স্বজনেরা পৌঁছে গেছেন। শুক্ল পক্ষের জামিত্রগুণযুক্ত তিথিতে শুভলগ্নে গিরিরাজকন্যা পার্বতীর বিবাহের মঙ্গলাচার শুরু হোল। পুরনারীরা আপন আপন গৃহে সানন্দে বৈবাহিক ক্রিয়া কলাপে মেতে উঠলেন। হিমালয়ের অন্তঃ-পুর আর সমগ্র নগরী মিলে আজ যেন একটিই সংসার। পথে পথে বিচিত্রবর্ণ কুসুমের মাঙ্গলিক মালা, ক্ষৌমবাসের পতাকাশ্রেণী আর সোনার তোরণ—এ যেন দ্বিতীয় স্বর্গপুরী! কুমারী উমা পিতা-মাতার জীবন; আজ তারই পাণিগ্রহণের দিন। গুরুজনেরা একে একে তাকে কোলে জড়িয়ে আদর করছেন, আশীর্বাদ দিচ্ছেন। নতুন নতুন অলঙ্কার ও সাজ সজ্জায় সেজেছে আদরিণী অপর্ণা; সে আজ সবার একমাত্র স্নেহপাত্রী।

মিত্র-দেবতার শুভ মুহূর্তে যখন চন্দ্রের সঙ্গে উত্তরফাল্গুনীর যোগ হয়েছে, তখন এয়োস্ত্রীরা উমার প্রসাধন রচনায় মনোনিবেশ করলেন। পার্বতী শ্বেতসরিষা ও দূর্বাদল মাথায় নিল, তার নাভিনিম্নে ক্ষৌমবাস পরিয়ে, হাতে বাণ দিয়ে গায়ে তেল-হলুদ মাখানো ও স্নান সারা হোল। কৃষ্ণপক্ষের শেষে চন্দ্রকলা যেমন শোভা পায়, উমাও নব-বধূর বেশে অপূর্ব সুন্দরী হ'য়ে উঠল। লোধ্ররেণু মাখিয়ে তার গায়ের তেল শুকানো হোল, তারপর ঘন প্রসাধনে অঙ্গরাগ শেষ হোল। উমার পরিধানে মঙ্গলস্নানের বিশুদ্ধ বস্ত্র। এবার পুরস্ত্রীরা অভিষেক স্নানের জন্য তাকে চতুষ্ক প্রাঙ্গণে নিয়ে এলেন। মঙ্গলবাদ্য বেজে চলেছে, মুক্তাফলের আলপনা-আঁকা মরকতশিলার পাটায় বসিয়ে সোনার ঘড়ায় জল ঢেলে তাকে স্নান করান হোল। মঙ্গল স্নানে শুদ্ধশরীরা পার্বতী বরকে অভ্যর্থনার যোগ্য বস্ত্রে সেজেছে—যেন শরতের নির্মল জলে বিধৌতা কাশকুসুমে সজ্জিতা শুভ্রা ধরণী।

পতিব্রতা রমণীরা উমাকে চতুর্দিকে ঘিরে মণিস্তম্ভে ঘেরা ছাঁদনা তলার কৌতুকবেদীতে এনে আসনের উপর বসালেন। সুন্দরী পার্বতীকে পূর্বমুখে বসিয়ে তার সম্মুখে বসে সবাই অপলক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন মেনকা-তনয়াব অনুপম রূপ। কোন এয়োস্ত্রী ধূপের আগুনে তার চুল শুকিয়ে দূর্বা ও ফুল সমেত মধুকফুলের শুভ্র মালা খোঁপায় পরিয়ে দিল[১]; কেউ বা তার অঙ্গে অগুরু আর গোরোচনার পত্রলেখা এঁকে দিল;—চক্রবাক-শোভিত গঙ্গার শোভাও বুঝি তার কাছে ম্লান। সযত্নলালিত অবিন্যস্ত চুলে মুখের কি অপূর্ব শ্রী; ভ্রমরের মাঝে পদ্ম অথবা মেঘের ফাঁকে পূর্ণ চাঁদও হার মেনে যায়। তার গণ্ডদেশ লোধ্রপরাগ ও গোরোচনার আভায় লোহিতবর্ণ, কর্ণার্পিত যবের অঙ্কুর দুলতে দুলতে সেই আভায় রক্তিম হয়ে উঠল[২]। উমার গায়ের কি মনোহারী গড়ন। সূক্ষ্ম রেখায় বিভক্ত রক্তিম অধর মোমের প্রলেপে আরও লাল হ'য়ে উঠেছে। এ অধর অচিবেই তার লাবণ্যেব সার্থকতা পাবে এই ভেবে যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল। জনৈকা সহচরী উমার পায়ে আলতা পরিয়ে দিতে দিতে পরিহাস ক'রে বলল: 'এই আলতা রাঙ্গানো পায়ে বরের মাথার চন্দ্রকলা ছুঁবি। অমনি সলজ্জ উমা তাকে নিঃশব্দে ফুলের মালা ছুঁড়ে আঘাত করল। বিকশিত পদ্ম-পলাশের মতো দীঘল চোখ দেখে প্রসাধনকারিণীরা ভাবল এ চোখের আবার প্রসাধন কি! কিন্তু বিবাহের দিনে মঙ্গল আচার তো বাদ দেওয়া যায় না, তাই তারা সেই ডাগব চোখে নীলাঞ্জন পরিয়ে দিল। আজ অঙ্গা-ভবণে সজ্জিতা পার্বতী যেন কুসুম-মণ্ডিতা একটি লতিকা, কিম্বা জ্যোৎস্নালোকিতা যামিনী। কুমারী গৌরী যখন আরশিতে নিজেব

১। ধূপোষ্মণা ত্যাজিতমার্দ্রভাবং / কেশান্তমন্তঃ কুসুমং তদীয়ম্
পর্যাক্ষিপৎ কাচিদুদারবন্ধং / দূর্বাবতা পাণ্ডুমধুকদাম্না।

২। কর্ণার্পিতো লোধ্রকষায়রুক্ষে / গোরোচনাক্ষেপনিতান্তগৌরে
তস্যাঃ কপোলে পরভাগলাভাৎ / ববন্ধ চক্ষুংষি যবপ্ররোহঃ।

বধূরূপ দেখল, স্বামীর সঙ্গে মিলনের উৎকণ্ঠায় তার হৃদয় আরও চঞ্চল হোল ; রমণীর রমণীয় বেশ তো প্রিয়তমের দর্শনেই সার্থক হ'য়ে ওঠে।

তারপর মা মেনকা দুই আঙ্গুলে হরিতাল ও মনঃশিলার প্রসাধন নিয়ে হাতীর দাঁতের দুলপরা উমার মুখ একটু তুলে ধরলেন এবং কোন মতে বিবাহ-দীক্ষার তিলক এঁকে দিলেন। কন্যার স্তনোদ্গম থেকে যে বাসনা তাঁর মনে বাসা বেঁধেছিল, সেই বাসনা আজ পূর্ণ হোল। আনন্দের অশ্রুতে মায়ের চোখ ভরে এলো ; ভুল ক'রে তিনি মঙ্গল-সূত্র অস্থানে পরিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ ধাত্রী সেটি যথাস্থানে নিবেশ করল। এবার কিশোরী উমা ক্ষৌমবাস পরিধান ক'রে নববধূর বেশে সাজল ; তাকে দেখে ফেনপুঞ্জিত ক্ষীর সমুদ্রের বেলাভূমি আর শারদ পূর্ণিমার শোভা মনে পড়ে[১]। হাতে দর্পণ নিয়ে পার্বতী মায়ের কথামত কুলদেবতাদের প্রণাম সেরে সতীসাধ্বী-দের পদধূলি মাথায় ছোঁয়াল। সকলে আশীর্বাদ ক'রে বললেন—স্বামীসোহাগিনী হও।

গণিকা ব্যবহার

[দামোদর গুপ্তের কুট্টনীমত]

কুট্টনীমত গ্রন্থের রচয়িতা দামোদর গুপ্ত ছিলেন কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড়ের (৭৭৯-৮১৩ খৃঃ) মুখ্যমন্ত্রী। লেখক বাৎস্যায়নের কামসূত্রের বৈশিক অধিকরণকে কেন্দ্র ক'রে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রাচীন মতানুসারে এ রচনা হোল 'নিদর্শন কাব্য', 'খণ্ডকাব্য' অথবা 'কেলিকাব্য' ; আধুনিক সমালোচকদের অনেকেই একে 'পর্ণোগ্র্যাফি' বলতে চান ঃ

যদিও যৌবনে প্রাণীদের উপর কামের দুর্বার প্রভাব, তবুও

১। ক্ষীরোদবেলেব সফেনপুঞ্জা / পর্যাপ্তচন্দ্রেব শরৎত্রিযামা।
নবং নবক্ষৌমনিবাসিনী সা / ভূয়ো বভৌ দর্পণমাদধানা ॥

বিবেকী মানুষের গণিকাসক্তির পরিণাম চিন্তা করা উচিত। বারনারীদের বিভ্রম, অনুরাগ, প্রেম, অভিলাষ ও দেহরতি পুরুষের ধনসমৃদ্ধিতে প্রকাশ পায়, আবার বিত্তনাশের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায়; তারা সুসময়ের বন্ধু মাত্র। বারবধূ ক্ষণিকের পরিচিত পুরুষের প্রেমে মাতোয়ারা হয়, অথচ বহুকালের পরিচিত প্রণয়ীকে উপেক্ষা করে—যেন তার সঙ্গে জীবনে কখনো সাক্ষাৎ হয় নি। সদ্‌বংশে জাত মানুষ কেন এই পণ্যাঙ্গনাদের সান্নিধ্যে থাকবে? গণিকার কাছে ধনী ব্যক্তি যেন দ্বিতীয় কামদেব অথচ নির্ধন ব্যক্তি গুণবান হলেও নিন্দনীয় ও বিরাগভাজন হন।

পণ্যরমণীর জঘনাবরণ লজ্জা নিবারণের জন্য নয়, নিতম্বের সূক্ষ্ম বসন পুরুষের কৌতুকবৃদ্ধির জন্যই: তাদের দেহে উজ্জ্বল বেষ রচনা কামিজনকে আকর্ষণের জন্য, লোকমর্যাদার জন্য নয়; মাংস ও অন্যান্য তৃপ্তিকর ভোজন রসনার আস্বাদনের জন্য নয়, শরীরের অপরিমিত ক্ষয় নিবারণের জন্য; চিত্রাঙ্কন ও অন্যান্য সুকুমারকলায় আসক্তি চিত্তবিনোদনের জন্য নয়, দেহ-ব্যবসায়ে বৈদগ্ধ্যের জন্য। পণ্যাঙ্গনাদের অধরেই রক্তিমা, হৃদয়ে নেই অনুরাগ, ভুজলতায় আছে সরলতা, চিত্তে নেই সারল্য; পয়োধরেই সমুন্নতি, সজ্জন অভিনন্দনের আচরণে নেই মানসিক উন্নতি; জঘনেই গুরুতা, সদ্‌বংশজাত মানুষের প্রতি নেই গৌরব; বিলাস গমনেই আছে অলসতা, লোকবঞ্চনায় নেই আলস্য। কুলটারা প্রসাধনের সময় অঙ্গরাগ ও বেশভূষার বিচার করে, কিন্তু পুরুষপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদজ্ঞান করে না; শীত নিবারণ অথবা অধরদংশনের ব্যথা নিবারণের জন্য মদনাসঙ্গ অর্থাৎ মোম লেপন করে, কিন্তু পুরুষসম্ভোগে 'মদনাসঙ্গ' বা কামের অনুরাগ প্রকাশ করে না। বারস্ত্রীরা কিশোরের প্রতি প্রেম ও বৃদ্ধের প্রতি অনুরাগ দেখায়, কিন্তু ক্লীবের প্রতি আসক্তিশূন্যা হয়। রতিশ্রমের স্বেদজলে তাদের দেহ সিক্ত হয়, কিন্তু হৃদয় কখনো সিক্ত হয় না; পুরুষ-প্রলোভনের জন্য শরীরে কম্পন জাগায়, কিন্তু অন্তর

হীরকখণ্ডের মতো কঠিন। পণ্যাঙ্গনারা জঘনচপলা অথচ অনার্যা ; কোকিলের মতো পরভৃতিকা, আর নয়নে কৃত্রিম রাগযুক্তা ; দেহ বিতরণে দক্ষ, কিন্তু হৃদয় বিতরণে কৃপণ। বেশ্যারা নকুলা অর্থাৎ নকুলের মতো চপলা আবার নীচকুলজাতা ; ভুজঙ্গদংশনে অর্থাৎ বিট পামরদের পীড়নে অভিজ্ঞা। কুলটারা মদনপ্রদীপের স্নেহ অর্থাৎ তৈল, কিন্তু তাদের হৃদয়ে নেই স্নেহ অর্থাৎ ভালোবাসা। বার বিলাসিনীরা কৃষ্ণে অর্থাৎ পাপে আসক্তা অথচ হিরণ্যকশিপুর অর্থাৎ সুবর্ণ ও অন্নবস্ত্রের অনুরক্তা! মেরুপর্বতের নিতম্ব যেমন সহস্র কিম্পুরুষের বাসস্থান, তেমনি গণিকার বিশাল নিতম্বে সহস্র কুৎসিত পুরুষের অধিবাস ; রাজনীতিতে 'অনর্থ-সংযোগ' যেমন সর্বদা পরিহর্তব্য, তেমনি পণ্যাঙ্গনারাও 'অনর্থ-সংযোগ' অর্থাৎ অর্থহীন পুরুষের সম্পর্ক পরিহার করে। পদ্ম যেমন 'বহুমিত্রকরবিদারণে' অর্থাৎ বহু সূর্যকিরণে বিকশিত হয়, তেমনি 'বহুমিত্রকরবিদারণে' অর্থাৎ বহু প্রণয়ীর নখাঘাতে অভ্যুদয় লাভ করে ; ডাকিনীরা যেমন 'রক্ত-আকর্ষণকৌশল' অর্থাৎ রক্ত চোষণের উপায় জানে, তেমনি ডাকিনীর মতো বেশবধূরা রক্ত-আকর্ষণকৌশল অর্থাৎ অনুরক্ত কামুককে আকর্ষণের কায়দা জানে ; ক্ষুদ্রা অর্থাৎ মধুমক্ষিকারা মধুপান কালে ফুলকে বহুক্ষণ চুম্বন করে, তেমনি ক্ষুদ্রা অর্থাৎ পুংশ্চলীরা পুরুষকে নিঃস্ব করার জন্য দীর্ঘকাল চুম্বনদানে আপ্যায়ন করে ; কঠিন চুম্বক যেমন অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত হলেও লোহাকে আকর্ষণ করে, তেমনি কঠোরহৃদয়া বেশ্যারা বিষয়াসক্ত পুরুষকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে ; শৃঙ্গাররাগে সজ্জিতা অর্থাৎ সিন্দুর প্রভৃতিতে অলংকৃতা হস্তিনী যেমন মাহুতের দ্বারা নিতম্বদেশে প্রদত্ত আঘাত সহ্য করে, তেমনি বারযোষারা কামুকের প্রতি শৃঙ্গারের অনুরাগ প্রকাশ করে, এবং নিতম্ব পীড়ন সহ্য করে ; যেমন অল্পদামী কৌটার উপরিভাগে মনোলোভা কারুকার্য থাকলেও তা অন্তঃসারশূন্য, তেমনি এরা বহুমূল্য পোষাকে সজ্জিত হলেও অন্তঃসারহীন। যে হতভাগ্যেরা

বারবধূর প্রেমে অনুরক্ত হয়, তারা দরিদ্র ভিক্ষুকের মতো জোড়হাতে প্রত্যাগমন করে।

গণিকা বসন্তসেনার বাসভবন

[মৃচ্ছকটিক, চতুর্থ অঙ্ক]

বাঃ! গণিকা বসন্তসেনার গৃহদ্বারের কি অপূর্ব বাহার! চারিদিক জল দিয়ে ধোওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, গোময়লিপ্ত। কতো রকমের সুগন্ধি কুসুমের গুচ্ছ দিয়ে সাজানো। হাতীর দাঁতের উন্নত তোরণে বাহারী সিংহদ্বার যেন আকাশকে দেখার কৌতূহলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে; মল্লিকা ফুলের রাশী রাশী মালা বাতাসে আন্দোলিত—যেন ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের বিশাল শুঁড়। তোরণেব মাথায় মণিখচিত সারি সারি সৌভাগ্য পতাকা হাওয়ায় উড়ছে, সিংদরজা কি হীরেমাণিকবসানো সুন্দর আঙ্গুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে! প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে স্তম্ভবেদিকার উপরে সবুজ আম্র-পল্লবে সাজানো স্ফটিকনির্মিত দুটি মঙ্গলঘট। রূপোর পাল্লাবসানো সোনার কপাট জোড়া হিরণ্যকশিপুর বক্ষোদেশের মতো কী কঠিন আর দুর্ভেদ্য!

প্রথম মহলে দেখা যাচ্ছে চাঁদ, শাঁখ আর শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্র প্রাসাদশ্রেণী; সমস্ত ঘরগুলি পরিষ্কার ধব্‌ধবে, মাঝে মাঝে রত্নের কারুকার্য, সোনার পাতায় মোড়া সিঁড়ি। মুক্তামালায় সাজানো স্ফটিকের জানালাগুলি যেন চাঁদমুখ দিয়ে উজ্জয়িনীর দিকে তাকিয়ে আছে। এখানে দেখছি দৌবারিক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের মতো দিব্যি আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওদিকে কতকগুলো কাক কলমাচালের দইমাখানো ভাত পূজার থালার মধ্যে দেখে লোভে পড়লেও চুনগোলা ভেবে খেতে সাহস পাচ্ছে না।

দ্বিতীয় মহলে দেখছি গাড়ী টানার বলদগুলো বাঁধা রয়েছে; ঘাস আর ভূষি খেয়ে পুষ্ট তাদের চেহারা, তেলচক্‌চকে শিঙ্‌।

অপমানিত কুলীন ব্রাহ্মণের মতো ঐ মহিষটি ফোঁস্ ফোঁস্ করছে; যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা মল্লযোদ্ধার মতো এই ভেঁড়াটির ঘাড় ডলে দিচ্ছে; এদিকে কেউ ঘোড়ার ঘাড়ের চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। ঘোড়াশালায় একটা বাঁদরকে দেখছি চোরের মতো শক্ত ক'রে বেঁধে রেখেছে; ওদিকে আবার হাতীপালকরা হাতীগুলোকে সিদ্ধ ভাতের ঘিমাখানো পিণ্ড খাওয়াচ্ছে।

তৃতীয় মহলে বিত্তবান যুবকদের জন্য আসনাদি পাতা। পাশার খাটে অর্ধপঠিত একটি বই খোলা পড়ে রয়েছে। অন্য একটি পাশার খাটে সোনা দিয়ে তৈরী পাশার ঘুঁটি সাজানো। আবার কামশাস্ত্রে নিপুণ গণিকা আর বৃদ্ধ বিটরা নানা রঙের ছবিওয়ালা চিত্রফলক হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চতুর্থ মহলে দেখছি যুবতীরা মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে, মেঘের মতো গুরুগম্ভীর আওয়াজ, আর সেই সঙ্গে সমান তালে বাজছে আকাশ থেকে খসে পড়া ক্ষীণপুণ্য তারার মতো কাঁসার করতালগুলি। ভ্রমর-গুঞ্জনের মতো মিষ্টি সুরে বাঁশী বাজছে; কোন শিল্পী তার বীণাটীকে ঈর্ষ্যাপ্রণয়কুপিতা নারীর মতো কোলে ক'রে আঙুলের আঁচড়ে বাজিয়ে চলেছে। ওদিকে তরুণী গণিকাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, মধুপানমত্ত মৌমাছিদের মতো মিষ্টি আওয়াজ, এরা সব গান নাচ আর আদিরসের অভিনয় শিখছে। ঠাণ্ডা বাতাস ধরার জন্য জল-কলসগুলি উল্টো ক'রে জানলায় জানলায় ঝোলান রয়েছে।

পঞ্চম মহল হিং আর তেলের গন্ধে ভরপুর; এখানে গরীব মানুষের লোভ সামলানো মহা দায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চুলোর মুখ থেকে কতো রকম সুগন্ধি ধুঁয়ো বেরোচ্ছে—উনুনগুলো যেন নিশ্বাস ছাড়ছে। নানা রকমের খাদ্যদ্রব্য তৈরী হচ্ছে। এখানে দেখছি কশাই ছেলেটি কাটা পশুর পেটের মাংস ছেঁড়া কাপড়ের মতো ধোলাই করছে। ওদিকে সূপকার কতো রকমের মিষ্টি আর ভাজা তৈরী করছে। এই মহল্লায় বহুমূল্য অলংকার পরে সুন্দরী বারবধূ

আর বিট পামররা ভীড় জমিয়েছে, মনে হচ্ছে অপ্সরা-গন্ধর্বদের হাট বসেছে।

ষষ্ঠ মহলে দেখছি সুবর্ণরত্নের তোরণগুলি শোভা পাচ্ছে, এগুলি নীলা দিয়ে এমনভাবে তৈরী মনে হচ্ছে সারি সারি রামধনু। ওদিকে রত্নকাররা পরস্পর মণিমাণিক্য যাচাই করছে—বৈদূর্য, মুক্তা, প্রবাল, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল, পদ্মরাগ, মরকত আরো কতো কি। সোনার অলংকারে চুণি বসানো হচ্ছে; কতো রকমারী সোনার গয়না; লাল সুতোয় মুক্তোর মালা গাঁথা হচ্ছে; বৈদূর্যমণির উপর চমকানো পালিশ; শাঁখ কেটে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে, প্রবাল শাণে ঘষছে, ভিজে কুঙ্কুম শুকোতো দিয়েছে, কস্তূরী জলে ভিজিয়ে নরম করা হচ্ছে; চন্দন ঘষছে; নানা রকমের গন্ধদ্রব্য মেশানো হচ্ছে। লম্পটদের হাতে কর্পূরমেশানো পান বিতবণ করছে গণিকারা; তাদের বাঁকা চোখের চাউনি, হাসির ফোয়ারা, অশ্লীল ভাষা আর বাবে বারে মদ খাওয়া—সব মিলে আসর বেশ জমে উঠেছে!

সপ্তম মহলটি পক্ষিশালা। ছোট ছোট খোপে পায়রাগুলি জোড়ায় জোড়ায় দিব্যি আনন্দে একে অপরকে চুম্বন করছে। খাঁচার মধ্যে শুকপাখীটি দইমাখানো ভাত খেয়ে ব্রাহ্মণের মতো বেদমন্ত্র আবৃত্তি করছে; এই সারিকাটি আবার প্রভুর আদুরে দাসীর মতো বক্‌বক্ ক'রে চলেছে; ওখানে একটি কোকিল নানা রকমেব ফলের রস খেয়ে দুষ্টা দাসীর মতো কূজন করছে। দাঁড়ের সঙ্গে সারি সারি খাঁচা ঝুলছে;—তার মধ্যে কোয়েল পাখীরা ঝগড়া করছে; তিতির পাখীরা পরস্পর আলাপ করছে; নখী পায়রাগুলো একে অপরকে তাড়া করছে; পোষা ময়ুরটি যেন মণিমাণিক্য দিয়ে সাজানো বিচিত্র পেখম মেলে দিয়ে নাচতে নাচতে রৌদ্রদগ্ধ প্রাসাদকে বাতাস করছে; গলিত জ্যোৎস্নাধারার মতো রাজহাসগুলি যেন বিলাসগতি শিক্ষার জন্য সুন্দরীদের পিছনে পিছনে চলেছে; গৃহসারসগুলি বুড়ো নপুংসকদের মতো আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে

এগোচ্ছে। সত্যিই আশ্চর্য! এই বারবধূ কতো রকমের পাখী সংগ্রহ করেছে—যেন স্বর্গের নন্দনবন সাজিয়েছে[১]।

১। সপ্তমে প্রকোষ্ঠে সংশ্লিষ্টাবিহঙ্গবাটী-সুখনিষণ্ণানি অন্যোন্য-চুম্বন-পরাণি সুখমনুভবন্তি পারাবতমিথুনানি। দধিভক্তপূরিতোদরঃ ব্রাহ্মণ ইব সূক্তং পঠতি পঞ্জরশুকঃ। ইয়মপরা সম্মাননা লব্ধপ্রসরা ইব গৃহদাসী অধিকং কুরুকুরায়তে মদন-সারিকা। অনেকফলরসাস্বাদপ্রহৃষ্টকণ্ঠা কুম্ভদাসীব কূজতি পরপুষ্টা। আলম্বিতা নাগদন্তেষু পঞ্জরপরম্পরাঃ। যোধ্যন্তে লাবকাঃ। আলাপ্যন্তে কপিঞ্জলাঃ। প্রেষ্যন্তে পঞ্জরকপোতাঃ। ইতস্ততো বিবিধমণি-চিত্রিত ইবায়ং সহর্ষং নৃত্যন্তি অবিকিরণসন্তপ্তং পক্ষোৎক্ষেপৈঃ বিধুবতীব প্রাসাদং গৃহময়ূরাঃ। ইহ পিণ্ডীকৃতা ইব চন্দ্রপাদাঃ পদগতিং শিক্ষমাণানীব কামিনীনাং পশ্চাৎ পরিভ্রমন্তি রাজহংসমিথুনানি। এতে অপরে বৃদ্ধমহল্লকা ইব ইতস্ততঃ সঞ্চরন্তি গৃহসারসাঃ। আশ্চর্যং ভোঃ! প্রসারণং কৃতং গণিকায়াঃ নানাপক্ষিসমূহৈঃ, যৎ সত্যং খলু নন্দনবনমিব মে গণিকাগৃহং প্রতিভাসতে।

নারী ঃ রূপসী ও বিরহিণী

রাবণের দৃষ্টিপথে সীতা

[বাল্মীকি রামায়ণে অরণ্যকাণ্ড]

দণ্ডকারণ্যে কুটিব নির্মাণ ক'বে বসবাস করছেন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা। একদিন রাবণের পরামর্শে স্বর্ণমৃগের রূপ ধ'রে ছলনা করতে এল মারীচ। সীতার প্রার্থনা পূরণ করতে রাম ছুটলেন মায়ামৃগেব পাশ্চাতে ; কপট রাক্ষসের ছলনায় লক্ষ্মণও বহুদূরে নীত হলেন। এই সুযোগে দুবাত্মা রাবণ দূর থেকে দেখলেন সীতাকে—যেমন গাঢ অন্ধকার চন্দ্রসূর্যহীনা সন্ধ্যাকে দেখে। তারপব তৃণাচ্ছাদিত কূপেব মতো কুটিলমতি দশানন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর বেশে আচ্ছাদিত হ'য়ে ধীর পদক্ষেপে কুটীবেব অভিমুখে এলেন, দেখলেন রাজকুলবধূ সীতার অনিন্দনীয় রূপ ঃ

পর্ণশালায় বিরাজিতা বাষ্পশোকপরিপ্লুতা সীতা,
পূর্ণ চন্দ্রের মতো আনন, সরস অধর, রুচিব দশন ;
দুঃখার্তা জানকী যেন চন্দ্রহীনা তামসী রজনী।
বৈদেহীর যে যে অঙ্গে দৃষ্টি পড়ে তাব—
সেখানেই মগ্ন হ'য়ে থাকে নয়ন ও মন,
পীতকৌষেয় বাস, বিকচ কমলদলসম আঁখি।

তখন দুষ্টচেতা নিশাচর আবও কাছে এগিয়ে এলেন ; বেদমন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে কামান্ধ রাক্ষস নির্জনে সীতাকে বললেন ঃ

ওগো সুগাত্রী ! কাঞ্চনপ্রতিমার তুল্য তোমার তনু,
ত্রিলোকের অনুপমা তুমি—যেন কমলহীনা কমলা[১]।

১। স তাং রুচিরদন্তৌষ্ঠীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাং
আসীনাং পর্ণশালায়াং বাষ্পশোকপরিপ্লুতাম্।
রামলক্ষ্মণহীনাং তাং চিন্তাশোকপরায়ণাম্
রজসা মহতাচ্ছন্নামচন্দ্রাং রজনীমিব।

ওগো শুচিস্মিতা চারুবদনা সুনয়না বিলাসিনী,
ওগো ভীরু ! তুমি যেন আজ কুসুমিতা বনানী ;
সুবৃত্ত-সংহত-সুচারু তোমার পীন পয়োধর,
উরসে মণি-মুক্তা আর সুবর্ণের মণ্ডন ;
পীতকৌষেয়বসনা স্বর্ণবরণী কে তুমি সুন্দরী ?
শোভনা ! তুমি কি মূর্তিমতী লজ্জা, কীর্ত্তি, শ্রী, লক্ষ্মী ?
কামচারিণী বিভূতি, নাকি কামপ্রিয়া রতি ?
শুভ্র-সম-সুচারু দশনে পক্ক দাড়িম্বের কান্তি,
সুস্থিত-রম্য ভ্রূলতায় ভূষিত মুখমণ্ডল,
সুঠাম-সরস পেলব সুন্দর অধর,[১]

দদর্শ যদ্ যদ্ বৈদেহ্যা গাত্রং চক্ষুর্মনোহরম্
ন শশাক ততো হর্তুং দৃশং মগ্নামিবাবশঃ।
ফুল্লপদ্মবিশালাক্ষীং পীতকৌষেয়বাসিনীম্।
তামুবাচ কামার্তো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ
বিভ্রাজমানাং বপুষা কাঞ্চনীং প্রতিমামিব।
অনুত্তমাং ত্রিলোকেষু পদ্মহীনামিব শ্রিয়ম্।

১। চারুস্মিতে চারুমুখি চারুনেত্রে বিলাসিনি
অতীব ভ্রাজসে ভীরু বনরাজীব পুষ্পিতা।
মণিপ্রবেকাভরণৌ রুচিরৌ তে পয়োধরৌ
মুক্তাহেমচিতৌ পীনৌ রত্নজুষ্টৌ মনোহরৌ।
হৃদ্যাবপ্যচিতৌ বৃত্তৌ সংহতৌ তে বিরাজতঃ
কা ত্বং কাঞ্চনগর্ভাভে পীতকৌষেয়বাসিনী,
মালাং পদ্মোৎপলযুতাং বিভ্রতী প্রিয়দর্শনা
হ্রীঃ কীর্তিঃ শ্রীঃ শুভা লক্ষ্মীরাসাং কা ত্বং বরাননে ?
ভূতির্বা ত্বং বরারোহে রতির্বা স্বৈরচারিণী ?
সমাঃ শিখরিণঃ স্নিগ্ধাঃ পাণ্ডবা দশনাস্তব
সুসংস্থিতে চ কান্তে চ ভ্রূবৌ বদনভূষণে।

তপ্ত কাঞ্চনের মতো ঢলঢল অনুপম লাবণি,
সুপ্রমাণ-সমুন্নত সুবিন্যস্ত কর্ণে কাঞ্চন কুণ্ডল,
ওগো সুশ্রোণী ! তোমার করপদ্মে অতুল লালিমা,
রোমরাজীর সরলরেখায় দ্বিধাভক্ত জঘন,
করিকরের তুল্য বর্তুল ক্রমশ ক্ষীণ গুরু উরু,
কবে সুকুমার অঙ্গুলী, দিব্য শোভন তলদেশ,
পদ্মকোষসদৃশ মসৃণ কোমল চরণের রমণীয় বিন্যাস,
রক্তিমপ্রান্ত আকর্ণ নয়নে ঘনকৃষ্ণ তারা,
সুচারু কেশ আর মুষ্টিগ্রাহ্য ক্ষীণ কটি[১]।

নিদ্রিতা রাজকুমারী অম্বালিকা

[দশকুমারচরিত, দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস]

রাজবাহন দেখলেন নিদ্রামগ্না রাজকুমারী অম্বালিকাকে,
দক্ষিণ চরণের সুন্দর তলদেশের উপর ভর রেখে
বাম চরণের মনোহরণ পাতাখানি পড়ে রয়েছে।

১। সুপ্রভৌ সুকুমারৌ চানুরূপৌ সুসংস্থিতৌ
সুপীনৌ দর্শনীয়ৌ সংহতৌ চ বরাননে
অনুরূপৌ চ বক্ত্রস্য কপোলৌ তব সুন্দরি
তপ্তকাঞ্চনসংবীতৌ স্বভাবাৎ সংস্কৃতৌ শুভৌ।
অনুরূপঞ্চ তে মধ্যং দুর্বলং চারুহাসিনি
রোমরাজ্যা বিভক্তঞ্চ দ্বিধেব তব সুন্দরি।
বিশালং জঘনং পীনমূরূ গজকরোপমৌ
সুকুমারাঙ্গুলী দিব্যৌ সুকুমারতলৌ শুভৌ।
চরণৌ সংহতাবেতৌ পরস্পরবিভূষণৌ
সঞ্চাররম্যৌ চ শুভৌ পদ্মকোষসমপ্রভৌ।
বিশালে বিমলে নেত্রে রক্তান্তে নীলতারকে
করসংরতমধ্যাসি সুকেশী সংহতস্তনী।

ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছে তো একজোড়া তুলতুলে গোছ।
দুটি জঙ্ঘা—পরস্পরকে তারা জড়িয়ে,
দুটি জানু—কোমল অল্পকুঞ্চিত তাদের রেখা,
দুটি ঊরু—একটু লতানো,
নিতম্বের উপর স্রস্ত মুক্ত একখানি ভুজলতার লালিত্য,
অন্য বাহুখানি কুঞ্চিত হ'য়ে উত্তানিত করপল্লবের মধ্যে
ধ'রে রয়েছে সুন্দর শিরোভাগ ;
লীলাভরে এলিয়ে পড়েছে গ্রীবা,
গ্রীবার হেমসূত্রে পদ্মপরাগমণির একখানি ধুকধুকি জ্বলছে,
শ্রোণীমণ্ডলের রেখাটি যেন একটু বাঁকানো,
চীনাংশুকের অধোবাস নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন ক'রে রয়েছে দেহটিকে,[১]
মৃদু নিঃশ্বাসে ধীরে ধীরে কাঁপছে স্তনমুকুলের কাঠিন্য।
একটি কান চাপা, অর্ধেক দেখা যাচ্ছে কুণ্ডল,
অন্য কানটি স্পষ্ট, উপরে ভাসা,
কুণ্ডলের রত্নকর্ণিকা থেকে ভাঙাভাঙা চুলগুলির উপব
ছড়িয়ে পড়েছে কিরণের হলুদ রঙের রেণু।
মুখের ভিতরখানি টুকটুকে লাল ;
ওপাশের গালের নীচে হাতখানির মায়া,—
কানপাশার যেন নবকল্পনা ;
আর উপরগালের আয়নাটিতে ছায়া পড়েছে বিতানের ফুলকারীব
ফুটফুটে নতুন ফোটা যেন তিল ;
ঘুমভরা নয়নে নীল পদ্মের মুদিত মহিমা ;

১। কুসুমলবচ্ছুরিতপর্যন্তে পর্যঙ্কতলে দক্ষিণপাদপার্শ্ব্যধোভাগা নুবলিতেতরচরণাগ্রপৃষ্ঠম্, ঈষদ্‌বিবৃতগুল্‌ফসন্ধি, পরস্পরাশ্লিষ্টজঙ্ঘাকাণ্ডম্, আকুঞ্চিতকোমলোভয়জানু, কিঞ্চিদ্বেল্লিতোরুদণ্ডযুগলম্, অধিনিতম্বস্রস্ত-মুক্তৈকভুজলতাগ্রপেশলম্, অপাশ্রয়ান্ত-নিমিত্তাকুঞ্চিতেতরভুজলতোত্তানতল-করকিসলয়ম্, আভুগ্নশ্রোণিমণ্ডলম্ অতিশ্লিষ্টচীনাংশুকান্তরীয়ম্।

নিশ্চল ভুরুর বিজয়পতাকাটি কাঁপছে না ;
শিথিল হ'য়ে পড়েছে চন্দনের তিলকখানি শ্রমজলের পুলকে,
মুখের উপর হালকা হাওয়ায় ধীরে ধীরে দুলছে অলকের লতিকা।
শয্যার একপাশ চেপে শুয়ে রয়েছেন রাজনন্দিনী অম্বালিকা,
বিস্রব্ধসুপ্তা—শরতের শুভ্র মেঘে সৌদামিনীর এক স্বপ্ন।

গন্ধর্বরাজতনয়া কুমারী কাদম্বরী

[কাদম্বরী। রচয়িতা বাণভট্ট]

সখী মহাশ্বেতার অনুরোধে নায়ক চন্দ্রাপীড় তার সঙ্গে হেমকূটপর্বতে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের কন্যান্তঃপুরে আগমন করলেন। সেখানে অনুপমা সুন্দরীদের সমাবেশ। কুমারীপুরীতে তরুণীদের মুখশোভায় যেন জ্যোৎস্নার বর্ষাধারা ; কটাক্ষে নীলোৎপলবনের সমারোহ ; ভ্রূবিলাসে অনঙ্গধনুর ঘূর্ণন ; কৃষ্ণ কুন্তলের অন্ধকারে কৃষ্ণপক্ষের প্রদোষ ; হাসির ঝর্ণাধারায় বসন্তদিনের কুসুমসৌন্দর্য ; নিঃশ্বাসবায়ুর সৌরভে মলয়-মারুতের সুগন্ধ ; কপোলের আভায় সহস্র মণিদর্পণ ; করতলের রক্তিমায় অগণিত রক্তপদ্মের লাবণ্য, যৌবনবিকারে সহস্র কামদেবের পুনর্জন্ম।

সেই সুন্দরীদের গালের লালিমাই তাদের মুখপ্রক্ষালনের জল ; চোখদুটিই কর্ণোৎপল ; হাসির শোভাই অঙ্গরাগ, নিঃশ্বাসবায়ু প্রসাধনগন্ধ ; অধরের দ্যুতিই কুঙ্কুম ; আলাপই বীণার ঝংকার ; ভুজলতাই চাঁপার মালা ; করতলই লীলাকমল, স্তনই দর্পণ, অঙ্গের লাবণ্যই বস্ত্রের আবরণ, জঘনমণ্ডল লীলা বিলাসের মণিশীলা ; মনোহারী অঙ্গুলির রক্তিমাই চরণের অলক্তক[১]।

১। যত্র চ কন্যকাজনস্য কপোলতলালোক এক মুখপ্রক্ষালনম্, লোচনানি এব কর্ণোৎপলানি, হসিতচ্ছবয় এব অঙ্গরাগঃ, নিঃশ্বাসা এব অধিবাসগন্ধপ্রযুক্তয়ঃ, অধরদ্যুতিরেব কুঙ্কুমানুলেপনম্, আলাপা এব তন্ত্রী-নিনাদাঃ, ভুজলতা এব চম্পকমালাঃ, করতলানি এব লীলাকমলানি, স্তনা

প্রাসাদের অন্তঃপুরে শ্রীমণ্ডিত বিলাসগৃহ ; তার মধ্যদেশে অনতি-বৃহৎ পালঙ্ক। সেখানে উপবিষ্টা রাজনন্দিনী কুমারী কাদম্বরী ঃ

শুভ্র উপাধানে বঙ্কিমভাবে ন্যস্ত তার বাম বাহুলতা,
দুই পাশে চামরধারিণীদের লীলায়িত চামর-আন্দোলন,
মণিময় ভিত্তিতে উদ্‌ভাসিত সেই প্রতিবিম্ব ;
গৃহভিত্তির দর্পণগুলিও যেন তার রূপপিপাসায় উৎসুক,
যেমনি বেজে ওঠে রাজকুমারীর অলঙ্কার-শিঞ্জন,
নাচ শুরু করে গৃহ-ময়ূরের দল।
অনিন্দ্য সুন্দরীর অপরূপ লাবণ্যে—
চোখের পলকহারা গৃহ-পরিজন ;
দেহশ্রীর সর্ব শুভ লক্ষণ সন্নদ্ধ তার অঙ্গে।
কাদম্বরীর কৈশোরের ঈষৎ পুণ্যফল সমাপ্ত হ'লে
যৌবনের সমারোহে তনুতে জেগেছে জোয়ার—
তারুণ্যের এক অমূল্য নিধি।
রক্তিম চরণকমলে অনুপম লাবণ্য—
যেন প্রবালমণির আলোকধারায় স্রোতের প্রবাহ ;
আলতায় রাঙানো যুগল চরণ,
প্রতি অঙ্গুলীতে এক একটি রক্তবর্ণ মণি—
যেন লাবণ্যবারির রক্তিম ধারা ;
বিশাল নিতম্বের ভারে ক্লান্ত দুটি উরু,
পাদপদ্মে মণিময় নূপুর,
নূপুরের কিরণরাজি ছলনায় স্পর্শ করছে জঘন।
কাদম্বরী বিধাতার হাতে এক শিল্পসৃষ্টি,
নির্মাণকালে স্রষ্টা দৃঢ়ভাবে নিপীড়ন করেছিলেন কটিদেশ,
তাই গড়িয়ে পড়েছিল লাবণ্যের একটি ধারা,

এব দর্পণাঃ, নিজদেহপ্রভা এব অংশুকাবগুণ্ঠনম্, জঘনস্থলানি এব বিলাসমণি-শিলাতলানি, কোমলাঙ্গুলিরেব চরণালক্তকরাগঃ।

বিপুল জঘনের আঘাতে সে ধারা হোল দ্বিধাভগ্ন—
সেই দুই স্রোতের পরিণতি দুটি রমণীয় উরু।
অনিন্দনীয় জঘনে সুবর্ণমেখলা,
গুরু নিতম্বে রত্নালোকের আবরণ—
যেন পরপুরুষের দৃষ্টি নিবারণের ছলনা ;
রশনাকলাপে নিতম্বের গরিমাই গৌরব পেয়েছে,
আর জেগেছে স্পর্শসুখের রোমাঞ্চ !
নিখিল প্রেমিকের চিত্ত আশ্রয় করেছে তার জঘন,
তাই সে অতি গুরুভার,
কাদম্বরীর কটিদেশের সাধ জেগেছিল মুখদর্শনে,
কিন্তু উন্নত স্তনের উচ্চতায় সে পেল বাধা,
তারই দুঃখে কটি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর।
সুনিম্ন নাভিমণ্ডল—নদীর স্রোতে এক গভীর আবর্ত ;
বিধাতার অঙ্গুলিভারে যেন তার সৃষ্টি ,
কৃষ্ণ রোমরাজিতে রেখায়িত মহনীয় কীর্তি—
সে কি অনঙ্গ দেবতার ত্রিভুবনবিজয় বার্তা !
সুঠাম কণ্ঠে মণিময় হার,
তারই কিরণচ্ছটায় উদ্‌ভাসিত চিবুক—
যেন আলোর হাত দিয়ে ধরেছে স্তনভারে ম্লান মুখখানি।
সরস-রক্তিম যুগল ওষ্ঠ—
যেন নব যৌবনের ঢেউ লেগে অনুরাগ-সাগরে যুগল তরঙ্গ ;
রক্তিম আভায় তুলতুলে দুটি গাল—
যেন মদে পূর্ণ দুটি ঝিনুক[১]।

১। নিপতিত-সকললোকভরেণ ইব অতিগুরুনিতম্বাম, উন্নতকুচান্তরিত-মুখদর্শনদুঃখেন ইব ক্ষীয়মাণমধ্যভাগাম্, প্রজাপতেঃ স্পৃশতঃ সৌকুমার্যাৎ অঙ্গুলিমুদ্রামিব নিমগ্নাং নাভিমণ্ডলীম্ আবর্তিনীম্ উদ্‌বহন্তীম্, ত্রিভুবন-জয়প্রশস্তিবর্ণাবলীমিব লিখিতাং মন্মথেন রোমরাজিমঞ্জরীং বিভ্রাণাম্,

আকর্ণবিস্তৃত রক্তিমপ্রান্ত নয়ন,
নাসিকা—কামের প্রিয়তমা রতির বীণাযন্ত্রের ছড়,
দুটি ভ্রূ—মদমত্ত হস্তীর মদবারির ধারা,
কপালের তিলক—কামদেবের দ্বিতীয় হৃদয় ;
মুখমণ্ডলে তরল মনঃশিলার প্রসাধন,
কর্ণে পত্র ও মকরের আকৃতি মণিকুণ্ডল,
সীমন্তে একখণ্ড উজ্জ্বল রত্ন।

রাজনন্দিনী উদয়নসুন্দরী

[উদয়নসুন্দরীকথা। লেখক—সোড্‌ঢল]

রাজপ্রাসাদে কন্যান্তঃপুরের স্বামিনী রম্যদর্শনা তরুণী উদয়নসুন্দরী।
সুললিত অঙ্গুলীতে সাজানো তার চরণযুগ—
যেন লাবণ্যজলের সরোবরে সাঁতার কেটে ক্লান্ত তারা ;
কেতকী-কুড্‌মলের মতো শুভ্র বর্তুল দুটি জঙ্ঘা—
যেন কামদেবের সুবর্ণ প্রহরণ ;
পীন উরুতে শোভমান যুগল নিতম্ব—
যেন অনঙ্গের রণ-রথ ;
মণিপট্টিকার বলয়ে ঘেরা স্বর্ণমেখলার গরিমায় রমণীয় সে নিতম্ব
—যেন মদনরাজার সুরক্ষিত গিরিদুর্গ।
শূন্যের মতো সুগোল সুন্দর নাভিবিম্ব—বিধাতার অনুপম সৃষ্টি।
নাভিনিম্নে রোমরাজির ক্ষীণ সরলরেখা—
যেন ধনুর্বিদ কাম অহংকারবশে নিক্ষেপ করেছেন এক লৌহশলাকা,[১]

স্তনভারাবনম্যমানম্ আননম্ ইব উন্নয়তা হারেণ উচ্চৈঃ গৃহীতচিবুকদেশাম্, অভিনবযৌবনপবনক্ষোভিতস্য রসসাগরস্য তরঙ্গাভ্যামিব উদ্গতাভ্যাম বিদ্রুমলতালোহিতাভ্যাম্ অধরাভ্যাম্, রক্তাবদাতস্বচ্ছকান্তিনা চ মদিরারস-পূর্ণ-মাণিক্য-শুক্তিসংপুটচ্ছবিনা কপোলযুগলেন······

১। লাবণ্যজলস্তরাৎ উত্তীর্য্য শৈশবেন তটে ন্যস্তম্ উড়ুপদণ্ডিকাতল্লকমিব

মনোহরণ করে তার লাবণ্যললিত ত্রিবলী,
বিধাতা চেয়েছিলেন কটিদেশকে ক্ষীণ করতে,
তাই তার উদর থেকে তিনবার মাংসের উপাদান সরিয়ে দিয়েছেন,
এইভাবে সৃষ্টি হোল প্রজাপতির শিল্পপ্রতিমা তিলোত্তমার ত্রিবলী ;
আপীন-বর্তুল স্তনযুগলে সফল হোল সংসার—
যেন মদন আর রতি দুটি সোনার পেয়ালায় মদ পান ক'রে
উপুড় ক'রে নামিয়ে রেখেছেন পাশাপাশি।
শঙ্খের শুভ্রতাকেও হার মানিয়েছে হাসিচ্ছটার মতো শ্বেত হার।
বাঁধুলী ফুলের মতো কামনার অনুরাগ-জাগানো সরস বিম্বাধর ;
নয়নের রক্তিমাভায় শুভ্র ক্ষৌমবাসের মতো পাণ্ডুর কপোল,
—যেন মুখশ্রীর নেপথ্য রচনা ;
মনোরম দুই কর্ণে মণিকনকের অবতংস ;
ভালোবাসার আবেশ জড়ানো অতুলনীয় নাসিকা—
যেন রতিদেবীর মণিময় বিলাস দর্পণের আধার-দণ্ড ;
দীঘল চোখ—অমৃতের দুটি দীঘি ;
যুবতীসৃষ্টির সার যুগল ভ্রুলতা—অদ্বিতীয়া রতির নয়ন-মাধুরী,
বর্তুল তিলকে অনিন্দ্য ভালস্থলী—যৌবন-অশ্বারোহের বহির্দেশ ;
কানের পাশে একগুচ্ছ অযত্নসঞ্চিত অলক—ত্রিলোক মুগ্ধ ;
কপালে-খসে-পড়া চুলে সীমন্তমণির একটি দীপ্র মুক্তা।

সুললিতাঙ্গুলীসঞ্চয়মুদ্বহতা চরণয়োঃ দ্বয়েন বিরাজমানা, পুষ্পায়ুধেন প্রহরণী-কৃতাভ্যাং কনককেতকিসূতিভ্যাম্ ইব যথোত্তরম্ আকারবৃত্তাভ্যাং জঙ্ঘাভ্যাম্ উদ্‌ভাসমানা, ক্ষণকিঙ্কিণী-গণোপশোভিনো মনোভবস্যন্দনস্য নিতম্বস্য যুগেনেব পীনোরুযুগলকেন ভ্রাজমানা, মেখলোপরি জনিতমণিপট্টিকাবলয়-প্রাকারম্ অনঙ্গভুভুজো গিরিদুর্গমিব গরিমরম্যং নিতম্বম্ উদবহন্তী, নিয়তম্ ইতঃপরতো ভব্যং নাস্তীতি বিধিনা প্রদত্তং শূন্যম্ ইব সুবৃত্তসুন্দরং নাভিবিম্বম্ আবিভ্রতী, জগদেকধন্বিনা মনসিজেন ধনুর্বিদ্যাপলেপাৎ উৎক্ষিপ্তং সূচীনারাচমিব প্রতনুসরলং রোমাবলীদণ্ডম্ আদধানা।

যেন সাঁঝের আকাশে অরুন্ধতী নক্ষত্র।
সুবর্ণদলে মণিমাণিক্যের আলোক-চূর্ণ দিয়ে তাব অঙ্গ-লাবণ্য ;
মুক্তার অন্তঃসার জলে দেহস্নান ;
শারদ কৌমুদীতে উদ্‌ভাসিত তনুশ্রী।
উদয়নসুন্দরী স্বপনচারিণীর মতো প্রথম দর্শনেই হৃদয় উন্মাদিনী,
দৃষ্টি ফলকের সঞ্চারিণী লতা,
প্রণয় আনন্দের ফল পরিণতি,
আনন্দচর্বণার রসবৃত্তি,
সংসার সুখের আস্বাদ উপলব্ধি[১]।
তার নিশ্বাসবায়ুর সুগন্ধে ভ্রমরদল ছুটে আসে—
যেন মুখচন্দ্রে কলঙ্কের নব কল্পনা ;
সুললিত আলাপে দন্তরাজির শোভা বিচ্ছুরিত—
যেন সন্ধ্যাতপে তারারা ফুটে উঠছে ;
বঙ্কিম কটাক্ষ বুঝি দ্বিতীয়ার চাঁদ—
তাই কর্ণকুবলয়ের অন্ধকার অপসৃত,
শুভ্র হাসির ছটায় আবৃত কুচ পর্বতের সমুন্নত শিখর।

প্রণয়মুগ্ধা বাসবদত্তা

[সুবন্ধ-রচিত বাসবদত্তা]

বাসবদত্তা কন্দর্পকেতুর বিরহে বিধুরা ; তার প্রেমসন্তাপ যেন তুষের আগুন ; দাবাগ্নি-শিখার মতো প্রণয় গ্রাস করেছে তার সাত্বিক সত্তা ; রাজকুমারী আজ যেন বসন্তের কুসুমসায়কের বেদনায় আচ্ছন্ন, মহাদেবরূপী মলয়-মারুতের অঙ্গদহনে ক্লিষ্ট ; কামমোহের অন্ধকারে পাতাল-গুহায় প্রবিষ্ট। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিকল।

১। স্বপ্নাঙ্গনা ইব উন্মদয়িত্রী হৃদয়স্য, লতা ইব লোচনালোকফলকস্য, ফলপরিণতিরিব শৃঙ্গাররসস্য, রসবৃত্তিরিব সম্মদাস্বাদস্য, স্বাদোপলব্ধিঃ ইব সংসারসুখস্য,…।

কন্দর্পকেতুকে দর্শনের পর বাসবদত্তার হৃদয়ে সে আঁকা হ'য়ে আছে, খোদিত হ'য়ে গেছে, খচিত হ'য়ে আছে, গাঁথা হ'য়ে গেছে। সে যেন লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা, বজ্রলেপ দিয়ে যুক্ত। প্রণয়ী তরুণ যেন তার অস্থিপঞ্জরে প্রবেশ করেছে ; মর্মের মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছে ; মজ্জার সঙ্গে মিশে গেছে ; প্রাণবায়ুতে ছড়িয়ে আছে ; অন্তরাত্মায় প্রবেশ কবেছে ; রক্তের কোষে দ্রবীভূত হ'য়ে আছে : মাংসের সঙ্গে এক হ'য়ে গেছে[১]।

বাসবদত্তাও তখন স্বয়ং যেন উন্মত্ত, অন্ধ, বধির, মূক, সংজ্ঞাহীন ; তার সব ইন্দ্রিয় নিশ্চল, মূর্ছাগ্রস্ত। তাকে যেন ভূতে পেয়েছে ; যৌবন সাগরের তরল তরঙ্গ তাকে বেষ্টন ক'রে আছে ; অনুরাগের রজ্জুতে বাঁধা পড়ে আছে। সে যেন অনঙ্গ-দেবতার ফুলবাণে নিখাতিত, যৌবন-রসের ভাবনায় বিহ্বল ; অমূর্ত সৌন্দর্য তাকে বাণের মতো বিদ্ধ করছে ; দক্ষিণ সমীরণ তার জীবন সংশয়িত ক'রে তুলেছে[২]।

প্রেমমুগ্ধা বাসবদত্তা তখন সখীদের উদ্দেশে বলতে লাগল অসংবদ্ধ অনেক কথা : হায়! ওলো প্রিয়সখী অনঙ্গলেখা, আমার বুকে রাখ তোর পদ্মকোমল হাত, আর তো সইতে পারি না বিরহের দুঃখজ্বালা ওলো মুগ্ধা মদনমঞ্জরী, ছিটিয়ে দে অঙ্গে চন্দনের জল ; সবলা বসন্ত-সেনা, বেঁধে দে কেশপাশ ; ওগো তরলা তরঙ্গবতী, ছড়িয়ে দে সর্বাঙ্গে

১। হৃদয়ে বিলিখিতমিব, উৎকীর্ণমিব, প্রত্যুপ্তমিব ; কীলিতমিব, নিগলিতমিব, বজ্রলেপঘটিতমিব, অস্থিপঞ্জরপ্রবিষ্টমিব, মর্মান্তরস্থিতমিব, মজ্জারসশবলিতমিব, প্রাণপরিতমিব, অন্তরাত্মানম্ অধিষ্ঠিতমিব, রুধিরাশয়ে দ্রবীভূতমিব, পললসংবিভক্তমিব কন্দর্পকেতুং মন্যমানা···।

২। উন্মত্তেব, অন্ধেব, বধিরেব, মূকেব, শূন্যেব, নিরস্তেন্দ্রিয়গ্রামেব, মূর্চ্ছাগৃহীতেব, গ্রহগ্রস্তেব, যৌবনসাগর-তরলতরঙ্গ-পরম্পরা-পরিগতেব, কন্দর্পকুসুমবাণৈঃ কীলিতেব, রাগরজ্জুভিঃ পরিবারিতেব, শৃঙ্গারবাসনাবিষয়-ঘূর্ণিতেব, রূপপরিভাবনা-শল্য-কীলিতেব, মলয়ানিলাপহৃত-জীবিতেব···

কেতকীর রেণু ; সুন্দরী মদনমালিনী, শৈবাল-কলাপ দিয়ে গড়ে দে বলয় ; চপলা চিত্রলেখা, চিত্তপটে এঁকে দে তার ছবি—যে আমার চিত্তচোর ; ওলো ভামিনী বিলাসবতী, অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে দে মুক্তা-চূর্ণ ; রাগিনী রাগলেখা, পদ্মপাতায় ঢেকে দে বুক ; আলগোছে মুছিয়ে দে চোখের জল , ওলো যূথিকা বেশ তো সেজেছিস যূথিকা-কুসুমে, এবার শীতল বায়ু ছড়িয়ে দে পদ্মপাতার পাখায়। ওগো নিদ্রা-দেবী, এসো, অনুগ্রহ কর আমায়[১]। আমার সব ইন্দ্রিয়কেই ধিক্। বিধাতা কেন এই দুটি নয়নের মতো সর্বাঙ্গে নয়ন নির্মাণ করলেন না ? তা হ'লে তো আশমিটিয়ে দেখতাম আমার স্বপন-চারীকে ! ওগো ভগবান অনঙ্গ, এই তোমার অঞ্জলি ; অনুরক্ত আমায় কৃপা কর। ওগো প্রেম-মহোৎসবের দীক্ষাগুরু মলয়বায়ু, তুমি স্বেচ্ছায় বহে যাও ; প্রেমের দহনে আমি তো পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছি।

বিরহিণী যক্ষপ্রিয়া

[মেঘদূত, উত্তরমেঘ]

কবি কালিদাসের অমর প্রেমকাব্য মেঘদূত। শুধু বিরহবিচ্ছেদকে অবলম্বন ক'রে লেখা সংস্কৃত সাহিত্যে এই প্রথম প্রণয়কাব্য। প্রভু-শাপে নির্বাসিত প্রিয়াবিরহী যক্ষ রামগিরির বিজন আশ্রমে আষাঢ়ের

১। হা প্রিয়ে সখি অনঙ্গলেখে, বিতর হৃদয়ে মে পাণিপদ্মম্, দুঃসহো বিরহসন্তাপঃ। মুগ্ধে মদনমঞ্জরি, সিঞ্চ অঙ্গানি চন্দনবারিণা। সবলে বসন্তসেনে, সংবৃণু কেশপাশম্। তরলে তরঙ্গবতি, বিকির অঙ্গেষু কৈতকধূলিম্। বামে মদনমালিনি, কলয় বলয়ং শৈবালকলাপেন। চপলে চিত্রলেখে, চিত্তপটে বিলিখ চিত্তচৌরং জনম্। ভামিনি বিলাসবতি, বিক্ষিপ অবয়বেষু মুক্তাচূর্ণনিকরম্। রাগিণি রাগলেখে স্থগয় নলিনীদলনিচয়েন পয়োধরভারম্। সুকান্তে কান্তিমতি, মন্দং মন্দমুপনয় বাষ্পবিন্দুন্। যূথিকালংকৃতে যূথিকে, সঞ্চারয় নলিনীদলতালবৃন্তেন আর্দ্রবাতম্। এহি ভগবতি নিদ্রে, অনুগৃহাণ মাম।

প্রথম দিনে নববর্ষার নবীন মেঘকে দেখে অলকার রম্য নিকেতনে প্রোষিতপতিকা প্রিয়তমার কাছে কুশলবার্তা জানিয়ে দূত ক'রে পাঠালেন। যাত্রাপথে প্রেমিকের বার্তাবাহী মেঘ নগ-নদী-নগরী দেখতে দেখতে, প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে 'কামনার মোক্ষ ধাম অলকার মাঝে' পৌছাবে আর সেখানে দেখতে পাবে বিরহিণী যক্ষ-প্রিয়তমাকে। তাই এই বিরহব্যথার মাঝেও দয়িত-দয়িতার অন্তরে মিলনের সুর বেজে উঠেছে।

একুশ

বর্ণ জিনি স্বর্ণ চাঁপা,
তন্বী তনু কোমল কায়,
রক্ত রাঙা অধর যেন
নধর দুটি বিম্ব প্রায়।
তুষার ভূষা শিখর সম
শুভ্রতম দশনলোক,
শীর্ণ কটি, গভীর নাভি,
ত্রস্ত দুটি হরিণ চোখ।
শ্রোণীর চাপে অলস গতি
নিতম্বিনী চলতে নারে,
ঈষৎ যেন প'ড়েছে নু'য়ে
নিটোল দুটি স্তনের ভারে।
বিধির গড়া প্রথম নারী
সেই তরুণী সৃষ্টি মাঝে,
আমার তরে অশ্রু ঝরে
শূন্য ঘরে মলিন সাজে[১]।

১। তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহারণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।

বাইশ

সেইত আমার জীবন, সখা,
হৃদয় সাথী হারিয়ে দূরে
চক্রবাকীর তুল্য একা
বিকল বড় বিজন পুরে !
কয়না কথা অধিক কিছু,
নির্জনে সে কাটায় দিন ;
হয়ত দারুণ বিচ্ছেদে মোর
দেখবে তারে কান্তিহীন !
শীতের রাতে শিশির পাতে
নিষ্পেষিতা পদ্মসম
ছিন্ন মলিন রূপ ধরেছে,
দুঃখে দেহ শীর্ণতম ।

তেইশ

তপ্ত-ঘন দীঘল শ্বাসে
দাগ ধ'রেছে মলিন ঠোঁটে
নয়ন কোণে অহর্নিশি
অশ্রুকণার বন্যা ছোটে !
ইন্দু আনন আধেক ঢাকা
এলিয়ে পড়া নিবিড় চুলে,
ভাবছে ওগো একা ব'সে
হাত রেখে সে গণ্ডমূলে !
চন্দ্র যেমন ম্লান হ'য়ে যায়
প'ড়লে ঢাকা তোমাব জালে,
তেমনি প্রিয়ার ক্ষুণ্ণ আভা

শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥

আমার আঁখির অন্তরালে।

চব্বিশ

বিষাদময়ী সেই প্রতিমা
পড়বে যখন তোমার চোখে,
দেখবে তারে কাতর অতি
বিচ্ছেদের এই বিপুল শোকে ;
হয়ত' আমার কল্যাণে সে
পূজার্চনে ব্যস্ত প্রাতে,
কিম্বা আমার শীর্ণ এ রূপ
আঁকছে আপন কল্পনাতে।
হয়ত' কভু শুধায় ডেকে
তার সারিকায়—'পিঞ্জরিকা
তোর মনে আর তাঁর কথা কি
পড়ছে এখন ? হায়, বসিকা !
তুই যে ছিলি বড়ই প্রিয়
প্রাণেশ্বরের, বলনা সারি,
মোর কাছে সে ফিরবে কবে ?
আর যে আমি রইতে নারি[১]।'

পঁচিশ

হয়ত গিয়ে দেখব তারে
মোর বিরহে বড়ই দীনা,
বেশ-ভূষা তার ছিন্ন মলিন
কোলের পরে লুটায় বীণা ;

১। আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তী বা মধুরকবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ ভর্তুঃ স্মরসি রসিকে, ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ॥

আমার নামে গান বিরচি'
প্রাণ খুলে তার গাইতে সাধ,
অশ্রুধারা-স্পর্শে বীণার
তন্ত্রী ভিজে সাধছে বাদ !
শুধ্‌রে নিয়ে সে দোষ, ওগো
গাইতে গিয়ে বারংবার
আপন গীতি, আপনি ভোলে,
আত্মহারা চিত্ত তার[১] !

ছাব্বিশ

দেউড়ি পাশের ফুল টেনে সে
কক্ষতলে গুণ্‌ছে রাখি
নির্বাসনের দণ্ড আমার
শেষ হ'তে আব কদিন বাকী ?
কিম্বা আপন কল্পনাতে
ধ্যান করে সে মিলন-প্রীতি
স্মরণ করে দুঃখেব মাঝে
সঙ্গসুখের গোপন স্মৃতি,
এমন ক'রেই মানসলোকে
বিরহিণীব চিত্তলীন
মোর অভাবে কাতব অতি
কষ্টে সতী কাটায় দিন।

সাতাশ

দিবস জুড়ে তোমার সখী

১। উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকামা।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্
ভূয়ো ভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী ॥

নানান কাজে মগ্ন থাকে,
বিচ্ছেদেরই দুঃখ তেমন
করতে নারে কাতর তাকে,
কিন্তু, প্রিয়ার রাত্রে যখন
ফুরিয়ে আসে হাতের কাজ,
মোর অভাবের আঘাত যে তার
বক্ষে হানে কঠোর বাজ !
তাইত' তোমায় বলছি যেতে
প্রিয়ার বাতায়নের দ্বারে
শুনিয়ে আমার কুশল-বাণী
রাত্রে তুমি তুষবে তারে,
ঘুম নেই গো সজল চোখে
দেখবে গিয়ে নিশীথ রাতে
মোর বিরহে হৃদয় দহে
ধূলায় সতী শয্যা পাতে।

আটাশ

হয়ত' হেরিবে কৃশতনু প্রিয়া
বিরহ-শয়নে লীন,
পূবের আকাশে একপাশে যেন
চাঁদের কলাটি ক্ষীণ !
যে নিশি নিমেষে নিঃশেষ হ'তো
মিলন-স্বপন-তলে,
বিরহ-তপ্ত দীর্ঘ সে রাতি
যাপিতেছে আঁখি-জলে[১]।

১। আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।

ঊনত্রিশ

চাঁদেব আলো বাসতো ভালো
      চক্ষে সে যে স্বপ্ন আনে !
বক্ষে জাগে স্নেহের আবেশ
      দৃষ্টি মেলি যাহার পানে,
সেই শশধর বাতায়নেব
      সামনে এসে যখন হাসে,
চোখ ঢেকে সে মুখ ফিরে নেয়
      অশ্রু-জলে গণ্ড ভাসে !
সজল মেঘের কাজল ছায়ায়
      বাদল-বেলার আঁধাব মাঝে
আধ-ফোটা সে আধেক ঢাকা
      স্থল-কমলেব তুল্য বাজে !

ত্রিশ

রুক্ষ নেয়ে শুষ্ক কঠিন
      কেশ উড়ে তাব বিঁধছে মুখে
অবিশ্রান্ত সরিয়ে কাতর,
      ব্যাথাব আগুন জ্বলছে বুকে
ঝ’লসে দুটি কোমল অধব
      প’ড়ছে শুধু তপ্ত শ্বাস ;
স্বপ্ন মিলন-আকাঙ্ক্ষাতে
      অন্তরে তাব সুপ্তি আশ !
কিন্তু, সখা অশ্রুজলে
      যায় গো ভেসে তন্দ্রা তার
একলা জেগে কাটায় নিশি

নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্ধমিচ্ছাবতৈর্যা
তামেবোষ্ণৈ-র্বিরহমহতীমশ্রুভি-র্যাপয়ন্তীম্ ॥

ঘুমের পরশ পায় না আর !

একত্রিশ

সেই যে আমায় বিদায় দিয়ে
ছিন্ন ক'রে ফুলের মালা
একটি বেণী মাথার 'পরে
আপন হাতে বাঁধলে বালা,
দিন ফুরালে অভিশাপের
গৃহে আবার ফিরবো যবে
পণ ক'রেছে আমার হাতে
সেই বেণী সে খুলবে তবে !
যত্ন-বিহীন রুক্ষ কেশে
জট ধরেছে, লাগলে ছুঁলে
বিঁধছে বালার তুলতুলে গাল
কাঁটার মতো কঠিন চুলে ;
নখ বেড়েছে নাইক' খেয়াল
সেই আঙুলেই বারংবার
দেখবে গিয়ে সরায় সখী
গণ্ড হ'তে অলক তার ।

বত্রিশ

দূর ক'রে সে দুঃখে দারুণ
অঙ্গ-শোভন ভূষণ যত,
শয্যা 'পরে কোমল তনু
লুটিয়ে কাঁদে মর্মাহত !
অহর্নিশি সইছে জ্বালা
একলা বালা সঙ্গীহীনা,
দেখলে তারে তোমার বুকে
বাজবে দুঃখের বেদন-বীণা ।

ঝরবে তোমার নয়ন হ'তে
অশ্রু জলের নবীন ধারা,
দুঃখী দেখে দুঃখ পাবেই
সদয় হৃদয় মহৎ যারা[১]।

তেত্রিশ

তোমার সখীর মনের কোণের
গোপন কথা সব তো জানি,
আমার প্রতি নিবিড় প্রেমে,
পূর্ণ প্রিয়ার হৃদয়খানি ;
জীবনে এই প্রথম সে যে
বিরহ-তাপ সইছে বুকে !
তাই মনে হয় এই দশা তার
হ'তেই পারে গভীর দুঃখে,
পত্নী-প্রেমের গর্ব এ নয় ;
ব'কছিনি ভাই মনের ঝোঁকে,
সত্য কি না এখনি সব
দেখবে গিয়ে নিজের চোখে !

চৌত্রিশ

ঝামরে-পড়া-চামর চুলে
ঢেকেছে তার নয়ন-তারা,
কাজল-বিহীন সজল আঁখি
দুঃখে মলিন লক্ষ্যহারা !
মুক্ত-মদির অলস দিঠি

১। সা সংন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্‌-দুঃখদুঃখেন গাত্রম্‌।
ত্বামপ্যশ্রুং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং
প্রায়ঃ সর্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা॥

কটাক্ষ-বাণ আর না হানে,
তোমায় দেখে মৃগাক্ষী মোর
তুলবে আঁখি ঊর্দ্ধ পানে,
চপল মীনের চঞ্চলতায়
কমল-কলির কাঁপন হেন
ফুটবে তখন সেই নয়নে
চিত্ত-উতল চাউনি যেন[১]।

পঁয়ত্রিশ

আমার নখের লাঞ্ছনাহীন
তার মেখলার মৌক্তিক ডোর,
দুর্ভাগ্যের দুর্বিপাকে
বিবর্জিত বিচ্ছেদ মোর!
নর্ম-লীলায় শ্রান্ত প্রিয়ার
ক্লান্তিটুকু ক'রতে হত
আনন্দে তার চরণ সেবার
ভার নিয়েছি যত্নে কত;
শ্যাম-কদলীর তুল্য সখীর
গৌর সরস বামের ঊরু
সুসংবাদের সম্ভাবনায়
হয়ত' হবে কাঁপতে শুরু।

ছত্রিশ

দেখলে তারে সেথায় গিয়ে
মগ্ন সুখ-সুপ্তি মাঝে,

১। রুদ্ধাপাঙ্গ-প্রসরমলকৈ-রঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃত-ভ্রূবিলাসম্।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা
মীনক্ষোভাচ্চল-কুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি

ক্ষণেক তুমি অপেক্ষাতে
চুপটি ক'রে বসবে কাছে।
দৈবে যদি আমায় প্রিয়া
পেয়েই থাকে স্বপন-ঘোরে
যায় না যেন বাহুর বাঁধন
কণ্ঠ হ'তে হঠাৎ স'রে।

সাইত্রিশ

ভিজিয়ে তোমার জলের কণায়
স্নিগ্ধ কোরো পূবের হাওয়া,
যার পরশে সরস হ'য়ে
চায় মালতী প্রথম চাওয়া!
সেই বাতাসে বান্ধবীকে
ঝরকা হ'তে জাগিও ধীরে,
তোমার পানে মোর মানিনী
অবাক হ'য়ে চাইবে ফিরে!
আমার কথা মৃদুস্বরে
বলবে তাকে গুঞ্জরণে,
তড়িৎ যেন চম্‌কে
না ওঠে ভাই ক্ষণে ক্ষণে!

কাব্য ও কবি

রতিবিলাপ

[কুমারসম্ভব]

'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যে এবং পুরাণে কামদহনের উপাখ্যান সুপ্রসিদ্ধ। অত্যাচারী তারকাসুরকে নিধনের জন্য তপোনিষ্ঠ মহাদেবের সঙ্গে হিমালয়দুহিতা পার্বতীর মিলন অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইন্দ্রের অনুরোধে কামদেব ঋতুরাজ বসন্ত ও মলয়-মারুতকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয়ের গুহায় ধ্যানমগ্ন মহেশের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। অকালবসন্তের উদ্দীপনায় গিরিরাজের বনে-উপবনে প্রকৃতির চারু সমারোহ ফুটে উঠল। ধীরললিত চরণে পার্বতী অর্ঘ্যহাতে এগিয়ে এলেন; শান্ত-সংযত মহেশের চিত্ত ধৈর্য্যহারা হ'য়ে উঠল। বিক্ষুব্ধ মহাদেব মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েই দেখতে পেলেন কুসুমসায়ক দেবতাকে; ক্রোধে আরক্ত তাঁর তৃতীয় নেত্র থেকে জাত অগ্নিতে কাম তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হলেন। অনঙ্গের মৃত্যুসংবাদ দিগ্‌দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ল; স্বামীর এই অপমৃত্যুতে পতিব্রতা পত্নী রতির অন্তর হাহাকার ক'রে উঠল:

ভস্মভূষিত রতি
কাঁদিয়া আকুল;
কাম যদি মরিয়াছে,
রতি বা কেমনে বাঁচে?
ঘটিল এ অঘটন
বিধাতার ভুল।
কাম যদি গতপ্রাণ,
কে রাখে রতির মান?
কে আর সাজাবে তারে,
রাঙাবে চরণ?

কে তারে তুলিয়া বুকে
মিলন পুলক সুখে,
দোলায়ে জীবন দোলে,
ভোলাবে মরণ ?
আঁধিয়া বিজন রাতে,
বাদল ধরিয়া মাথে,
আর বা চলিবে পথে
কে সাহসিকা ?
আর না তরুর গায়ে
শীতল স্নেহের ছায়ে
জড়ায়ে উঠিবে
কোনো বনলতিকা।
কামহীন এ জগৎ
ঘুরে মৃত জড়বৎ,
বীণাপাণি বীণা হ'তে
ছিঁড়ে যায় তার।
ক্ষীণ প্রতিপৎশশী
ভাবিছে ডুবিতে বসি
—কালি হতে মিছে বহা
জোছনার ভার !
নাই যদি কাম নাই,
নাই তবে কামনাই,
কামিনী-নয়নে
নাই বিহ্বলতা
কুহুরবে নাহি আর
আবেদন বেদনার
নাই অলি-গুঞ্জনে

মিনতি ব্যথা।
কাম যদি নাহি রহে,
বঁধুও মধুর নহে,
মদিরাও হোল বুঝি
নদী-নীরবৎ।
ফুলে বৃথা রঙ জাগে,
চোখে নাহি ছোপ লাগে,
গন্ধ ভুলিয়া গেল
মর্মেরি পথ।
নাই আর মনসিজ,
চেতন ও চেতনা নিজ,
জড়ের জড়তা সম
বহে নিশিদিন।
কামে আজি হারাইয়ে
নিষ্কাম ধরণী এ
জনে জনে নির্জন
ক্ষ্যাপা উদাসীন।
দীপ হতে শিখাটিরে
ঝড়ে যদি নিল ছিঁড়ে,
আর কি কালো মুখে
ফিরে সে আলো?
কাম পুড়ে হোল ছাই,
রতি সেও হোক তাই,
সহমৃতা হবে
চিতাবহ্নি জ্বালো।

ব্যাধকন্যা চাঁপা ও উপকের সংলাপ

[থেরীগাথা]

বঙ্কহার দেশের নাল নামক ব্যাধপল্লীতে জনৈক ব্যাধের ঘরে চাঁপার জন্ম। চাঁপা যখন কিশোরী, এক আজীবক (সন্ন্যাসী) এলেন তাদের ঘরে। ব্যাধকন্যার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তিনি নানান ছলে সেখানেই দিন কাটাতে লাগলেন। কিশোরীহৃদয়ের উষ্ণ অনুরাগে চাঁপা তার কাছে ধরা দিল ; সন্ন্যাসীও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে মন সমর্পণ করলেন। ব্যাধের অনুমতিতে উভয়ের পরিণয় হোল। আজবীক এখন ঘোরতর সংসারী, দিন কাটে শিকারে আর আমোদ-আহ্লাদে। কিন্তু কিছুদিন পর কৃতকর্মের অনুশোচনায় তার মনে ধিক্কার জাগল ; ব্যাধ আজীবক আবার বুদ্ধের শরণাগত হলেন ; বুদ্ধের ধর্ম তার মন থেকে সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন ক'রে দিল। তিনি সংসার ত্যাগ ক'রে পুনরায় প্রব্রজ্যা নিতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু চাঁপা তার সন্তানকে অবলম্বন ক'রে স্বামীর সাথে সুখের নীড় বাঁধতে চায় ; তবু শ্রমণের ধর্মাদর্শে চাঁপার কামনা-বাসনা বিলীন হ'য়ে গেল। দীর্ঘকাল পর ব্যাধপত্নীও সংসারের অসারতা উপলব্ধি ক'রে স্বামীর পথ অনুসরণ করল। চাঁপা এখন বুদ্ধের শরণাগতা থেরী (স্থবিরা)। তাদের আত্মজীবনের সংসারপর্ব একুশটি গাথায় রচিত ঃ

উপক ঃ সেদিন হাতে ছিল সন্ন্যাসীর দণ্ড। আজ আমি ব্যাধ !
ঘোর আশাপাশে মগ্ন, জানি না উত্তরণ !

উপক ঃ মজেছি রূপের মোহে ; বউ আমায় ঠাট্টা ক'রে ছেলে
ভোলায় ! চাঁপার বাঁধন ছিঁড়ে প্রব্রজ্যাই শরণ আমার।

চাঁপা ঃ আমার' পর রাগ কেরো না, ওগো মহাবীর ! মহামুনি !
ক্রোধবশ যে, তার শুদ্ধি কোথা ? তপস্যা তো ছার !

উপক : নালগ্রাম ছেড়ে যাব, কে এখানে থাকে বলো? যেখানে ধর্মজীবী শ্রমণ নারীর রূপে মুগ্ধ!

চাঁপা : ওগো কালসোনা[১]! ফিরে এসো, প্রথম দেখার মতো ভালবাসো; আমি তো তোমারই রয়েছি, আর আছে দাসদাসী।

উপক : যে প্রেম দিয়েছ, তার চতুর্থাংশেই তৃপ্ত আমি; যে ছিল তোমার অনুরক্ত, তার প্রেম আজও দীপ্ত।

চাঁপা : যেমন গিরিচূড়ায় শোভে কুসুমিতা কালঙ্গিনী লতা, দ্বীপের মাঝে প্রফুল্ল দাড়িম্ব অথবা পাটলী—তেমনি আমি হরিচন্দন মেখে পরেছি বারাণসী শাড়ী; এ রূপবতীকে ছেড়ে কোথায় যাবে বলো?

উপক : ব্যাধ যেমন জালে বাঁধে উন্মুক্ত বিহঙ্গকে, ওগো তেমনি আমায় বেঁধো না রূপের জালে।

চাঁপা : কালসোনা! তুমি ছেলে দিয়েছ আমার কোলে, পুত্রবতী পত্নীকে ছেড়ে কার কাছে যাবো বলো?

উপক : প্রব্রজ্যার কারণে জ্ঞাতি-পুত্র-ধন ত্যাগ করে মহাবীর, যেমন বন্ধন ছিঁড়ে চলে যায় বীর মাতঙ্গ।

চাঁপা : যদি লাঠি বা ছুরি দিয়ে খুন করি তোমার সন্তানকে, কিম্বা মাটিতে পুঁতে ফেলি, তবু গৃহত্যাগী হবে।

উপক : চাঁপা, শৃগাল অথবা কুকুরের মুখে যদি দাও সন্তানকে, অমায় পারবে না তুমি বাঁধতে।

চাঁপা : হায়! কালো আমার, যাবেই যখন,—মঙ্গল হোক; শুধু বলে যাও, যাচ্ছ কোন গ্রাম, নিগম বা নগরে।

উপক : অতীতে মান্য শ্রমণ হ'য়ে ভিক্ষুসংঘে ঘুরেছি কতো—গ্রাম

১। স্বামীর গায়ের রঙ কাল ছিল, তাই চাঁপা তাকে ঠাট্টা করত—
এহি কাল নিবত্তস্সু, ভুঞ্জ কামে যথা পুরে।
অহম চ তে বসীকতা, যে চ সন্তি ঞাতকা।

থেকে গ্রামে, নগর থেকে রাজধানীতে। নিরঞ্জনা নদীর তীরে উপগত ভগবান বুদ্ধ, বিতরণ করেন দুঃখতাপহারক ধর্ম্মের উপদেশ ; তাঁর কাছে চলেছি, তিনিই আমার গুরু।

চাঁপা : আমার বন্দনা জানিয়ো অনুপম লোকনাথকে, তাঁকে প্রদক্ষিণ ক'রে জানাবে আমার প্রণতি।

উপক : ওগো চাঁপা ! তাই হবে, যেমন তোমার প্রার্থনা ; তথাগতের দর্শন পেয়ে নিবেদন করবো তোমার বন্দনা।

পরবর্তী তিনটি গাথায় বর্ণিত হয়েছে—উপক নিরঞ্জনাতীরে বুদ্ধের সমীপে পৌঁছালেন, তারপর ভগবানের কাছে শ্রমণের দীক্ষা নিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।

মানভঞ্জন

[গীতগোবিন্দ, দশম সর্গ]

হরিস্মরণে সরস মন ও রাধাকৃষ্ণের বিলাসকলায় কুতূহল নিয়ে 'পদ্মাবতীচরণচারণ' 'কবিরাজরাজ' জয়দেবের মধুর-কোমলকান্ত পদাবলীর শুরু। যমুনানদীর তীরদেশে শুচিস্নিগ্ধ বৃন্দাবনের বিপিনে বিরহিহৃদয়ের দুঃখজাগানিয়া বসন্তের আগমন ঘটেছে ; ললিত-লবঙ্গ-লতার সংস্পর্শে বাতাস হয়েছে মধুর ; কোকিলের কূজনে, মধুকরের গুঞ্জনে কুঞ্জকুটীর মুখরিত। সেই মধুলগ্নে যমুনা-পুলিনে তমালতরুর শ্যামায়মান ছায়ায় কুঞ্জগৃহে গোপরমণী রাধার অভিসার, মিলনের উৎকণ্ঠা, বিরহের আকুতি, প্রেমিক কৃষ্ণের শঠতা, চাতুরি, খণ্ডিতার মানবিনোদন, অবশেষে প্রেমরভসে নায়ক-নায়িকার মিলন—দ্বাদশ সর্গের কাব্য গীতগোবিন্দের এই হোল সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। কলহান্তরিতা নায়িকা রাধার অভিমান কিঞ্চিৎ শিথিল হলেও প্রিয়তম কৃষ্ণের বিরহে আজ সে বিধুরা। এমন সময় দয়িত কৃষ্ণ উপস্থিত হলেন ; গদ্‌গদবচনে প্রিয়তমাকে অনুনয় ক'রে তিনি বলতে লাগলেন :

প্রথম

প্রিয়ে ! যদি আমায় দুটি কথা কও,
তোমার দন্ত-রুচির জ্যোৎস্নাধারায়—
দূরে যাবে হৃদয়ের গহন আঁধার !
মুখচাঁদে উছলে পড়ে অধরমধু,
নয়নচকোরের তাই তো অভিরুচি[১] ।

দ্বিতীয়

ওগো আমার চারুশীলা প্রিয়তমা !
দূর করো আজ এই অকারণ মান ;
মদন-আগুনে সদাই হৃদয়-দহন,
করাও তবে মুখকমল-মধুপান ।

তৃতীয়

সুদশনা ! যদি মান ক'রে থাকো—
আঘাত হানো চটুল নয়ন-বাণে
ভুজলতায় দাও বাঁধন, অধরে চুমা ।—
সেই হবে আমার সুখশাসন !

চতুর্থ

তুমিই আমার ভূষণ, আমার জীবন,
আমার সংসার-সাগর-শিরোমণি !
তুমি রবে সতত অনুরাগিণী,
তাই তো হৃদয়ের পরম অভিলাষ[২] ।

পঞ্চম

ওগো সুন্দরী ! নীল-নলিনাভ ও দুটি নয়ন,

১। বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী/হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্ ।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রিমা/রোচয়তি লোচনচকোরম্ ।

২। ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনম্ ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্ ।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্ ॥

অভিমানে হোল বুঝি আরক্ত কোকনদ ;
প্রণয়বিধুর ঐ নয়ন-অনুরঞ্জনে
সফল হবে তোমার কৃষ্ণ-অনুরাগ।

ষষ্ঠ

বেজে উঠুক কুচকুম্ভে মণিমালার মঞ্জরী,
অনুরাগে রাঙা হবে আমার অন্তর ;
নিটোল জঘনে মেখলার নিনাদ—
সেই হবে নব প্রেমের ঘোষণা !

সপ্তম

ওগো মধুরভাষিণী ! দাও তোমার আদেশ—
সরস উজল আলতায় রাঙাবো ঐ চরণ ;
স্থলকমলবিনিন্দি কৃষ্ণহৃদয়নন্দি পদযুগ।—
তখন প্রেমরঙ্গে জাগবে পরম শোভা।

অষ্টম

তোমার সুচারু পদপল্লব আমার মাথার মণি,
সেই তো জুড়াবে প্রেমের বিষজ্বালা ;
দারুণ মদনানলে জ্বলে অঙ্গ,
দূর করো তার প্রণয়-দহন[১]।

কবির ইতিকথা

[রাজশেখরকৃত কাব্যমীমাংসা, দশম অধ্যায়]

কবি হবেন সর্ববিদ্যা ও উপবিদ্যায় বিচক্ষণ। বিদ্যা হোল—ব্যাকরণ, (শব্দ, অর্থ, ধাতু প্রভৃতি), কোশ বা অভিধান এবং ছন্দ ও অলংকারশাস্ত্র। উপবিদ্যার অন্তর্গত চোষট্টি কলা—নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি। সহৃদয় সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যসেবীদের যাঁরা পৃষ্ঠ-

১। স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো হরতু তদুপাহিতবিকারম্॥

পোষক, কবি সর্বদা তাঁদের সান্নিধ্য কামনা করবেন। আবার দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয়ে জ্ঞান, পণ্ডিত ও বিদগ্ধ সমাজের সঙ্গে পরিচয়, লোকাচারে নৈপুণ্য, কবি ও সাহিত্যিকদের সভা-সমিতেতে অংশগ্রহণ এবং প্রাচীন কাব্য-পরম্পরায় সম্যক্ দৃষ্টি—এগুলিই কাব্যের জননী বা কাব্যরচনার মূল প্রেরণা ও উপাদান। এই বিষয়গুলি ছাড়াও কবির পক্ষে কাব্য-রচনার একান্ত সহায়ক হোল সুস্বাস্থ্য, প্রতিভা, নিরন্তর অনুশীলন, মনের একাগ্রতা, সুধীগণের সান্নিধ্য, পাণ্ডিত্য, প্রখর স্মৃতি, মনের প্রফুল্লতা ও নিরন্তর উৎসাহ।

কবি হবেন সদাশুচি। এই শুচিতা হোল কায়-মনো-বাক্যের পবিত্রতা। শাস্ত্রপাঠের দ্বারাই মনের ও বাক্যের শুচিতা অর্জিত হয়; শরীরের পবিত্রতার অর্থ—নখচ্ছেদ, অধরে তাম্বূলের রক্তিমা, দেহে চন্দনের ঈষৎ অনুলেপন, আভিজাত্যপূর্ণ বেশবাস এবং মস্তকে পুষ্পাভরণ। সদাশুচিতা, নিরন্তর অভ্যাস অর্থাৎ অনুশীলন হোল কাব্য-সরস্বতীর বশীকরণ—প্রাজ্ঞেরা এই কথা বলেন। সমস্ত বাহ্য পরিবেশ ও মানসিক বৃত্তি মিলে কবির যেমন স্বরূপ, তাঁর কাব্যের স্বরূপও তদনুরূপ হবে। তাই লোকমধ্যে প্রবাদ আছে চিত্রকর যে আকারের, তাঁর চিত্রও সেই আকারের হয়। কবি যখন অভিভাষণ করবেন, মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠবে; সরল ভাষায় কথা বলবেন না, বললেন ঘুরিয়ে—তাৎপর্যে বা ব্যঞ্জনায়; আর সব বিষয়ে গোপন কথাটি জানার চেষ্টা করবেন; কবি অন্য কবির নিন্দায় বিমুখ থাকবেন এবং সাহিত্য সমালোচনায় কোনরকম প্রভাবিত না হ'য়ে দোষ ও গুণের আলোচনা করবেন।

কবির বাসভবনটি হবে পরিমার্জিত। সেখানে থাকবে ছয় ঋতুর উপযোগী বিবিধ স্থান; বৃক্ষমূলে নির্মিত বেদিকার উপর কুঞ্জ-গৃহ; আর থাকবে ক্রীড়া-পর্বত, দীঘি, পুষ্করিণী, ফোয়ারাযুক্ত কৃত্রিম নদী ও সমুদ্র, বহতা খাল এবং ময়ূর, হরিণ, হারীত, সারস,

চক্রবাক, হংস, চকোর, ক্রৌঞ্চ, কুরর, শুক, সারী প্রভৃতি গৃহপালিত পশু-পক্ষী। আতপ ও শ্রমের ক্লান্তি বিদারক সেই কবিভবনে থাকবে যন্ত্রযুক্ত ধারাগৃহ, লতামণ্ডপ, দোলা ও পালঙ্ক। কবি সর্বদা কাব্যভাবনায় নিবিষ্টমনা থাকেন, তাই তাঁর বিশ্রামকক্ষ আজ্ঞাবহ-পরিবেষ্টিত অথবা সম্পূর্ণ নির্জন থাকবে। কবির বন্ধুরা সমস্ত ভাষায়, অন্তঃপুরনারীরা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায়, ভৃত্যেরা অপভ্রংশ ভাষায় এবং দাসীরা অপভ্রংশ ও প্রাকৃত ভাষায় পটু হবেন। কবির লেখক হবেন সর্বভাষায় (সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ) নিপুণ, চতুর, মিষ্টভাষী, উত্তর-প্রত্যুত্তরে দক্ষ, আকার-ইঙ্গিতে অভিজ্ঞ, লিখন প্রণালীতে কুশল, কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস ও ছন্দঃঅলংকার প্রভৃতিতে পণ্ডিত। রাত্রিকালে কবি যখন কাব্যচর্চায় ব্যাপৃত থাকবেন, তখন তাঁর সহযোগী লেখক প্রভৃতি অনুপস্থিত থাকলে পরিচারক-পরিচারিকাদের কোন একজন উপস্থিত থাকবেন।

আচার্যরা বলেন কবির বাসভবনে সর্বদা কাব্যরচনা ও অনুশীলনের উপাদান সামগ্রী প্রস্তুত রাখা বিধেয়। এগুলি হোল— একটি সম্পুটিকা বা কৌটা, কাঠের ফলক ও খড়ি, ঢাকনিযুক্ত বাক্স, মসীপত্র ও লেখনী, কিছু ভূর্জপত্র, লোহার কাঁটায় গাঁথা তালপত্র ও পরিষ্কৃত গৃহভিত্তি। রাজশেখর বলেন ঃকাব্যরচনার প্রথম ও শেষ সামগ্রী হোল 'প্রতিভা'।

সাহিত্য-মীমাংসকেরা বলেন, কবি প্রথমত আপন পাণ্ডিত্য ও রচনাশক্তির সামর্থ্য অনুধাবন কববেন ; তিনি আরও চিন্তা করবেন কোন্ ভাষায় সার্থক কাব্যরচনা তাঁর সামর্থ্যের অনুকূল, পাঠকের রুচি কিরূপ, লেখক ও পাঠকের সামাজিক পরিমণ্ডল ও অন্যান্য পরিবেশ কীদৃশ সাহিত্যের উপযোগী এবং কবির নিজস্ব কাব্য-মানসিকতা। এই সব তত্ত্ব যথার্থ বিবেচনা ক'বে কবি কোন একটি ভাষায় (সংস্কৃত, প্রাকৃত বা অপভ্রংশ) সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করবেন।···

লোকনিন্দা অর্থাৎ কাব্যের বিরূপ সমালোচনা যেন কবির মনে হতাশা বা সঙ্কোচের সৃষ্টি না করে। কারণ সমাজ হোল নিরঙ্কুশ। অর্থাৎ পরের সমালোচনায় মানুষের মুখে কোন কথাই আটকায় না; তাই কবি স্বয়ং শ্রেষ্ঠ আত্ম-সমালোচক হবেন এবং কখনই আত্ম-বিশ্বাস হারাবেন না[১]।

সাধারণত দেখা যায় কবির মৃত্যুর পর অথবা প্রবাসী কবির ক্ষেত্রে স্বদেশে তাঁর কাব্যের প্রশংসা ও স্তুতি ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু জীবিত অবস্থায় অথবা স্বদেশে মহান কবির ভাগ্যেও প্রশংসা তো জোটেই না, উপরন্তু নিন্দা লাভ হয়। জীবিত অথবা পরিচিত কবির রচনা, কুলস্ত্রীর সৌন্দর্য এবং গৃহচিকিৎসকের বিদ্যা কখনো সুনাম পায় না[২]। এটি অত্যন্ত মজার ব্যাপার যে, যিনি অন্যের ভাব ও ভাষা অপহরণে দক্ষ, তিনিও প্রতিষ্ঠিত ও নামী কবিদের সাধারণ কবি বলে নিন্দা করেন। সুকবির সহৃদয় বাণী সহজেই লোকমুখে প্রতিধ্বনিত হয়।···আবার দেখা যায় কবিপুত্র পিতার রচনা পাঠ না করেও প্রশংসা করেন; অনুরক্ত পাঠক-পাঠিকারা তাদের প্রিয় কবির রচনা এবং পদাতিক সৈন্য রাজার রচনা বিনা বিচারে পাঠ ও প্রশংসা করেন। অসমাপ্ত রচনা পাঠ না করাই বিধেয়, তার ফল অসম্পূর্ণ; এটি কবিদের গূঢ় তত্ত্ব।

নতুন কাব্য বা রচনা একজন কবির সমক্ষে পাঠ করা উচিত নয়, কারণ শ্রোতা কবি যদি সেই রচনা নিজের বলে দাবী করেন, তাহলে সাক্ষী প্রভৃতির সাহায্যে তার যথার্থতা নির্ণয় করা কষ্টকর। কবি

১। জনাপবাদমাত্রেণ ন জুগুপ্সেত চাত্মনি
জানীয়াৎ স্বয়মাত্মানং যতো লোকো নিরঙ্কুশঃ॥

২। গীতিসূক্তিরতিক্রান্তে স্তোতা দেশান্তরস্থিতে।
প্রত্যক্ষে তু কবৌ লোকঃ সাবজ্ঞঃ সুমহত্যাপি॥
প্রত্যক্ষকবিকাব্যং চ রূপং চ কুলযোষিতঃ।
গৃহবৈদ্যস্য বিদ্যা চ কস্মৈচিদ্ যদি রোচতে॥

কখনো স্বরচিত কাব্যের প্রশংসা করবেন না, বরং আত্মসমালোচনা করবেন ; নিজের রচনায় পক্ষপাত বা আত্মতুষ্টি দোষগুণের বিপর্যয় ঘটাতে পারে। কবি হবেন আত্মশ্লাঘাশূন্য ; সামান্য অহংকার পাণ্ডিত্য ও যাবতীয় সংস্কারকে বিনষ্ট করতে পারে। তাই তিনি নিরপেক্ষ সমালোচকের মুখে নিজ রচনার ভুলত্রুটি যথার্থ অনুসন্ধান করবেন ; কবি নিজে যা পারেন না, সমালোচক সহজেই তা পারেন। সাহিত্যানুশীলনের একটি পরম রহস্য হোল—আত্মশ্লাঘাকারী বা কবিমানী কবির সম্মুখে কোন উৎকৃষ্ট রচনা পাঠ করা অবিবেচকের কাজ, কারণ সেই ব্যক্তি ভাল কবিতা বা রচনা শুনলেও তার উপযুক্ত প্রশংসায় কুণ্ঠিত হন, অথবা তিনি সেই রচনার ভাব আপন রচনায় নির্দ্বিধায় আত্মস্থ করতে পারেন।

নিয়মানুবর্তিতা ও অধ্যবসায় ছাড়া কোন কর্মই সফল হয় না। তাই সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠাভিলাষী কবি দিন ও রাত্রিকে চার প্রহরে বিভক্ত ক'রে আপন কর্তব্য নির্ধারণ করবেন। কবি প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করবেন ; তারপর সাধারণ কৃত্য সমাপন ক'রে প্রাতঃসন্ধ্যা ও উপাসনা করবেন এবং বেদের সরস্বতী-সূক্তটি পাঠ করবেন। তারপর বিদ্যাগৃহে প্রথম প্রহরের শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যা ও উপবিদ্যার চর্চা উপযুক্ত, কারণ কবির বৈদগ্ধ্য, অনুশীলন প্রভৃতি কবিপ্রতিভার বিকাশে সাহায্য করে। দ্বিতীয় প্রহর কাব্য রচনার উপযুক্ত কাল। দ্বিপ্রহরের পূর্বেই স্নান সমাপন ক'রে কবি স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল ও মিত আহার গ্রহণ করবেন। ভোজনের পর 'কাব্যগোষ্ঠী' বা সাহিত্যসভার অনুষ্ঠান শুরু হবে ; কখনো কখনো সাহিত্যবিষয়ক প্রশ্নোত্তরের আসর বসবে। এইভাবে তৃতীয় প্রহরের শেষ পর্য্যন্ত সমস্যা-পূরণ, ধারণমাতৃকা (পঠিত গ্রন্থের আলোচনা) ও চিত্রকাব্য (বর্ণনা প্রধান ও শব্দপ্রধান বাচ্যচিত্র ও শব্দচিত্র রচনা) প্রভৃতি সাধারণ রচনায় অভিনিবেশ করবেন। চতুর্থ প্রহরে কবি কতিপয় বিদগ্ধ পরিষদের সঙ্গে পূর্বাহ্ণে রচিত কাব্যের আলোচনা করবেন, কারণ

কাব্যরচনার সময় কবিসত্তা কল্পনা বা ভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়; সমালোচকসত্তা তখন লুপ্ত থাকে। তাই কাব্যরচনার পর তার আলোচনাকালে প্রয়োজন অনুসারে বর্জন, গ্রহণ, পরিবর্তন ও পরিমার্জন পদ্ধতিতে কাব্য নির্দোষ ও সার্থক হ'য়ে ওঠে।

পুনরায় সায়ংকালে কবি সন্ধ্যাউপাসনা ও বাগ্‌দেবীর বন্দনা করবেন; তারপর রাত্রির প্রথম প্রহর অবধি দিনের বেলায় পরীক্ষিত কাব্যের অনুলিপি প্রস্তুত করবেন। রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে তিনি নিদ্রা যাবেন; সুনিদ্রায় শরীর সুস্থ ও নীরোগ হয়। চতুর্থ প্রহরের শেষে ব্রাহ্ম মুহূর্তে কবি শয্যা ত্যাগ করবেন, তখন মন প্রসন্ন থাকে এবং কর্মারম্ভ সুসম্পন্ন হয়। এই হোল কবির দিনরাত্রির কর্মসূচী।

পুরুষের মতো স্ত্রীলোকেরাও কবি হ'তে পারেন; কারণ কবিত্ব-সংস্কার বা প্রতিভা আত্মার ধর্ম; কবিত্বশক্তি স্ত্রীপুরুষ ভেদে নির্ভর করে না[১]।

এইভাবে যে কবি একাগ্রচিত্তে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, স্বয়ং দেবী সরস্বতী তাঁর কাছে পতিব্রতা ভার্যার মতো অনু-রক্তা হন; সেই কবি সাহিত্যরচনায় যে সার্থকতা লাভ করেন, বাক্যগুরু বৃহস্পতি ও তার রহস্য উপলব্ধি করতে অক্ষম।

কাব্যসাহিত্যের অনুরাগী রাজা (কবিরাজ বা রাজকবি) সাহিত্য-সভার আয়োজন করবেন। সাহিত্য আলোচনার জন্য একটি সভামণ্ডপ নির্মিত হবে; তার ষোলটি স্তম্ভ, চারটি দরজা ও আটটি

১। পুরুষবদ্ যোষিতোঽপি কবীর্ভবেয়ুঃ। সংস্কারো হি আত্মনি সমবৈতি, ন স্ত্রৈণং পৌরুষং বা বিভাগমপেক্ষতে॥

ইত্যনন্যমনোবৃত্তের্নিঃশেষঽস্য ক্রিয়াক্রমে।
একপত্নীব্রতং ধত্তে কবের্দেবী সরস্বতী॥
সিদ্ধিঃ সূক্তিষু সা তস্য জায়তে জগদুত্তরা।
মূলচ্ছায়াং ন জানাতি যস্যাঃ সোঽপি গিরাং গুরুঃ॥

বারান্দা থাকবে। ঐ সভামণ্ডপের কাছেই থাকবে রাজার প্রমোদ-ভবন ; সেই সভার মধ্যে চারটি স্তম্ভের দ্বারা পরিবেষ্টিত একহাত উচ্চ মণিময় রত্নবেদিকার, উপর রাজার আসন নির্মিত হবে। রত্নবেদিকার উত্তরদিকে বসবেন সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী কবিরা। প্রত্যেক ভাষার বিশিষ্ট কবিগণ সেই সেই ভাষামণ্ডপে স্থান গ্রহণ করবেন ; কিন্তু বহুভাষাভাষী কবিরা সমস্ত মণ্ডপেই পর্যায়ক্রমে অংশ গ্রহণ করবেন। সংস্কৃত কবিদের পশ্চাতে আসন গ্রহণ করবেন বেদজ্ঞ, নৈয়ায়িক, মীমাংসক, পৌরাণিক ও স্মার্ত পণ্ডিতগণ, চিকিৎসক ও জ্যোতিষিবৃন্দ এবং সংস্কৃত ভাষার অন্যান্য পণ্ডিতেরা। বেদিকার পূর্বদিকে বসবেন প্রাকৃত ভাষার কবিগণ, আর তাঁদের পশ্চাতে নট, নর্তক, গায়ন, বাদন, কথক, কুশীলব, মন্দিরাবাদক, ও অন্যান্যেরা ; পশ্চিমদিকে বসবেন অপভ্রংশ ভাষার কবিগণ এবং তাঁদের পশ্চাতে চিত্রকর, লেপনকর, জহুরী, স্বর্ণকার, সূত্রধার, লৌহকার ও অন্যান্যেরা ; দক্ষিণদিকে বসবেন পৈশাচী প্রভৃতি ভাষায় নিপুণ কবিরা এবং তাঁদের পশ্চাতে লম্পট, গণিকা, প্লবক, ঐন্দ্রজালিক, দন্তচিকিৎসক, মল্লযোদ্ধা, শস্ত্রজীবী ও অন্যান্যেরা।

প্রণয়-কবিতা

কামস্তুতি

[মন্ত্রব্রাহ্মণ]

হে দেবতা কাম !
তুমি সর্বলোক বিদিত,
ভুবনবিদিত তোমাব মাদকতা ;—
সে মাদকতা আজ এ তকণীতে হোল উচ্ছল,
পতিসকাশে উপনীত কবো তাকে।
জীবসৃষ্টিব তপস্যায় তোমাব প্রকাশ,
তোমাকে জানাই প্রণতি।

বধূবরণ

[মন্ত্রব্রাহ্মণ]

ওগো বধূ !
মধুসিক্ত কবি তোমাব 'আনন্দ-ইন্দ্রিয',
সে যে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতিব 'দ্বিতীয় আনন' ;
তাই দিয়ে নাবী জয় কবেছো পুকষকে,
বশ করেছো দুর্দমকে।
তুমি হও সৃষ্টির সম্রাজ্ঞী।—
এ প্রার্থনাই আজ ধ্বনিত[১]।

১ ইমং তে উপস্থং মধুনা সংসৃজামি
প্রজাপতের্ মুখমেতদ্ দ্বিতীয়ম্।
তেন পুংসোঽভি ভবাসি
সর্বানবশান্ বশিন্যসি, রাজ্ঞী স্বাহা

মিথুন

[গৃহ্যসূত্র]

ওগো নারী !—তুমি আর আমি
সৃষ্টির দ্বৈত রূপ—নারী ও পুরুষ ;
আমি আকাশ, তুমি পৃথিবী ;
আমি উদাত্ত ঋক্‌মন্ত্র,
তুমি মন্দ্র সামগান ;
আমি হৃদয়, তুমি বাণী ;
ধারণ করো নব সৃষ্টির বীজ[১] ।

শিলারোহণ

[মন্ত্রব্রাহ্মণ]

ওগো বধূ !
দাঁড়াও এই শিলাখণ্ডে,
স্থির হও শিলার মতো,
অচঞ্চলা হও আমার জীবনে,
পরাজিত করো প্রেমের শত্রুকে,
অনিন্দিতা হও সর্বদা সর্বত্র ।

হৃদয়বন্ধন

[গৃহ্যসূত্র]

আমার হিয়ায় মিলুক তোমার হিয়া,
আমার চিত্তে মিলুক তোমার চিত্ত,

---

১ । আমোঽহমস্মি সা ত্বম্, সামাহমস্মি ঋক্ ত্বম্ ।
মনোঽহমস্মি বাক্ ত্বম্, দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বম্ ॥
দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বম্, ঋক্ ত্বমসি সামাহম্ ।
বাতোঽহমস্মি, রেতো ধত্তাম্ ॥

অনন্যমনা তুমি শোন আমার বাণী,
হও অনুব্রতা বধূ, আমার সহচরী[১]।

সপ্তপদী

[গৃহ্যসূত্র]

ওগো বধূ,
তোমার প্রথম পদক্ষেপ—'অন্নের প্রার্থনা।'
দ্বিতীয় পদক্ষেপ—'তেজঃশ্রীর কামনা।'
তৃতীয় পদক্ষেপ—'সম্পদ্‌সমৃদ্ধি।'
চতুর্থ পদক্ষেপ—'সুখস্বাচ্ছন্দ্য।'
পঞ্চম পদক্ষেপ—'সন্তানসৌভাগ্য।'
ষষ্ঠ পদক্ষেপ—'ঋতুর ফসল!'
সপ্তম পদক্ষেপে হও সপ্তপদী সখী,
পাই যেন তোমার সখ্য;
আমার সখ্যে তুমি হও অচঞ্চলা[২]।

প্রীতিসংজনন

[অথর্ববেদ। কবি অথর্বা]

করেছি তোমার হৃদয় হরণ,
করেছি তোমার মন উচাটন;
চিত্ত তোমার ধেয়ে যাক সদা মোর চিত্তের তরে,
বায়ুর পিছনে ধূম্র যেমন ঘুরে ঘুরে শুধু মরে।

১। মম হৃদয়ে হৃদয়ং তে অস্তু, মম চিত্তে চিত্তমস্তু তে,
মম বাচমেকমনাঃ শৃণু, মামেবানুব্রতা সহচর্যাময়া ভব ॥

২। ইষ একপদী, ঊর্জে দ্বিপদী,
রায়স্পোষায় ত্রিপদী, মায়োভব্যায় চতুষ্পদী,
পশুভ্যঃ পঞ্চপদী, ঋতুভ্যঃ ষট্‌পদী,
সখী সপ্তপদী ভব, সখ্যং তে গমেয়ম্‌ সখ্যাত্মে মা যোষ্ঠা ॥

অঞ্জন

[অথর্ববেদ। কবি অথর্বা]

অনুরাগে রাঙা হোক দুজনার নয়ন,
আঁখির কোণে লাগুক প্রেমের অঞ্জন ;
আমায় করো হৃদয়ের প্রিয়তমা,
এক হোক তোমার আমার দুটি মন[১]।

বশীকরণ

[অথর্ববেদ। কবি প্রজাপতি]

হে লতা বশীকবণ,
ভেবেছি যা মনে, বলেছি তো তাই ;
বলেছি যে কথা, ভাবি গো তাহাই ;
আছে যত তরুণী কন্যাগণ—
কবো তাদের হৃদয় হরণ[২] !

প্রেমভিক্ষা

[অথর্ববেদ। কবি জমদগ্নি]

তরুকে যেমন তরুণী লতায় করে বেষ্টন,
তেমনি আমায় দাওগো নিবিড় আলিঙ্গন ;
হ'য়ো না কখনো, হ'য়ো না দূরঙ্গমা,
ওগো নারী, তুমি হও মোর প্রিয়তমা[৩]।

১। অক্ষ্যৌ নৌ মধুসংকাশে / অনাকং নৌ সমঞ্জনম্।
অন্তঃ কৃণুষ্ব মাং হৃদি / মনো ইন্নৌ সহাসতি ॥

২। যদন্তরং তদ্ বাহ্যং / যদ্ বাহ্যং তদন্তরং
কন্যানাং বিশ্বরূপাণাং / মনো গৃভ্ণায়ৌষধে ॥

৩। যথা বৃক্ষং লিবুজা সমন্তং পরি ষস্বজে
এবা পরি ষ্বজস্ব মাং, যথা মাং কামিন্যসো যথা মন্নাপগা অসঃ ॥

বসন্তে

[কবি শ্রীহর্ষ]

আম্র শাখায় ফুল ছুলিয়ে,
মানিনীদের মান ভুলিয়ে,
পঞ্চশরের দূত এসেছে মধুর মলয় বায় ;
ফুটেছে ফুল অশোক বকুল,
মিলন আশে পরাণ আকুল,
দূর প্রবাসীর নারী হৃদয় ধরতে নারে হায় ।
ফাগুন এসে আগেই হিয়া
কোমল ক'রে যায় রাখিয়া,
শেষে মদন সুযোগ পেয়ে বাণ হানে গো তায় ।

রূপসী

[কবি কালিদাস]

লাবণ্যখনি নিশামণি কি গো পিতা এই বালিকার ?
কিবা সেই আদি রসের রসিক, কুসুম আয়ুধ যার ?
কিবা সে পুষ্প প্লাবিত চৈত্র ? হেন রূপ নিশ্চয়
বেদ-প্রণেতা সে বুড়া ব্রহ্মার সৃষ্টি কখনো নয়[১] ।

প্রেমসংকট

[কবি শ্রীহর্ষ]

দুর্লভ জনে অনুরাগ মম, হায়,
লজ্জা বিষম, আমি পরবশ তায় .

১ । অস্যাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতিরভূচ্চন্দ্রো নু কান্তিপ্রদঃ
শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নু মদনো মাসো নু পুষ্পাকরঃ ।
বেদাভ্যাসজডঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতূহলো
নির্মাতুং প্রভবেন্ মনোহরমিদং রূপং পুরাণো মুনিঃ ॥

একি সংকট সখী, একি হোল দায়
মরণই শরণ, নিরুপায়! নিরুপায়!

গান

[কবি কালিদাস]

নূতন মধুর লালসা-লোলুপ অলি হে!
আম্র মুকুলে গিয়েছিলে তুমি চুমিয়ে;
আজি কমলের দুয়ারে মাত্র বুলিয়ে
একেবারে তারে গেলে কি ভ্রমর ভুলিয়ে[১]।

নারীবন্দনা

[কবি অজ্ঞাত]

পূর্ণিমা চাঁদ বদনের ছাঁদ, লাবণ্যে তনু ছায়,
আধ-বিকশিত সোনার কমল উজছিলে মহিমায়।
পরশে তাহার শিরীষ-সুষমা, বলি-চিহ্নিত মাঝ,
কোকিল-কণ্ঠী হরিণনয়না, হাসে ভাষে সদা লাজ।

প্রণয়-ভঙ্গ

[কবি ভাবকদেবী]

আগে সে মোদের ছিল এক দেহ, ছিল না তো ছাড়াছাড়ি,—
তারপর তুমি নহ আর প্রিয়, আমি হত-আশা নারী!
এখন আমি যে শুধুই গৃহিনী, তুমি শুধু মোর স্বামী,—
প্রাণ ছিল মোর কুলিশ-কঠিন, তারি ফল লভি আমি!

১। অহিণব-মধু-লোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চুঅমঞ্জরিং
কমল-বসই-মেত্ত-ণিব্বুদো মহুঅর বিসুমরিদোসি ণং কহং।

অভিযোগ

[কবি ভাবকদেবী]

ত্রিকোণ পৃথিবী, তার অর্দ্ধেক রহে জুড়ে নগ-নদী,
অর্দ্ধেক তার নারী আর শিশু, যোগী আর রোগী যদি,—
থাকে কয় জন, তা' হ'তে মান্য ছাড়ি' গুরুজন সব ?
মিছে অপবাদ—'অসতী অসতী' মুখর এ মুখ-রব !

বিরহিণী

[কবি মোরিকা]

বিরহের শ্বাসে কত না তাহার কাঁচুলী নিত্য ছিঁড়িয়া পড়ে,—
একবার তুমি এসো ওগো,—আর সেলাইয়ের সুতা নাই যে ঘরে !

কুলটা-প্রেম

[কবি বিজ্জকা]

বাল্যে বালক, যৌবনে যুবা, বৃদ্ধ বয়সে নিতি
বৃদ্ধ লইয়া ঘর করি মোরা,—এই আমাদের রীতি।
পুত্রী রে, তোর এক পতি লয়ে জন্ম কাটাতে সাধ—
আমাদের কুলে হয় নি কখনো হেন সতী-অপবাদ[১] !

দুঃখিনী

[কবি বিজ্জকা]

হে প্রাণবন্ধু, ফিরিতে তোমার কতদিন আরো রয়েছে বাকী ?
চাঁদের কিরণ দহন করিছে—এই পোড়া দেশে কেমনে থাকি[২] ?

১। বয়ং বাল্যে বালাংস্তরুণিমনি যূনঃ পরিণতা-
বপীচ্ছামো বৃদ্ধাংস্তদিহ কুলরক্ষা সমুচিতা।
ত্বয়ারব্ধং জন্ম ক্ষপয়িতুমনেনৈকপতিনা
ন মে গোত্রে পুত্রি কচিদপি সতীলাঞ্ছনভূৎ।

২। বিজ্ঞপ্তিরেষা মম জীববন্ধো তত্রৈব নেয়া দিবসাঃ কিয়ন্তঃ।
সম্প্রত্যযোগ্যস্থিতিরেষ দেশঃ, করাঃ হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি॥

মানিনী

[কবি ভাবকদেবী]

স্বামীরা স্বাধীন, তবে কেন মিছে লুঠিছ আসিয়া আমার পায় ?
মন বসেছিল অন্য কোথাও কিছুদিন তরে ?—কি দোষ তায় ?
পতির বিহনে সতী নাহি বাঁচে, এই কথা আজো সকলে কহে,—
আমি বেঁচে আছি তোমার বিরহে,—দোষতো আমার, তোমার নহে[১]

প্রোষিতপতিকা

[কবি অবন্তীসুন্দরী]

যাত্রাসময়ে গুরুজন মাঝে তেয়াগি লজ্জা ভয়,
স্রস্তবসনা ধরিনু তোমায়—ভুলে গেছ নির্দয় ?

গোপন হাসি

[গাথা সপ্তশতী । কবি বিধিবিগ্রহ]

মা যশোদা যবে বলিলেন সবে, 'এখনো বালক আমার কানাই ।'
মুখপানে চেয়ে নিভৃতে হাসিল ব্রজের যতেক কুলবধূ-রাই[২] ।

হৃদয়-বসন্ত

[গাথাসপ্তশতী । কবি অজ্ঞাত]

ফোটে নি আমের মঞ্জরী, বহে না মলয় শ্বাস ;
আকুল হৃদয় বলে গো আমায়, 'এলো যে মধুর মাস' ।

---

১ । কিং পদান্তে লুঠসি বিরম স্বামিনো হি স্বতন্ত্রাঃ
কঞ্চিৎ কালং কচিদসি রতস্তেন কস্তেঽপরাধঃ ।
আগস্কারিণ্যহামহ ময়া জীবিতং তদ্বিয়োগে
ভর্তৃপ্রাণাঃ স্ত্রিয় ইতি ননু ত্বং ময়ৈবানুনেয়ঃ ॥

২ । অজ্জ বি বালো দামোঅরো ত্তি ইঅ জম্পিএ জসোআএ ।
কণ্হমুহপেসিঅচ্ছং নিহুঅং হসিঅং বঅবহূহি ॥

জীবন-নদী

[গাথাসপ্তশতী । কবি হাল]

চির চঞ্চল জীবন প্রবাহ, গেলে যৌবন ফিরে না কভু,
অন্ধ মানুষ শুনিয়া বিচারেতে ভুল করিছে তবু।
যেদিন গিয়াছে, সেদিন ফিরে না, আগামী দিনেতে অজানা সব ;
হানাহানি ক'রে মানুষ মরিছে স্বার্থের লাগিয়া তুলিয়া রব।

লাভ-ক্ষতি

[গাথাসপ্তশতী । কবি অজ্ঞাত]

বহু বেদনায় প্রিয় লাভ হয়,
অধিকারে আছে আবার দুঃখ ;
অধিকৃতে যদি না ভরে হৃদয়,
নিষ্ফল লাভ,—ফাটে গো বুক।

ভালোবাসা

[গাথাসপ্তশতী । কবি রাম]

ওগো মামী ! বঞ্চনাহীন ভালোবাসা—
মিলে না মর্তে : সেই তো সবার দুরাশা।
প্রেম খাঁটি হ'লে বিরহ কোথায় ?
বিচ্ছেদ হ'লে প্রাণ রাখা দায়[১] !

প্রেম-সঙ্কট

[গাথাসপ্তশতী । কবি স্বামিক]

দীর্ঘ বিরহে প্রেম চলে যায়,
অতি দর্শনে তাহাই হয়,
খলের কথায় প্রেম ছিঁড়ে যায়,
বিনা কারণেও প্রেমের ভয় !

১। কইঅব-রহিঅং পেম্মং ণত্থি ব্বিঅ মামি মাণুসে লোএ।
অহ হোই কস্স বিরহো, বিরহে হোন্তম্মি কো জীঅই ?

[সুন্দরী গুজ্জরি ণারি, লোঅণ দীহ বিসারি।
পীণ পওহরভার, লোলই মোত্তিঅ হার।]
সুন্দরী গুর্জরী নারী, লোচন দীর্ঘ প্রসারী।
পীন পয়োধরভার, লোলিত মুক্তার হার।

[সো মহ কান্তা দূর দিগন্তা।
পাউস আবে চেউ চলাবে।]
সে আমার কান্তা গেছে দূর দিগন্তা,
এল প্রাবৃট্ কাল হোল চিত্ত উতাল।

[মাণিণি মাণহি কাঁই ফল, এ আজ চরণ পড়ু কন্ত ;
সহজ ভুজঙ্গম জই ণমই, কিং করিএ মণিমন্ত ?]
সহজে চরণে পড়ে যদি কান্ত,
মানিনী মানে কি হবে ফল ?
সহজে ভুজঙ্গম হয় যদি শান্ত,
মণিমন্ত্রেতে কি হবে বল ?

[চলি চূঅ কোইল-সাব, মহুমাস পঞ্চমং গাব।
মন মজ্ঝ বম্মহ তাব ; নহু কন্ত অজ্জবি আব।]
আমের মুকুলে পিক উদ্‌ভ্রান্ত,
পঞ্চমে গাহে মধুমাস,—
মনে মোর প্রেম-হতাশ,
আজও এলনা তবু সেই কান্ত !

ইতি হ আস

অশোকের শিলালিপি

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোক (২৭২-২৩২ খৃঃ পূঃ) একটি মহৎ নাম। কলিঙ্গ-যুদ্ধের পরেই মহারাজ অশোক বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এমন অনুমান করার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। রাজ্যে ধর্ম ও ন্যায়নীতি প্রচারের জন্য তিনি রাজা ও প্রজার কর্তব্য এবং নৈতিক দায়িত্ব বিষয়ে অনেক অনুশাসন জারি করেছিলেন। বিশাল সাম্রাজ্যে শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত মানুষের কাছে ভগবান বুদ্ধের উপদেশ প্রচার করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ; তাই তিনি সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে, এমনকি বহির্ভারতেও মৈত্রী, শীল ও করুণার বাণী পাহাড় ও গুহার গায়ে এবং পাথরের স্তম্ভে উৎকীর্ণ করান। সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও মহারাজ অশোকের এই শিলালেখগুলি প্রাচীন ভারতীয় রাজতন্ত্রের ইতিহাসে মহামূল্য দলিল ঃ

চতুর্দশ গিরিলিপি ঃ এই ধর্মলিপি দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা লিখিয়েছেন। এই লিপি কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও মধ্যমাকার, কোথাও বা বিস্তৃত ; কারণ সর্বত্র সমানভাবে লেখানো সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার রাজ্যটিও বিশাল। এমন লিপি আমি অনেক লিখিয়েছি এবং আরও অনেক লেখাবো। স্থানে স্থানে হয়তো পুনরুক্তি হয়েছে ; আসলে তা অর্থমাধুর্যের জন্য। পুনরুক্তি কেন ? প্রজারাও এমন আচরণ করুক তাই পুনরুক্তি। ধর্মলিপি যদি কোথাও অসম্পূর্ণ হ'য়ে থাকে তাহলে সেটি হয় স্থানদোষে, অথবা বিশেষ কারণে কিম্বা লিপিকরের প্রমাদেই ঘটেছে[১]।

১। অয়ং ধংমলিপী দেবানং প্রিয়েন প্রিয়দসিনা রাঞা লেখাপিতা। অস্তি এব সংখিতেন, অস্তি মঝমেন, অস্তি বিস্ততন। ন চ সর্বং সর্বত ঘটিতং। মহালকে হি বিজিতং। বহু চ লিখিতং লিখাপয়িসং চেব অস্তি চ এত কং পুন পুন বুতং তস তস অথস মাধুরতায়। কিং তি ? জনো তথা পটিপজেথ ;

তৃতীয় গিরিলিপি : দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ বলেছেন—রাজ্যাভিষেকের বারো বছর পূর্তিতে আমি এ আদেশ জানিয়েছি। আমার রাজ্যের সর্বত্র যুত, রাজুক এবং প্রাদেশিকগণ[১] ধর্মোপদেশ প্রচারের জন্য এবং এজাতীয় অন্যান্য কাজের জন্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পরিভ্রমণে যাবেন। তাঁরা প্রচার করবেন—মাতা-পিতার সেবা, মিত্র-জ্ঞাতি ও শ্রমণদের দান এবং জীবে অহিংসা অতি পবিত্র কাজ। অল্পব্যয় এবং অল্পসঞ্চয় প্রশংসনীয়[১]।

চতুর্থ গিরিলিপি : পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক শ' বছর কেটে গেছে, তবু জীবের মধ্যে প্রাণিহিংসা আর হানাহানি বেড়েই চলেছে; জ্ঞাতিদের মধ্যে অসদ্ভাব এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের মধ্যে অসম্প্রীতি রয়েছে। তাই আজ ধর্ম আচরণের জন্য 'ধর্ম-ঘোষণা' (slogan), রথ ও হাতীর শোভাযাত্রা (procession) এবং আতসবাজির খেলা (fire-works) দেখিয়ে দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ভেরীঘোষণা হয়েছে। দীর্ঘকাল যা ঘটে নি, দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ধর্মাচরণের ফলে এখন তা ঘটছে, —জীবের মধ্যে পরস্পর হানাহানি বন্ধ, মানুষের মধ্যে বিরোধ বন্ধ,

---

তত্র একদা অসমাতং লিখিতং, অস দেশং ব সছায় কারণং চ আলোচেপ্তা, লিপিকরাবধেন ব।

১। দেবানং প্রিয়ো পিয়দসি রাজা এবং আহ—দ্বাদসবাসাভিসিতেন ময়া ইদং আঞপিতং, সর্বত বিজিতে মম যুতা চ রাজুকে চ প্রাদেসিকে চ পংচসু পংচসু বাসেষু অনুসংখানং নিয়াতু এতায়েব অথায় ইমায় ধংমানুসস্টিয় যথা অঞায় কংমায়, সাধু মাতরি চ পিতরি চ সুস্রূসা মিতাসংস্তুতঞাতীনং ব্রাহ্মণ-সমনানং সাধু দানং প্রানাণং সাধু অনারংভো। অপব্যয়তা অপভাণ্ডতা সাধু।

যুত = Governor of a subdivision।

রাজুক = Governor of a district।

প্রাদেশিক = Governor of a group of districts।

জ্ঞাতিবন্ধুদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের মধ্যে সম্প্রীতি, মাতা-পিতার প্রতি আনুগত্য এবং অন্যান্য কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে[১]।

জৌগড় অনুশাসন: সব মানুষ আমার সন্তান। আমি যেমন আমার নিজের সন্তানদের ব্যাপারে কামনা করি যে তারা ইহ-জগতে এবং পরজগতে সুখী হোক, তেমনি সব মানুষই সুখী হোক —এই আমার বাসনা। যে প্রান্তদেশগুলি আমার অধীন, সেখানকার মানুষ নিশ্চয় ভাবে, 'কি জানি, আমাদের উপর রাজার মনোভাব কেমন।' আমার এই ইচ্ছা তাদের জানিয়ে দিতে হবে যে রাজা কামনা করেন—সবাই অনুদ্বিগ্ন থাকুক, আশ্বস্ত হোক, আমার অধীনে সুখে থাকুক, তাদের কোন দুঃখ যেন না থাকে[২]।

তাই আমি তোমাদের (মহামাত্রদের) আদেশ দিচ্ছি। এভাবে আমি ঋণমুক্ত হবো। আমার আদেশ ও অভিপ্রায় তোমাদের জানিয়ে দিই, আমি এ ব্যাপারে অবিচল, আমার প্রতিজ্ঞা স্থির। সুতরাং তোমরা এমন কাজ করবে যাতে প্রজারা আশ্বস্ত হয়, আমার উপদেশ বুঝতে পারে। পুত্রের কাছে পিতা যেমন, প্রজাদের কাছে

১। অতিকাতং অন্তরং বহুনি বাসসতানি বঢ়িতো এব প্রাণারংভো বিহিংসা চ ভূতানং ঞাতীসু অসংপ্রতিপতী ব্রাহ্মণ-শ্রমনানং অসংপ্রতীপতী ত অজ দেবানং প্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো ধম্মচরণেন ভেরীঘোসো অহো ধম্মঘোসো বিমানদসনা চ হস্তিদসনা অগিখংধানি চ অঞানি চ দিব্যান রূপানি দসয়িপ্তা জনং যারিসে বহুহি বাসসতেহি ন ভূতপুবে তারিসে অজ বঢ়িতে।

২। সবমুনিসা মে পজা। অথ পজায়ে ইছামি কিং তমে সবের হিতসুখেন যুজেয়তি হিদলোগিক-পাললোকিকেন হেবংমেব মে ইছা সবমুনিসেসু সিয়া অন্তানং অবিজিতানং কিংছন্দেসু লাজা অফেসূতি এতা কার মে ইছা অন্তেষু পাপনেষু লাজা হেবং ইছতি অনুবিগিনা হেয়ু মামিয়ায়ে অস্বসেয়ু চ মে সুখংমেব চ লহেয়ু মম তো ন খ।

রাজাও তেমনি—এই আমার বাণী। রাজা নিজেকে যেমন ভালোবাসেন, প্রজাদেরও আপন সন্তানের মতো ভালোবাসেন।

ষষ্ঠ গিরিলিপি : সমস্ত প্রজার কল্যাণসাধনই আমার কর্তব্য ব'লে মনে করি। এই কর্তব্যের মূল হোল অধ্যবসায় ও মঙ্গল কাজের ইচ্ছা। সবার কল্যাণসাধনের চেয়ে মহৎ কাজ আর নেই। আমি যেন সমস্ত প্রাণীর ঋণ শোধ ক'রে যেতে পারি। আমি চাই সবাই ইহ জগতে সুখী হোক আর পর জগতেও সুখী হোক।

সপ্তম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ গিরিলিপি : দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ইচ্ছা—সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা মিলেমিশে বাস করুক ; তারা সংযম ও চিত্তশুদ্ধি লাভ করুক।......দান শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

...সবাই বিপদ্‌শূন্য হোক ; পাপই একমাত্র বিপদ। ধর্মের অনুশাসনের দ্বারা দাস ও ভৃত্যদের প্রতি সদয় ব্যবহার, মাতা পিতার সেবা, মিত্র ও জ্ঞাতিদের সম্মান, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের উদ্দেশ্যে দান, প্রাণীদের প্রতি অহিংসা—এই সব মহৎ কাজ সম্পন্ন হয়।

বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সৌহার্দ্যস্থাপনে বাক্‌সংযম অতি প্রয়োজনীয়। বাক্‌সংযমের অর্থ হোল—কেবলমাত্র স্বধর্মীকে সম্মান এবং পরমধর্মীকে নিন্দা না করা। এই ব্যাপারে অতি অল্পই ভয়ঙ্কর হ'য়ে দাঁড়ায়। সব ধর্মের সামঞ্জস্যই মহৎ কাজ ; সবাই সবাব ধর্ম শুনুক।...ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহু অধ্যয়ন সম্পন্ন হোক, কল্যাণকর নীতির সঙ্গে যুক্ত হোক[১]।

ধর্মই সবচেয়ে বড়। ধর্ম কি ? পাপহীনতা, দয়া, দান, সত্য ও পবিত্রতা ; এ সবই মানুষকে শুদ্ধ করে।...কর্মের সাফল্যে অনেক

১। তস তস তু ইদং মূলং য বচিগুতী। কিং তি ? আত্তপাসংডপূজা ব পরপাসংডগরহা ব নো ভবে অপকরণম্‌হি লহুকা ব। ত সমবায় এব সাধু। কিং তি ? অংঞমংঞস ধংমং স্রুণারু...। সবপাসংডা বহুস্রুতা চ অসু, কলাণাগমা চ অসু।

বিঘ্ন—ঈর্ষ্যা, অনধ্যবসায়, নিষ্ঠুরতা, লঘুতা, অনুৎসাহ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা।···প্রিয়দর্শী রাজা বলেন, মানুষ আপন সৎকাজ দেখে চিন্তা করে—'আমি এই ভালো কাজ করেছি' ; কিন্তু মানুষ আপন কুকর্মের দিকে দৃষ্টি দেয় না।

রঘুর দিগ্বিজয়

[রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ]

মহাকবি কালিদাসের দুই মহাকাব্যের অন্যতম রঘুবংশ একাধারে ইতিহাস ও ভূগোল। আঠারো সর্গের এই কাব্যে ইক্ষাকুবংশের আঠাশ জন রাজার চরিত বর্ণিত। দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ ও রাম এই প্রধান নৃপতি পঞ্চকের অন্যতম রঘুর নামানুসারে বংশের নাম রঘুবংশ। রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের এক মূল্যবান অংশ উদ্‌ঘাটিত :

মহারাজ দিলীপ যুবরাজ রঘুর হাতে রাজদণ্ড অর্পণ ক'রে সস্ত্রীক বাণপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। মেঘমুক্ত শারদ আকাশে সূর্যের নির্মল কিরণধারার মতো নবীন রাজার যশ দিগ্‌দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ল কিংবদন্তীর মতো ; আখখেতের রাখাল বালিকারাও নবীন রাজার যশোগাথার গান গেয়ে বেড়ায়। সবকিছু দেখে শুনে শত্রুরাজারা প্রমাদ গুণলেন।

তখন শরতের আগমন ঘটেছে ; মেঘশূন্য আকাশ, বারিবর্ষণ থেমে গেছে ; পথ কর্দমশূন্য, শুষ্ক ; শরৎ ঋতুই যেন রঘুকে যুদ্ধযাত্রায় প্ররোচিত করতে লাগল। দিগ্বিজয় যাত্রার প্রারম্ভে 'নীরাজনা' উৎসব শুরু হোল[১]। রঘু ছয় বল ও সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ ক'রে বিচক্ষণ ও কৃতী অমাত্যদের হাতে রাজ্য আর প্রত্যন্ত দুর্গগুলির রক্ষাভার অর্পণ করলেন, তারপর যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ

১। যুদ্ধের প্রস্তুতি-কালে হাতী-ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে বরণ করাই হোল নীরাজনা।

ক'রে দিগ্বিজয় যাত্রা করলেন। রথচক্রের আঘাতে উত্থিত ধূলিজালে আকাশ সমাচ্ছন্ন, রণগজদের বৃংহনে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূরিত হোল। রণবাহিনীর সম্মুখভাগে রঘুর উদ্ধত প্রতাপ, পশ্চাদ্‌ভাগে সৈন্যদের কোলাহল এবং তারও পশ্চাতে রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতিক বাহিনীর চতুরঙ্গ সমারোহ—যেন চতুর্ব্যূহ চমূ।

জয়িষ্ণু রঘু প্রথমে পূর্বসাগরের অভিমুখে অগ্রসর হলেন ; মদমত্ত হাতীরা যেমন পথমধ্যে অবস্থিত বনস্পতিকে উৎপাতিত বা ছিন্নভিন্ন ক'রে আপন পথ পরিষ্কৃত রাখে, রঘুও তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের কাউকে পদচ্যুত, কাউকে উৎপীড়িত আবার কাউকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ক'রে যাত্রাপথ নিষ্কণ্টক করলেন এবং এইভাবে তিনি প্রাচ্যদেশের অনেক রাজ্যই জয় করলেন। অতঃপর বিজিগীষু রাজা তালীবন-শোভিত সমুদ্রের বেলাভূমিতে পৌঁছালেন। অনবনতদের উচ্ছেদ-কারী রঘুর কাছে সুহ্মদেশের নৃপতিরা বৈতসবৃত্তি অবলম্বন ক'রে রক্ষা পেলেন [১]। কিন্তু বঙ্গদেশের রাজন্যবর্গ রণতরী সঙ্গে নিয়ে রঘুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেন। রঘু তাঁদের পরাজিত ক'রে গঙ্গা-স্রোতের মধ্যবর্তী দ্বীপপুঞ্জে বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করলেন[২] ; বঙ্গীয় নৃপতিগণ কলমা ধানের মতো তাঁর দ্বারা উৎখাত হ'য়ে পুনরায় আপন

১। মহাভারতে সুহ্ম দেশ বলতে সমগ্র রাঢ়ভূমিকে বোঝান হয়েছে ; মতান্তরে বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যবর্তী রাজ্যই সুহ্ম। দণ্ডীর মতে দামলিপ্ত বা তাম্রলিপ্ত সুহ্মের রাজধানী। বৈতস-বৃত্তির অর্থ বেতগাছের মতো পরের ইচ্ছায় পরিচালিত হওয়া।

২। বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌ-সাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু॥

সেই সময় বঙ্গদেশ পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল—পুণ্ড্র, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ, সমতট অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ, কর্ণসুবর্ণ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, তাম্রলিপ্ত বা দক্ষিণবঙ্গ এবং কামরূপ অর্থাৎ আসামের অংশবিশেষ।

আপন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন[১] ; তাঁরা প্রচুর ধনসম্পদের উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে মহারাজের পাদপদ্মে আশ্রিত হলেন। তারপর রঘু হাতীর পিঠেপিঠে তৈরী সাঁকোতে কপিশা[২] নদী অতিক্রম ক'রে উড়িষ্যায় পৌঁছালেন এবং সেখান থেকে উৎকলের পথ ধ'রে কলিঙ্গে অভিযান করলেন। উড়িষ্যা থেকে মাদুরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত মহেন্দ্র পর্বতের শিখরে তাঁর আধিপত্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হোল ; কলিঙ্গের রাজা গজবাহিনী সঙ্গে নিয়ে বাধা দিলেন, কিন্তু রঘুর সৈন্যরা অবহেলায় তাঁকে পরাস্ত করলেন। এবার রণক্লান্ত সেনাদল মহেন্দ্র পর্বতের উপর পানশালা নির্মাণ ক'রে শত্রুদের যশের মতো নারিকেলের মদ পানের পাতায় তৈরী ঠোঙা দিয়ে পান করতে লাগলেন[৩] আর নারিকেল-বনে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ ও পানভোজনে মত্ত হলেন। রঘু কলিঙ্গরাজকে বাহুবলে অবরুদ্ধ ক'রে মুক্ত ক'রে দিলেন এবং তাঁর হৃত ধনসম্পদও ফিরিয়ে দিলেন।

এবার দক্ষিণদেশ বিজয়ের পালা। জয়ের আনন্দে মগ্ন রঘুবাহিনী কাবেরী নদীর জলে হাতীদের সঙ্গে জলক্রীড়ায় মেতে উঠল। মলয়-পাহাড়ের উপত্যকায় তারা কয়েক দিন বিশ্রাম করলেন। বিহগ-মুখরিত সেই স্থানে টিয়াপাখিরা লংকাখেতের মধ্যে দলে দলে উড়ে বেড়ায় ; যুদ্ধের ঘোড়াগুলির উৎপাতে এলাচ-লতার বন হোল

১। কলমা ধান জমিতে ছড়ানোর পর চারা জন্মায়। এই গাছ (চারা, বীজ, তোলা প্রভৃতি স্থানীয় নামে পরিচিত) জমি থেকে তুলে চাষের জন্য তৈরী জমিতে পোঁতা হয়। কবি এই উপমাটি ব্যবহারকরেছেন : আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্ / ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুর্ উৎখাত-প্রতিরোপিতাঃ ॥

২। কপিশা নদী বর্ত্তমানে উড়িষ্যার সুবর্ণরেখা অথবা মেদনীপুরের কংসাবতী বা কাঁসাই।

৩। তাম্বূলীনাং দলৈস্তত্র রচিতাপানভূময়ঃ।
নারিকেলাসবং যোধাঃ শাত্রবং চ পপুর্যশঃ ॥

আলোড়িত আর তাদের খুরের আঘাতে এলাচ-ফুলের রেণু হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চতুর্দিকে গন্ধ ছড়িয়ে দিল। মলয় পাহাড়ের উপর বড় বড় চন্দনগাছের গায়ে সাপের বেষ্টনীর ফলে খাঁজ পড়ে গেছে ; সেই সব খাঁজে হাতীদের বন্ধনশৃঙ্খল দৃঢ়ভাবে আটক পড়ল। দক্ষিণায়নে সূর্যের তেজও মন্দীভূত হয়, কিন্তু প্রভাবশালী রাজা রঘু দক্ষিণদেশে অভিযান করলে পাণ্ড্য রাজারা[১] তাঁর তেজ সহ্য করতে সক্ষম হলেন না। মলয় ও দর্দুর পাহাড় যেন দক্ষিণ দিগবধূর দুই স্তন, আর সমুদ্রের কিয়দ্দূরে অবস্থিত সহ্য পর্বত যেন বিগলিতবসনা বসুন্ধরার উন্মুক্ত নিতম্ব। রঘু সেনাবাহিনীর সঙ্গে মলয় ও দর্দুর পর্বতে কিছু-কাল বিহার ক'রে সহ্য পর্বতে পৌঁছালেন ; পার্বত্য নৃপতিদের পরাজিত করার জন্য তাঁর সৈন্যদল সমগ্র প্রদেশ চতুর্দিকে ঘিরে ফেলল।

অতঃপর পশ্চিম দিকে অভিযান শুরু হোল। রঘুর সেনাদলের আগমন সংবাদ শুনে ভয়ার্তা কেরল-রমণীরা সাজসজ্জা ত্যাগ করলেন। মুরলা নদীর তীরে ছাওনি পড়ল ; সেখানে কেয়া ফুলের পরাগ বাতাসে উড়ে এসে পড়তে লাগল সৈন্যদের গায়ে। বড় বড় খেজুর গাছের গুঁড়িতে হাতীগুলি বাঁধা হোল ; তাদের মদজলের গন্ধে মৌমাছিরা পুন্নাগ ফুল ছেড়ে উড়ে এল। রঘু সেখান থেকেই স্থল পথে পারস্য অভিমুখে চললেন। মদ্যপানে আরক্ত যবনীদের মুখপদ্ম তাঁর যেন সহ্য হোল না ; আত্মীয়-পরিজনের প্রাণভয়ে তাদের মদের নেশা চটে গেল[২]। ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতে এল পারস্য-সেনারা।

১। বর্তমানে মাদ্রাজের তিনাভেলি ও মাদুরা। আলেকজাণ্ডারের প্রতিদ্বন্দ্বী পুরু ছিলেন পাণ্ড্য রাজাদের পূর্বপুরুষ।

দিশি মন্দায়তে তেজো দক্ষিণস্যাং রবেরপি।
তস্যামেব রঘোঃ পাণ্ড্যাঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে ॥

২। যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।
বালাতপমিবাব্জানামকাল-জলদোদয়ঃ ॥

উভয় পক্ষের যুদ্ধে ধূলিজালে আকাশ ভরে উঠল ; কিছুই দেখা যায় না, শুধু ধনুকের টংকার জানান দিল কী ভয়ানক সংগ্রাম চলেছে। রঘুর সেনাদের ভল্ল নামে দীর্ঘ বর্শার আঘাতে অনেক পারসিক সেনার মাথা কাটা গেল। তাদের দাড়িভরা মুখ, মাথায় শিরস্ত্রাণ—মনে হোল এক একটি আস্ত মৌচাক। যুদ্ধের অবস্থা দেখে অবশিষ্ট সৈন্যরা শিরস্ত্রান খুলে রঘুর বশ্যতা স্বীকার করলেন। তারপর বিজয়ী সেনারা দ্রাক্ষাবনের মাঝখানে মহামূল্য কার্পেট বিছিয়ে বিজয়ের আনন্দে আঙুরের মদ খেয়ে শ্রম বিনোদন করলেন[১]।

এবার উত্তরাভিমুখে বিজয়-প্রস্থান। কাশ্মীরে পৌঁছে সিন্ধু নদীর তীরে ঘোড়াগুলি একবার গা পালটে নিল ; সারা গায়ে কুঙ্কুম লেগেছিল, কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘোড়ারা সে কুঙ্কুম ঝেড়ে ফেলল। আখ্‌রোট্‌ গাছ যেমন হাতীর পায়ে বাঁধা দড়ির টানে অনায়াসে ধরাশায়ী হয়, তেমনি কম্বোজ-রাজগণও[২] রঘুর পরাক্রম সহ্য করতে না পেরে সহজেই অধীনতা স্বীকার করলেন। তাঁরা অনেক দামী ঘোড়া ও বিপুল ধনসম্পদ উপঢৌকন দিলেন।

তারপর রঘু অশ্বারোহনে এলেন হিমালয়ের পাদদেশে। গুহার ভিতর থেকে সিংহরা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দূর থেকে দেখল সৈন্যদের ছাওনি, যেন বিচলিত হওয়ার কিছুই ঘটে নি। রঘু সেনাদল নিয়ে পুন্নাগ গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন ; সেখানে পাথরের ওপর কস্তূরী হরিণেরা বিশ্রাম নিত, তাই মৃগণাভির গন্ধ জড়িয়ে রয়েছে সেই সব পাথরে। দেবদারু গাছের গায়ে ঘোড়াদের চকচকে শেকল বাঁধা হোল, তার উপর জ্যোতির্লতার উজ্জ্বল আভা বিচ্ছুরিত হ'য়ে রাত্রিবেলায় আলোর কাজ করল। দেবদারুর গায়ে হাতীদের গল-

১। বিনয়ন্তে স্ম তদ্‌যোধা মধুভির্বিজয়শ্রমম্‌।
আস্তীর্ণাজীনরত্নাসু দ্রাক্ষাবলয়ভূমিষু॥

২। কম্বোজ হোল বর্তমান আফগানিস্তানের উত্তরাংশ। প্রাচীন কালে এই দেশের ঘোড়া সুপ্রসিদ্ধ ছিল।

বন্ধনীর ঘর্ষণে দাগ পড়ে গিয়েছিল ; কিরাতারা এসে সেই দাগ দেখে বুঝতে পারত রাজার হাতী কত উঁচু ! হিমালয় অঞ্চলে উৎসব-সঙ্কেত নামে সাতটি রণপ্রিয় পার্বত্য সম্প্রদায় ছিল। নারাচ, ভিন্দি--পাল প্রভৃতি অস্ত্রে দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতিগুলিকে পরাজিত ক'রে রঘু চিরকালের মতো তাদের রণসাধ মিটিয়ে দিলেন। তাঁর বীর্যবত্তা দেখে স্বয়ং কৈলাস পর্বতও যেন লজ্জা পেল। অবশেষে তিনি ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম ক'রে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে বা কামরূপে[১] এলেন। কামরূপ-রাজ বিনা যুদ্ধেই রঘুর কাছে হার স্বীকার করলেন।

একটি কাব্যরচনার পটভূমি

[হর্ষচরিত, দ্বিতীয়-তৃতীয় উচ্ছ্বাস]

চিত্রভানু ও রাজদেবীর পুত্র বাৎস্যায়নবংশীয় বাণভট্ট ছিলেন মহারাজ হর্ষবর্ধনের বিশেষ প্রীতিভাজন। অতি শৈশবেই তাঁর মাতৃ-বিয়োগ হ'লে তিনি পিতার দ্বারা পালিত হন; কিন্তু মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে পিতারও মৃত্যু হোল। বাণের ছিল উদ্দাম প্রকৃতি, উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব, আবার লোকচরিত্র ও সমাজের প্রতি অদম্য কৌতূহল। যৌবনের প্রারম্ভে সংসারের সব টান উপেক্ষা ক'রে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন আনন্দের নেশায়। দীর্ঘ ভ্রমণ এবং বাধাবন্ধহীন অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের ফলে বাণ সমকালীন সমাজ সম্পর্কে বিস্তারিত ও গভীর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন[২]। গৃহে প্রত্যাবর্তনের

১। কামরূপ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষ। মণিপুর, কাছাড়, জয়ন্তী, শ্রীহট্ট ও মৈমনসিংহের অনেক অংশ প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত ছিল।

২। গতে চ বিরলতাং শোকে শনৈঃ শনৈঃ, অবিনয়নিদানতয়া স্বাতন্ত্র্যস্য, কুতূহলবহুলতয়া চ বালভাবস্য, ধৈর্যপ্রতিপক্ষতয়া চ যৌবনারম্ভস্য শৈশবো-চিতানি অনেকানি চপলানি আচরন্নিত্বরো বভূব।

যৌবনের এই অস্থির সময়টিতে কবির সঙ্গে কতো বিচিত্র মানুষের বন্ধুত্ব

পর রাজকুলের বিলাস-আড়ম্বর ও চঞ্চল জীবনস্রোত, আত্মীয়-বন্ধুদের প্রীতি-ভালোবাসা এবং বিদগ্ধ মানুষের সৌহার্দ তাঁর জীবনে এক পরিবর্তন এনে দিল। হর্ষচরিতের প্রারম্ভে লেখক এই ঐতিহাসিক কাব্যরচনার পটভূমি বর্ণনা করেছেন ঃ

একদা গ্রীষ্মের অপরাহ্নে মহারাজ হর্ষের ভ্রাতা কৃষ্ণদেবের প্রেরিত দূত মেখলক বাণভট্টের গৃহে উপস্থিত হলেন। কুশল বিনিময়ের পর মেখলক বাণের হাতে রাজার পত্র তুলে দিলেন। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল 'আপনি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ; তাই আশা করি, সাফল্যের প্রতিবন্ধক দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করবেন। নানা লোকের মুখে নানান কথা শুনে সম্রাট আপনার প্রতি বিরূপ'। তারপর দূত মেখলক স্বয়ং বাণকে বুঝিয়ে বললেন—'আপনার অনুপস্থিতিতে স্বার্থান্বেষী দুর্জনেরা মহারাজের কান ভারী ক'রে তুলেছেন; তারা আপনার শৈশবের কতকগুলি ঘটনাকে ইনিয়েবিনিয়ে মিথ্যা বদনাম রটাচ্ছেন। কাঁচা বয়সে অল্পস্বল্প চাপল্য সকলেরই থাকে। দুর্বিদগ্ধ রাজারা কন্দর্পের মতো; তাঁরা অনেক সময় অবিবেচকের ন্যায় মোহমুগ্ধ হ'য়ে পরকে কষ্ট দেন। তবে আমাদের মহারাজ হর্ষ মহামানব; তিনি বড় আশাবাদী, কখনো মানুষের উপর বিশ্বাস হারান না। আমাদের প্রভুর গুণগ্রাহিতা, ধর্মবুদ্ধি সবই আদর্শস্থানীয়। আপনি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।' বাণ আপন মনে চিন্তা করতে লাগলেন, 'রাজকুলের ব্যাপার গুরুতর! রাজার সেবা ও মনোরঞ্জন অতি কষ্টকর; রাজবাড়ীর সঙ্গে আমাদের কুলপরম্পরাগত বন্ধুত্ব অথবা পারস্পরিক উপকার-প্রত্যুপকারের সম্পর্ক নেই। আমার এমন বিরাট পাণ্ডিত্য নেই, যা দিয়ে মহারাজকে ভোলাব; অথবা এমন দর্শনধারী নই যে

হয়েছিল—'ভাষাকবি' ঈশান, 'বর্ণকবি' বেণীভারত, প্রাকৃতকৃৎ বায়ুবিকার, সাপুড়ে ময়ূরক, লেখক গোবিন্দক, মৃদঙ্গনিপুণ জীমূত, গণিকা কুরঙ্গিকা, নাট্যাচার্য দর্দুরক, নর্তকী হরিণিকা, অভিনেতা শিখণ্ডক, বংশী-বাদক মধুকর ও পারাবত, কাপালিক করাল, যাদুকর চকোরাক্ষ প্রভৃতি আরো অনেকে।

সুন্দর মুখ দিয়ে জয় ক'রে আসব। তবে খুব বেশী চিন্তা না ক'রে অন্ততঃ একবার যাওয়া প্রয়োজন।'

পরদিন তিনি রমণীয় বেশভূষায় সজ্জিত হ'য়ে গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে আপন গ্রাম প্রীতিকূট থেকে যাত্রা শুরু করলেন। প্রথম দিন মল্লকূট গ্রামে এক প্রিয় বন্ধুর বাড়ীতে রাত্রিবাস, পরদিন অজিরবতী নদীর তীরে মণিতারা জনপদে পৌঁছালেন; সেখানেই হর্ষবর্ধনের প্রাসাদশিবির। বাণ সেখানে দেখতে পেলেন হস্তি-অশ্ব-উষ্ট্র-বাহিনীর সমারোহ, রণসাজে সজ্জিত অগণিত সেনা। এগিয়ে আসতে আসতে রাজদ্বারের ঐশ্বর্য-আড়ম্বরে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে গেল—সেখানে অসংখ্য মানুষ, সামন্তরাজা থেকে আরম্ভ ক'রে অতিদূর গাঁয়ের সাধারণ লোক; আবার বৌদ্ধ, জৈন, পাশুপত, ব্রহ্মচারী, জানপদ, ম্লেচ্ছ ও গুপ্তচরেরাও রয়েছেন; সবাই রাজার দর্শনপ্রার্থী। এই দৃশ্য দেখে লেখকের হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হোল। দ্বারপাল দূর থেকেই মেখলককে চিনতে পেরেছিলেন। বাণকে অপেক্ষা করতে বলে মেখলক অন্দরে প্রবেশ করলেন; কিছুক্ষণ পর মহারাজের পারিযাত্র এসে লেখককে সাদরে অভ্যন্তরে নিয়ে চলল। তিনি দেখতে দেখতে চলেছেন—মহারাজের মন্দুরায় বনায়ু, আরট্ট, কম্বোজ প্রভৃতি দেশের নানা বর্ণের নানা আকৃতির বিস্ময়জাগানো ঘোড়ার দল; তারপর হস্তিশালা; এইভাবে পরপর তিনটি কক্ষ অতিক্রম ক'রে ভুক্তাস্থানমণ্ডপে তিনি হর্ষকে দেখলেন; মহারাজ পালঙ্কের উপর সুখাসীন; তাঁর চতুর্দিকে মহানুভব ব্যক্তিরা আর সেবার জন্য দণ্ডায়মান বারবিলাসিনীরা রয়েছেন। তিনি আরও দেখলেন সেবারতা এক বিলাসিনীর ঘর্মাক্ত কম্পিত হাত থেকে মহারাজের চরণ যেই মুক্ত হয়েছে, অমনি হর্ষদেব মধুর হেসে বীণাদণ্ড দিয়ে তার মাথায় মৃদু আঘাত করলেন। তারপর বাণ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে ডান হাত তুলে 'স্বস্তি' উচ্চারণ করলেন। হর্ষ দৌবারিককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনিই কি

সেই বাণভট্ট ?' দৌবারিক মাথা নাড়লেন। হর্ষ যেন কিছুটা বিরক্ত হয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তাঁর পাশ্ববর্তী মালবরাজপুত্রকে বললেন, 'ইনি একটি মহাভুজঙ্গ'।

মহারাজের এই রূঢ় ভৎর্সনার অর্থ বাণের বোধগম্য হোল না। সবিনয়ে তিনি বললেন, 'মহারাজ, আমার মনে হয় আপনি আমার বিষয়ে ঠিকঠিক জানেন না। আপনার বুদ্ধি হয়ত অন্য কারো উপরে নির্ভরশীল। জনশ্রুতির মতো মানুষের বিবেকও আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে চালিত হয়। লোকবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আপনি হয়ত তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেন না। কিন্তু মহামানবেরা যথার্থদর্শী হন। আমাকে একেবারে তুচ্ছ ভাবা আপনার পক্ষে শোভা পায় না। আপনার রাজ্যে যথেচ্ছাচার ক'রে বেড়াবে এমন সাহস কার ? তাছাড়া আমি বাৎস্যায়নবংশের শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, বেদ-পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র যথাবিধি অধ্যয়ন করেছি ; বিবাহের পর আদর্শ গৃহীর জীবনও যাপন করেছি। পরবর্তী কালে আমার মধ্যে কিঞ্চিৎ উচ্ছৃঙ্খলতা হয়ত এসেছিল, কিন্তু তাই বলে আদর্শচ্যুতি ঘটে নি। আমার মধ্যে ভুজঙ্গবৃত্তি কোথায় দেখলেন ? আপনার তিরস্কার আমার যথাযোগ্য প্রাপ্য নয়। আপনি ভগবান বুদ্ধের মতো শান্তচিত্ত, মনুর মতো বর্ণাশ্রমের রক্ষাকর্তা, যমের মতো ন্যায়-অন্যায়ের শাসক। বুদ্ধিমান ব্যক্তি একজনের মুখে কোন মন্তব্য শুনেই কারো চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করেন না।' একথা বলে বাণভট্ট নীরব হলেন। হর্ষ বললেন, 'আমি তো তেমন কথাই শুনে ছিলাম ; তবু আপনার প্রতি আতিথেয়তার কার্পণ্য করি নি। আচ্ছা, আপনার এসব কথা ভবিষ্যতে মনে থাকবে।' এই বলে তিনি প্রসন্নদৃষ্টিতে কবির দিকে তাকালেন ; মহারাজের অমৃতদৃষ্টিতে বাণের অন্তরাত্মা প্রীতি-রসে আর্দ্র হোল। সেদিনের মতো আলাপের প্রথম পর্ব সেখানেই শেষ। সূর্য অস্তাচলে আরোহন করল ; রাজাদের বিদায় জানিয়ে হর্ষদেব অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

বাণ স্বগৃহে ফিরে মনে মনে চিন্তা করলেন, 'মহারাজ স্বভাবতই উদার প্রকৃতির। আমার কৈশোর কালের নিন্দা-অপবাদের জন্য ঈষৎ কুপিত হলেও অন্তরে অত্যন্ত স্নেহ করেন। রাজা হর্ষ আমার মধ্যে এক গুণী মানুষকে আবিষ্কার করতে চান, তাঁর শীতল অভ্যর্থনায় হয়ত এই ইঙ্গিতই ধ্বনিত! যাই হোক, এর পর আমি এমন আচরণ করব, যার ফলে মহারাজ আমার যথার্থ পরিচয় পান।' তারপর তিনি কিছুদিন বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতেই কাটালেন। পুনরায় রাজভবন থেকে তাঁর আহ্বান এল। তিনি সানন্দে রাজগৃহে আসর জমালেন এবং অল্পকালের মধ্যেই সম্রাট হর্ষের প্রেম, বিশ্বাস, সম্পদ, পরিহাস ও সম্মানের পরাকাষ্ঠা লাভ করলেন।

তখন শরৎকাল। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের দর্শনোৎকণ্ঠায় বাণের হৃদয় আকুল। তিনি আবার প্রীতিকূটে ফিরে এলেন। কবি মহারাজের পার্শ্ববর্তী বেত্রাসন অলংকৃত করেছেন, তাই সবাই খুব খুশী। পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের পর বাণ স্নানভোজন সেরে বিশ্রাম করছেন; সবাই তাঁকে ঘিরে বসল। তারপর সুদৃষ্টি নামে পুস্তকবাচক ধীরে ধীরে প্রবেশ ক'রে বেতের কেদারায় আসন গ্রহণ করলেন; তাঁর হাতে বায়ুপুরাণ। তিনি কাঠের ফলকের উপর বইটি রেখে তার সুতাটি টেনে খুললেন, তারপর চিহ্নদেওয়া পাতাটি খুলে সুর ক'রে পড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে শোনা গেল মহারাজের চারণ অনতিদূরে স্তুতিশ্লোক গেয়ে চলেছেন। বাণের অনুজ শ্যামলভট্ট বললেন, 'দাদা, আমাদের বহুদিনের ইচ্ছা তোমার মুখে প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যকীর্তি হর্ষদেবের জীবনচরিত শুনি। ইতিহাস ও পুরাণে বলে যে রাজাদের চরিত্রে কোন না কোন কলঙ্ক থাকে; কিন্তু আমাদের মহারাজ হর্ষ নিষ্কলঙ্ক, তাই সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তাঁর কথা শুনে বাণভট্ট মৃদু হেসে সভাস্থ সকলের কাছে সবিনয়ে তাঁর অক্ষমতা জানালেন। পরের দিন আবার সভা বসল। এবার তিনি সকলের এই আন্তরিক

অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। কিন্তু ভণিতায় জানিয়ে দিলেন হর্ষবর্ধনের পূর্ণ জীবনী রচনা তাঁর অভিপ্রেত নয়।

মহারাজ হর্ষের দিগ্বিজয় যাত্রা

[হর্ষচরিত, ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস]

বস্তুসংক্ষেপ—থাণেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর দিগ্বিজয়ী রাজ্যবর্ধন হূণদের পরাজিত ক'রে বিক্ষত দেহে রাজধানীতে ফিরেছেন। পিতার মৃত্যুতে অভিভূত তিনি অবশেষে সংসার ত্যাগের সংকল্প নিলেন; তা শুনে অনুজ হর্ষ হতবাক। এমন সময় দূত সংবাহক এসে জানাল মালবরাজের হাতে রাজ্যশ্রীর স্বামী নিহত, রাজ্যশ্রী বন্দিনী আর থাণেশ্বর অবরোধের সম্ভাবনা। তৎক্ষণাৎ রাজ্যবর্ধন সব কিছু ভুলে মালবরাজকে সায়েস্তা করতে ছুটলেন। কিছুদিন পর অশ্বারোহী কুন্তল দুঃসংবাদ বহন ক'রে রাজধানীতে ফিরে এলেন; তিনি সবিস্তারে জানালেন কেমন ক'রে গৌড়রাজার হাতে রাজ্যবর্ধন নিহত হয়েছেন[১]। সেনাপতি সিংহনাদ ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হর্ষকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। সামন্ত রাজাদের কাছে হর্ষের আদেশ পাঠানো হোল, হস্তিবাহিনীর প্রধান স্কন্দগুপ্ত সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করতে লাগলেন ঃ

প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুর পব···অশৌচের দিনগুলি গত হোল, মহারাজের ব্যবহৃত সামগ্রীসমূহ শয়ন, আসন, চামর, ছত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে দান করা হোল; তাঁর অস্থির সঙ্গে প্রজাদের

১। বাণভট্ট রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মার এবং রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারীর নাম উল্লেখ করেননি। যথাক্রমে জনৈক মালবরাজ এবং জনৈক গৌড়রাজ বলেই তাঁরা উল্লিখিত। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী 'নরেন্দ্রগুপ্ত' এই নামে কথিত, হিউয়েন সাঙের বিবরণ অনুসারে ইনি হলেন কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক (She Shang-Kia)

হৃদয়গুলিও যেন তীর্থে উপনীত। ···ধীরে ধীরে শোকের আর্তনাদ কমে এল; বিলাপধ্বনি ক্ষীণ, অশ্রুধারা বিরত, দীর্ঘশ্বাস শিথিল, হাহাকার অস্পষ্ট হ'য়ে এল। কান উপদেশ শোনার যোগ্য হোল, হৃদয় অনুরোধে অবধান দিতে সমর্থ হোল; কবিরা শোকগাথা রচনা করলেন, মহারাজের দর্শন শুধু স্বপ্নেই সম্ভব থাকল, তাঁর আকৃতি বেঁচে রইল চিত্রে, নাম রইল কাব্যে; তখন একদিন রাজা হর্ষ কাজকর্ম ছেড়ে চুপচাপ বসে আছেন; বৃদ্ধ বন্ধুরা, মৌন মহাজনেরা এবং মুখ্য অমাত্যেরা তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। এমন সময় প্রতিহারীকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেখে হর্ষ কম্পিতহৃদয়ে দূর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর্য, দাদা কি ফিরেছেন?' তিনি ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, তিনি দ্বারে।' তাই শুনে সহোদরের প্রতি ভালোবাসার টানে পিতৃ-শোকের গভীর দুঃখে উদ্বিগ্নহৃদয় কুমারের চোখ দিয়ে অশ্রুপ্রবাহ বহে গেল; কোনমতে প্রাণটি দেহছাড়া হোল না।

হর্ষ রাজ্যবর্ধনকে দেখতে পেলেন; যেই তিনি দ্বারপালকে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে এসেছেন, অমনি পরিজনদের আর্তনাদে তাঁর (রাজ্যবর্ধনের) আগমন জ্ঞাপিত হোল। বহুদূর থেকে দ্রুতগতিতে আসছেন, তাই রাজকীয় বাহুল্য নেই, ছত্রধারীরা পিছনে পড়ে; পরিচ্ছদবাহীরা কোথায় রইল কে জানে; ভৃঙ্গারধারীরা অনেক দূরে; খড়্গাগ্রাহীরা খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিছনে আসছে।···ধূলি-ধূসরিত দেহ রাজ্যবর্ধনের, অশরণা বসুন্ধরা বুঝি তাঁর শরণ নিল; হূণদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তিনি তাদের হারিয়ে দিয়েছেন, তাই সারা দেহে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন, আর সেগুলি সাদা পটি দিয়ে বাঁধা—যেন সমাগতা রাজলক্ষ্মীর কটাক্ষপাত! তাঁর মাথায় চূড়ামণির অলংকার নেই, চুলগুলি মলিন, অবিন্যস্ত, যেন দুঃখের প্রতিমূর্তি! রৌদ্রতাপে নির্গত স্বেদবিন্দুগুলি যেন দুঃখের অশ্রুপ্রবাহ; অনবরত কান্নায় গালদুটি বিবর্ণ; উষ্ণ শ্বাসে ঠোঁটদুটি মলিন! কিছুক্ষণ আগেই

পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনে কানদুটি যেন দগ্ধ হ'য়ে গেছে ; পিতার মৃত্যুতে তিনি খুব বিহ্বল ও নিরাশ্রয় হ'য়ে পড়েছেন—যেমন পর্বত থেকে অবতরণকালে পতিত সিংহ ভীত ও নিরাশ্রয় হ'য়ে যায়। নন্দনবনের কল্পবৃক্ষ ভগ্ন হওয়াতে তিনি বুঝি ছায়ার আশ্রয় থেকে বঞ্চিত! রাজ্যবর্ধন যেন কৃশতার ক্রীতদাস, কারুণ্যের কিংকর, দৌর্মনস্যের দাস, শোকের শিষ্য ; মানসিক পীড়ায় অন্ধ, মৌনতায় মূক, দুঃখে পিষ্ট, সন্তাপে খিন্ন, চিন্তায় অবরুদ্ধ, শোকে বিলুপ্ত। বৈরাগ্য তাঁকে যেন ধারণ করেছে, বুদ্ধি তাঁকে পরিত্যাগ করেছে, প্রজ্ঞা তাঁকে অবজ্ঞা করেছে ; তিনি পণ্ডিত বুদ্ধির অবোধ্য, গুরুজন-বাক্যের অগম্য, শাস্ত্রের অযোগ্য, সৎ অনুরোধের আগোচর—এমন শোককবলিত জ্যেষ্ঠকে দেখতে পেলেন হর্ষ।

রাজ্যবর্ধনও দূর থেকে হর্ষকে দেখেছিলেন ; কাছে এসে পুঞ্জীভূত বাষ্পাবেগ রোধ করতে পারলেন না ; দুঃখপরম্পরা চিন্তা করতে করতে দীর্ঘ প্রসারিত বাহুদণ্ড দিয়ে গলায় জড়িয়ে ধরলেন ভাইকে ; বুক থেকে খসে পড়ল ক্ষৌমবাস ; তিনি মুক্তকণ্ঠে রোদন ক'রে উঠলেন। শিরার মতো অশ্রুস্রোতের ধারা বহে গেল! রাজ্যবর্ধনের কান্না প্রজাদের মনে করিয়ে দিল প্রভাকরবর্ধনের কথা ; তারাও ডুক্‌রে কেঁদে উঠল! নেত্রজলের ধারা শরতের মেঘের মতো ক্ষণকাল বর্ষণের পর আপনা থেকেই রুদ্ধ হ'য়ে এল। রাজ্যবর্ধন আসন গ্রহণ করলেন ; তারপর পরিজনেরা জল নিয়ে এল, তাই দিয়ে তিনি চোখ ধুয়ে নিলেন ; তাম্বূলিক চাঁদের মতো একখণ্ড সাদা কাপড় নিয়ে এল, তিনি উষ্ণ বাষ্পে দগ্ধ মুখ মার্জন করলেন ; তারপর বহুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন ; অবশেষে উঠে দাঁড়ালেন এবং স্নান-ভূমিতে গেলেন। তখন তাঁর মাথায় রাজ-আভরণ ছিল না ; এলোমেলো চুল কোন প্রকারে মুছে নিলেন।…এবার তিনি প্রবেশ করলেন চতুঃশাল-বিতর্দিকায় ; তারপর এক পালঙ্কে নিঃশব্দে বসে পড়লেন।

সেই ঘরে মেঝেতে এক রঙীন কম্বল পাতা ছিল। রাজকুমার হর্ষ সাধারণভাবে স্নান সেরে অনতিদূরে সেই কম্বলে বসলেন; দাদাকে দেখে তার মন বেদনায় আবিল হ'য়ে উঠল। দুঃখে ভেঙে পড়েছেন রাজ্যবর্ধন; হর্ষ তাঁকে যতই দেখতে লাগলেন, ততই তার হৃদয় শোকে মলিন হ'তে লাগল। সত্যিই সহোদর ভাইকে দেখলে পিতৃবিয়োগের দুঃখ উদ্বেল হ'য়ে উঠে! প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুদিনের চেয়েও এ'দিনটি প্রজাদের কাছে নিদারুণ। সমগ্র রাজধানীতে আজ অরন্ধন; সবাই অস্নাত, অভুক্ত, ঘরে ঘরে সকলে চোখের জল ফেলতে লাগলো। এইভাবে সেই দিনটি কাটল।

এরই মধ্যে প্রধান সামন্তরা এসে উপস্থিত; তারা রাজ্যবর্ধনকে অনেক ক'রে বোঝালেন। তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না, তাই তিনি সামান্য ভোজন ক'রে হর্ষকে বললেন, 'দাদাভাই, তুমি মহৎ আদেশ গ্রহণ করার উপযুক্ত; গুণবান মানুষের জয়-পতাকার মতো তুমিও শিশুকাল থেকে পিতার সমস্ত সদিচ্ছা যথাযথ গ্রহণ ক'রে এসেছ। আমার হৃদয় আসক্তিহীন, দৈবের বিধানেই এ' অবস্থা বুঝি উপস্থিত! তাই কি করলে তোমার ভাল হয়, সংক্ষেপে তাই বলব। কিন্তু সব শুনে আমায় যেন নির্বোধ ভেবো না; শোনো, তুমি লোক-ব্যবহার ঠিকমতো জানো না। মহাবীর মান্ধাতার মৃত্যুর পর পুরুকুৎস কি না করেছিলেন! যে দিলীপ চোখের ইঙ্গিতে আঠারো দ্বীপ শাসন করতেন, তাঁর মৃত্যুর পর রঘু কি না করেছিলেন? ...যে মানুষ শোকে অভিভূত হয়, পণ্ডিতেরা তাকে কাপুরুষ বলেন। ধৈর্যহীন হ'য়ে শোককরা স্ত্রীজাতির শোভা পায়! কিন্তু কি করি! পিতার শোকে আমার এই নারীসুলভ ব্যবহার যেন কতো স্বাভাবিক! পিতৃবিয়োগের পর আমার প্রজ্ঞালোক বিনষ্ট, হৃদয় প্রজ্বলিত; স্বপ্নেও বিবেকের উদয় হয় না; মতি পদে পদে মূর্ছিত, স্মৃতি দূর থেকে পরিহৃত, বিবেক অস্তমিত; সুদখোর বণিকের সম্পদের ন্যায় দুঃখ দিনে দিনে বর্ধিত হচ্ছে; রাজ্য বিষের

স্থায় বিরক্তিকর বোধ হচ্ছে।···পুরু যেমন পিতার আদেশে যৌবনসুখ পরিত্যাগ ক'রে জরা গ্রহণ করেছিলেন, তুমিও তেমনি আমার কাছ থেকে রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করো। আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করছি'।—এই ব'লে রাজ্যবর্ধন খড়্গধারীর হাত থেকে তরোয়াল নিয়ে মাটিতে নামিয়ে রাখলেন।

অগ্রজের কথা শুনে হর্ষের হৃদয় বিদীর্ণ হোল। তিনি ভাবলেন, 'তবে কি, আমার অনুপস্থিতিতে কোন কুটিল ব্যক্তি দাদার কানে এমন কিছু বলেছেন, যে কারণে তিনি রুষ্ট; অথবা তিনি আমায় যাচাই ক'রে নিতে চান? অথবা পিতার শোকে এমনই অচেতন ও বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি যে, উনি যা বললেন—ঠিক তার উল্টো কথা শুনলাম! আমার উপর এই আদেশদানের অর্থ ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সুরাপান করতে বলা, পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলা, সজ্জনকে চাটুকারিতা করতে বলা, সাধ্বী স্ত্রীকে ব্যভিচার করতে বলা! আমি জানি নিরভিমান প্রভু, নির্লোভ ব্রাহ্মণ, ক্রোধহীন মুনি, চপলতাহীন বাঁদর, ঈর্ষ্যাশূন্য কবি, অচোর বণিক্, প্রিয় অথচ ছলনাহীন স্বামী, দারিদ্র্যহীন সজ্জন, অকুটিল ধনী, অহিংসুক পামর, অহিংসক শিকারী, পরিতুষ্ট সেবক, কৃতজ্ঞ ধূর্ত, নির্লোভ সন্ন্যাসী, সত্যবাদী রাজনীতিবিদ্, বিনীত রাজপুত্র—এরা দুর্লভ। কিন্তু আমার অগ্রজের সঙ্গে এদের কারো তুলনাই হয় না; অথচ এমন অনুচিত ব্যাপার তিনি কেমন ক'রে ভাবলেন?··· মহানুভব ব্যক্তিরা তো কখনো সাহস হারান না। কিম্বা এত সব বিকল্প চিন্তায় কি প্রয়োজন? আমিও নিঃশব্দে দাদার সঙ্গে বনবাসে যাব।' এরূপ চিন্তা করতে করতে হর্ষ মুখ নীচু ক'রে বসে পড়লেন।

যখন রাজ্যবর্ধন তপোবন গমনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তাঁর আদেশমত বস্ত্রকর্মান্তিক কাঁদতে কাঁদতে বল্কলবাস নিয়ে উপস্থিত হোল; নগরসুন্দরীরা রোদন ক'রে উঠলেন; ব্রাহ্মণেরা বিলাপ করতে লাগলেন 'একি অমঙ্গল!' পৌরবৃন্দ কাঁদতে কাঁদতে পায়ের

উপর লুটিয়ে পড়লেন। এমন সময় সংবাদক নামে রাজ্যশ্রীর এক প্রিয় পরিচারক ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হোল ; শোকে দুঃখে সে অতি বিষণ্ণ, চোখে অশ্রুধারা !

রাজ্যবর্ধন ও হর্ষ উভয়েই কেমন বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়লেন। রাজ্যবর্ধন নিজেই তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'অচঞ্চল নির্মম বিধাতা কি পিতার মৃত্যুতে তুষ্ট হ'য়ে আমাদের আরও ধৈর্য্যহারা ক'রে তোলার জন্য পূর্বাপেক্ষা গভীর দুঃখ উপস্থাপিত করতে চান ?' তারপর সংবাদবাহক কোনমতে ব'লে গেল, 'মহারাজ, নীচ লোকেরা কেবলই পরের ছিদ্র খুঁজতে থাকে, তারা সুযোগ পেলেই আঘাত করে। প্রভাকরবর্ধন গত হয়েছেন—এই সংবাদ যেদিন প্রচারিত হোল, সেদিনই দুরাত্মা মালবরাজ গ্রহবর্মাকে তার সুকৃতের সঙ্গে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং রাজকন্যা রাজ্যশ্রীকে চোর-কয়েদীর মতো কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে কান্যকুব্জের কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। আপনার সেনাবাহিনী সেনাপতিহীন —এই গুজবকে সত্যি ভেবে দুর্মতি মালবরাজ আপনাকে হত্যার পরিকল্পনা করে থাণেশ্বর অভিযান করতে মনস্থ করেছেন।'

অসম্ভাবিত এবং আকস্মিক এই বিপদের সংবাদ শুনে রাজ্যবর্ধনের শোকাবেগ মুহূর্তমধ্যে অপনীত হোল। গিরিগুহাতে সিংহের আকস্মিক প্রবেশের মতো তাঁর হৃদয়ে ভয়ঙ্কর কোপ জেগে উঠল ; ললাটে দেখা দিল যমুনার নীল জলের মতো ভীষণ ভ্রূকুটি। ···শোকবিষের মোহে সুপ্ত অনুজকে জাগিয়ে বললেন, 'ভাই, রাজার ভুজঅর্গলে পালিত এই রাজকুল, ওই সব বন্ধু, এই পরিজন, এই দেশ, এই প্রজারা—সবাই রইল। আমি আজই মালবরাজের বংশ ধ্বংস করার জন্য যাত্রা করছি। অবিনীত শত্রুকে দমন করাই হবে আমার বল্কল, আমার তপস্যা। ··মালবরাজারা পুষ্যভূতি বংশের অপমান করবে ? ভেক কেউটে সাপের ফণায় আঘাত করবে ? বাছুর বাঘকে বন্দী করবে ? ঢোঁড়া সাপ গরুড়ের গর্দান নেবে ? অন্ধকার

সূর্যকে তিরস্কার করবে? প্রচণ্ড ক্রোধে আমার অন্তরের দুঃখতাপ দূর হ'য়ে গেছে! সামন্ত রাজারা এবং হস্তিবাহিনী তোমার কাছে থাক; সেনাপতি ভণ্ডী একাকী দশ হাজার অশ্বারোহী সেনা নিয়ে আমার সঙ্গে যাবে।'

অগ্রজের আদেশ শুনে হর্ষ বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে গেলে এমন কি দোষ হয়? অল্পবয়স্ক হলেও একেবারে পরিত্যাগের যোগ্য নই। অনুজ বলেই যদি রক্ষণীয় হই, তবে আর্যের ভুজপঞ্জরই আত্মরক্ষার স্থান; আর যদি মনে করেন যুদ্ধযাত্রায় অসমর্থ, তাহলে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি; যদি মনে করেন পথের ক্লেশ সহ্য করতে পারবো না, তাহলে আমি বলবো আপনি আমাকে নারীর মতো কাপুরুষ ভাবেন। যদি মনে করেন হর্ষ এখানে সুখে থাকুক, তাহলে বলবো—আমার সুখ তো আপনারই সঙ্গে সঙ্গে গমন করছে। একই সময়ে উভয়ের রাজ্যত্যাগ উচিত নয় জানি, তবুও আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন; আপনার অনুগ্রহ থেকে পূর্বে কখোনো বঞ্চিত হইনি। সুতরাং আপনি প্রসন্ন হোন, আমাকে সঙ্গে নিন'—এই বলে হর্ষ অগ্রজের পায়ে মাথা নোয়ালেন।

হর্ষকে চরণতল থেকে উঠিয়ে রাজ্যবর্ধন বললেন, 'ভাই, যে শত্রু অতি লঘু, তার উপর এত গুরুত্ব দিতে চাইছ কেন? একটা হরিণকে হত্যা করতে একদল সিংহ এগিয়ে যাবে? এ অতি লজ্জাকর! পরাক্রম প্রদর্শনের জন্য অষ্টাদশদ্বীপ-কঙ্কণমালিনী পৃথিবী রইল।...শত্রুকে বিনাশ করার জন্য আজ আমার দুর্নিবার ক্ষুধা; তাই ক্ষুব্ধ আমাকে তুমি ভুল বুঝো না; তুমি যাত্রা বন্ধ কর।' এই বলে রাজ্যবর্ধন সেই দিনেই শত্রুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

পিতা, মাতা, ভগ্নিপতি সকলেই মৃত, বোন কারাগারে বন্দিনী, এই অবস্থায় হর্ষ যূথভ্রষ্ট বন্য হস্তীর মতো একাকী কোনক্রমে সময় কাটাতে লাগলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হ'লে অগ্রজের প্রবাস-

ব্যথায় বিনিদ্র হর্ষ এক রাত্রির শেষলগ্নে যামিকের কণ্ঠে গীয়মান সংগীত শুনতে পেলেন :

সর্ব দ্বীপে গুণগ্রাম প্রশংসিত যার,
মহামূল্য রত্নসার হয়েছে ভাণ্ডার ;—
সে পুরুষও ধ্বংস লভে বিধির বিধান বলে,
বায়ুবেগে পোত যথা ডুবে সাগরের জলে !

গান শুনে সংসারের অনিত্যচিন্তায় তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল। তিনি স্বপ্ন দেখলেন 'এক আকাশচুম্বী লৌহস্তম্ভ ভেঙ্গে পড়ছে !' হর্ষের হৃদয় কেঁপে উঠল ; হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল ! তিনি ভাবতে লাগলেন, 'তুঃস্বপ্নগুলো আমায় এমন উত্যক্ত করছে কেন ? অমঙ্গল-সূচনায় বাঁ চোখ দিনরাত নাচছে ! দিগ্‌দাহের ভস্মকণার মতো তারাগুলো আকাশ থেকে খসে খসে পড়ছে ; নক্ষত্রপতনের তুঃখে চাঁদ বুঝি মলিন হ'য়ে গেছে ! আবার প্রতিরাত্রে উল্কাগুলো জ্বলে ওঠে, যেন গ্রহযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে ! শুভলগ্নের কোন সূচনাই দেখছি না ! সর্বতোভাবে অগ্রজের মঙ্গল হোক।' এরূপ চিন্তা করতে করতে ভ্রাতৃস্নেহে কাতর ও দ্রবীভূত চিত্তকে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত ক'রে হর্ষবর্ধন শয্যা ত্যাগ করলেন এবং নিত্যকর্ম সম্পাদন করতে লাগলেন।

আস্থানমণ্ডপে প্রবেশ করতে গিয়ে হর্ষ অগ্রজের অনুগ্রহভাজন এবং নিজের অতি পরিচিত কুন্তল নামে প্রধান অশ্বারোহীকে আগমন করতে দেখলেন ; তাকে অনুসরণ করছে বিষণ্ণমুখ কতিপয় সৈনিক ! অসহনীয় তুঃখের উষ্ণ নিশ্বাসে মলিন রক্তবস্ত্র দিয়ে কুন্তলের সর্বাঙ্গ যেন আবৃত ; প্রাণধারণের লজ্জায় তার মুখখানি বুঝি অবনত ; মুখে দীর্ঘ শ্বাস, হৃদয়ে অগ্নি-প্রবাহ, অযত্নসঞ্চিত শ্মশ্রু ! তার কাছে হর্ষ শুনলেন রাজ্যবর্ধন কেমন ক'রে মালবরাজের সেনাবাহিনীকে অবহেলায় পরাজিত করেছিলেন ; কিন্তু গৌড়ের রাজা মিথ্যা সৌজন্যে তাঁর বিশ্বাস জন্মিয়ে স্বভবনে তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে বিশ্রব্ধ ও নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করেন।

সংবাদ শুনেই মহাতেজস্বী হর্ষের কোপাবেগ সহসা প্রচণ্ড আগুনের ন্যায় দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল। মাথার শিখামণিগুলি ভীষণ ক্রোধবেগে থরথর কাঁপতে লাগল; আর সেগুলি থেকে টুকরো টুকরো আলো জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো দিকেদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল—যেন রোষের অগ্নি-উদ্গার! কোপানলের চেয়েও অধিক তাপদায়ক তার শৌর্য এমন প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল যে দেহে বর্ষার জলের মতো স্বেদবিন্দু দেখা দিল! হর্ষ নিজেও নিজের এমন ভয়ানক ক্রোধ দেখেন নি; তাই ভয়ে সারা দেহ কম্পমান—এ যেন শিবের ভৈরবরূপ, বিষ্ণুর নরসিংহমূর্তি, যেন সূর্যকান্তমণির তেজঃপুঞ্জ জ্বলছে, অথবা প্রলয়দিবসে দ্বাদশ সূর্যের দুর্নিরীক্ষ্য তেজ। তিনি যেন ভীমের মতো শত্রুর রক্তপানে তৃষ্ণালু, অথবা স্বয়ং মূর্তিমান পরাক্রম! হর্ষের স্বভাবে আজ বুঝি মদের উন্মত্ততা, গর্বের আবেগ, যৌবনের উগ্র তেজ, দর্পের সহস্র উদ্যম, যুদ্ধরসের রাজ্যাভিষেক, অসহনশীলতার নীরাজনা! তিনি বলে উঠলেন, 'অধম গৌড়রাজ ছাড়া এমন কাজ আর কে করতে পারে! যিনি ছলনাহীন পরাক্রমে সমস্ত নৃপতিদের পরাজিত করেছিলেন, তেমন দ্রোণাচার্যকেও ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্বলোকবিগর্হিত উপায়ে নিধন করেছিলেন! কিন্তু গৌড়াধিপ জানে না কি দুর্গতি তার জন্য অপেক্ষা করছে, কোন্ জন্ম সে লাভ করবে, কোন্ নরকে গমন করবে! কোন নরাধমও এমন হীন কাজ করতে পারে না! সেই পাপীর নাম উচ্চারণ করলেও আমার জিভ পাপে লিপ্ত হবে। সকলেব প্রিয় আমার অগ্রজকে যে নিজের ঘরে নিমন্ত্রণ ক'রে হত্যা করল সে তো ঘৃণারও অযোগ্য! সেই মূর্খ জানে না যে মধুর লোভে রাজ্যবর্ধনের মধুময় জীবনকে চুষে খেতে গেলে তার উপর সহস্র বাণের আঘাত নেমে আসবে। সেই গৌড়াধম আপন দোষে কলঙ্কময় নিন্দার ভাগী হোল! দুষ্ট হাতীকে বিনয় শিক্ষা দেয় অঙ্কুশ, সেই অঙ্কুশ যদি হারিয়ে যায়, তাহলে তার কুম্ভবিদারী

সিংহের নখর তো রয়েছে। মূঢ় গৌড়রাজ এখন কি ক'রে ছাড় পাবে ?'

হর্ষবর্ধন যখন এমনি ক'রে আস্ফালন করছেন তখন সেনাপতি সিংহনাদ এসে উপস্থিত হলেন। তিনি প্রভাকরবর্ধনের পরম মিত্র ছিলেন। তাঁর গাত্রবর্ণ হরিতালের মতো উজ্জ্বল, পরিণত শাল-বৃক্ষের মতো প্রকাণ্ড আকৃতি, বীরত্বের উষ্মায় পরিপক্ক দেহ। পরিণত বয়স, তবু অতিভার জরাও ভয়ে ভয়ে তাঁর দেহে কম্প জাগায়। চাঁদের আলোর মতো দীর্ঘ-শুভ্র পক্ক কেশ, চোখের নীচে বলিত-শিথিল চর্ম, মনে হয় অন্য প্রভুর মুখদর্শন পরিহার করার জন্য দৃষ্টি স্থগিত ; প্রশস্ত মুখে আকুঞ্চিত গুম্ফ গালের উপর ভাস্বর হয়ে শোভা পাচ্ছে—যেন বিকশিত কাশফুলের শোভায় শরতের উজ্জ্বল সমারোহ। গাম্ভীর্য, রুক্ষতা ও উচ্চতায় পর্বতও তাঁর কাছে লজ্জা পায় ; অকৃত্রিম, প্রচণ্ড তেজ যেন সূর্যকেও তৃণের মতো গ্রাহ্য করে না। সেনাপতি সিংহনাদ যেন ক্রোধাগ্নির অরণি, শৌর্যের ঐশ্বর্য, মদের মাদকতা, অহংকারের বিসর্প, উৎসাহের উচ্ছ্বাস, দুর্মদের অঙ্কুশ, দুষ্ট রাজার দমনকর্তা, শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের বিরাম, বীরগোষ্ঠীর কুলগুরু, শৌর্যশীলের উপমা, যুদ্ধোৎসাহের ভেরীনাদ! গম্ভীর ধ্বনিতে তিনি বললেন, 'দেব, কাপুরুষেরা কাকের মতো ; তারা নিজেরাই জানে না নিজেরা কিভাবে প্রতারিত হচ্ছে। মনস্বী ব্যক্তি প্রতারিত হ'লে মারণ মন্ত্রের বিষ শীঘ্রই সারা বংশ নাশ করে ; তেজস্বী পুরুষ আহত হলে বিদ্যুতের মতো জলের মধ্যেও জ্বলে ওঠেন। গৌড়রাজ তার কুকীর্তির জন্য নরকে স্থান পাবে। শুধু সেই অধমের কথাই বা কি! তুমি এমন প্রতিশোধ নাও যাতে অন্য কেউ আর তেমন আচরণ করতে সাহস না পায়। কাপুরুষের যোগ্য শোক ত্যাগ কর। সিংহ যেমন হরিণীকে সহজেই কাবু করে, তুমিও তেমনি রাজলক্ষ্মীকে গ্রহণ কর। তোমার পিতার মৃত্যুর পরে গৌড়াধিপরূপী দুষ্ট সর্পের বিষদংশনে রাজ্যবর্ধন মৃত ; এই মহাপ্রলয়ে গৌড়রাজকে বধ করার জন্য তুমিই

জীবিত আছ। প্রজারা অশরণ, তাদের আশ্রয় দাও। সেই অধমকে হত্যার জন্য ধনু ধারণ কর। শত্রুর রক্তচন্দনচর্চার শীতল উপচার ছাড়া অপমানের আগুনে দগ্ধদেহ প্রভুর দারুণ দুঃখ-দাহের উপশম হবে না।' এই বলে সেনাপতি বিরত হলেন।

প্রত্যুত্তরে হর্ষ বললেন, 'আপনি আমার পুজনীয়, আপনিই কর্তব্য নির্ধারণ ক'রে দিয়েছেন। ক্রোধে আকুল আমি, হৃদয়ে শোকের স্থান কোথায়? সেই গৌড়াধিপ অধম, চণ্ডাল, দুষ্ট, পাপী এবং জগৎ-গর্হিত! আমার হৃদয়-কণ্টক সে জীবিত থাকতে নপুংসকেব মতো শোক করতে লজ্জা পাচ্ছি, যতক্ষণ না চিতায় তাব ধূম দেখতে পাচ্ছি ততক্ষণ আমাব চোখে এক ফোঁটা জলও পড়বে না। আমার প্রতিজ্ঞা শুনুন, আপনার পদধূলি স্পর্শ ক'বে শপথ নিচ্ছি যদি চপল ও দুর্ললিত নৃপতিদের পায়ে নিগড় পরিয়ে তার ঝংকারে পূর্ণ ক'রে পৃথিবী থেকে গৌড় নাম মুছে দিতে না পারি, তাহলে পাপাত্মা আমি পতঙ্গের মতো ঘৃতাগ্নিতে জীবন আহুতি দেব।' এই বলে হর্ষ মহাসন্ধিবিগ্রহাধিকৃত অবন্তিকে আদেশ দিলেন, 'লিখুন, পূর্বদিকে উদয়গিরি, দক্ষিণে চিত্রকূট, পশ্চিমে অস্তাচল ও উত্তবে গন্ধমাদন পর্যন্ত সমস্ত সামন্ত রাজারা করদানেব জন্য প্রস্তুত হোন, অথবা ধনু ধাবণ করুন; মাথায় ধাবণ করুন আমার পদধূলি, অথবা (যুদ্ধের জন্য) শিরস্ত্রান; প্রণামের জন্য অঞ্জলি বদ্ধ করুন, অথবা সংঘবদ্ধ হোন; ত্যাগ করুন ভূমি, অথবা ধনুর্বান; অবলম্বন করুন বেত্রযষ্টি, অথবা বল্লম; আপন আপন প্রতিবিম্ব দেখুন আমার চরণনখে, অথবা নিজ নিজ কৃপাণ-দর্পণে।' তারপর তিনি রাজাদের বিদায় জানিয়ে আস্থানমণ্ডপ থেকে প্রস্থান করলেন। দিনের তেজ শান্ত হোল, সেই সঙ্গে ত্রিভুবনের অহংকারও যেন ধীরে ধীরে বিগলিত হ'য়ে এল। দেখতে দেখতে জগৎ-প্লাবিনী সন্ধ্যার আবির্ভাব ঘটল, যেন মূর্তিময়ী রাজপ্রতিজ্ঞা।

হর্ষ শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন; তার আদেশে পরিজনদেরও

প্রবেশ নিষেধ। বিজনকক্ষে তিনি একা, একটি প্রদীপমাত্র জ্বলছে। নিভৃত শয়নে ভাইয়ের শোক তাকে পেয়ে বসল ; নিমিলিত নয়নে তিনি যেন অন্তরের মধ্যে ভাইকে জীবিত দেখলেন। তাঁর প্রাণসন্ধান করতে গিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘতর হ'তে লাগল, চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। তিনি বহুক্ষণ নিঃশব্দে রোদন করলেন, তারপর নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার অগ্রজের মতো মহান্ ব্যক্তি এমন পরিণাম কি ক'রে লাভ করেন ? তাঁর বিরহে আমার হত হৃদয় কি ক'রে শ্বাস নিচ্ছে ? দাদার উপর আমার এই কি প্রীতি ! এই ভক্তি ! স্নেহের সেই পরিণতি এক মুহূর্তেই বিনষ্ট হোল ? অকরুণ বিধাতা অগ্রজের কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছেন ! মানুষের এমন ভালোবাসা মাকড়সার জালের মতই ছিন্নর ! ভাই, বন্ধু এসব সম্পর্ক শুধু লোকযাত্রার জন্যই, তাই অগ্রজ স্বর্গত হলেন, আর আমি দিব্যি সুস্থ রয়েছি ! রাজ্যবর্ধনের গুণগ্রাম জোৎস্নাধারার মতো জগৎকে আনন্দিত করত, আজ তাঁর বিয়োগ চিতার আগুনের মতো দহন করছে।' এইসব কথা বলতে বলতে হর্ষ নিজের মনে কাঁদতে লাগলেন।

রাত্রি প্রভাত হোল। মহারাজ হর্ষ প্রতিহারীকে আদেশ দিলেন অশ্বারোহি-বাহিনীর প্রধান স্কন্দগুপ্তকে আহ্বান করতে। আপন হস্তীর জন্য অপেক্ষা না করেই স্কন্দগুপ্ত পদব্রজে সত্বর রওনা হলেন। দণ্ডধারী সৈনিকেরা সসম্ভ্রমে রাস্তা থেকে লোকজনদের সরিয়ে দিলেন। স্কন্দগুপ্ত এগোতে লাগলেন, পথে গজবৈদ্যদের সঙ্গে দেখা, নানান প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা। হস্তিকটকের লোকেরা আনন্দে কোলাহল ক'রে উঠল। ক্রমেক্রমে উপস্থিত হলেন হস্তিপার্শ্বরক্ষক, মাহুত, অরণ্যপাল, মহামাত্র, দূত প্রভৃতি। স্কন্দগুপ্ত অবশেষে হর্ষের সম্মুখে এলেন। যে পৃথিবী মহাদেবের পদভরে অবনমিত কৈলাশ পর্বতের গুরুভার বহন করেছিল, সেনাপতির পদবিন্যাসে সেই পৃথিবীর গর্বও যেন ধ্বস্ত ; তাঁর

আজানুলম্বিত বাহু গতিবশে আন্দোলিত ; অমৃতের মতো রসাল, নবপল্লবের মতো কোমল, ঈষতুচ্চ লম্বিত অধর শ্রীহস্তিনীকেও লুব্ধ করে ; রাজবংশের মতো নাসিকা ; স্নিগ্ধ-মধুর, ধবল, বিস্তীর্ণ নয়নযুগ যেন ক্ষীরসমুদ্রকে পান করেছে ; মেরুপর্বতের মতো উন্নত ললাট। তিনি পতিব্রতা কুলাঙ্গনার মতো এক প্রভুতে অনুরক্ত ; বিদ্বানের অকারণ বন্ধু ; সেবকের অবৈতনিক ভৃত্য, পণ্ডিতের অক্রীত দাস। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তিনি হর্ষকে প্রণাম জানালেন। হর্ষ বললেন, ‘আপনি নিশ্চয় অগ্রজের হত্যাকাণ্ড এবং তারপর আমার প্রতিজ্ঞার কথা সবই শুনেছেন। সুতরাং আপনি শীঘ্র আদেশ দিন বিচরণের জন্য মুক্ত সমস্ত হস্তীকে স্কন্ধাবারে ফিরিয়ে আনতে। দাদার প্রতি অপমানের প্রতিশোধস্পৃহা যাত্রার ক্ষণবিলম্বও সইবে না।’ স্কন্দগুপ্ত হাত জোড় ক’রে নিবেদন করলেন, ‘প্রভু, আপনার আদেশের অন্যথা হবে না। আপনার প্রতি আমার অশেষ ভক্তি, তাই সামান্য নিবেদন আছে—আপনি প্রকৃত তেজস্বী, দিগ্বিজয়ী বীর ; রাজ্যবর্ধনের ঘটনা থেকে দুর্জন-দৌরাত্ম্য বিষয়ে কিছুটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে, দিকে দিকে মানুষের কতো ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব! বেশ-ভূষা, আকার-প্রকার, আহার-বিহার, আচার-ব্যবহারের কতো ভেদ!···সকলকে সহজেই বিশ্বাস করার সরলতা আপনি ত্যাগ করুন। রাজাদের প্রমাদবিষয়ে কতো কাহিনীই তো শুনেছেন। নাগবংশের রাজা নাগসেন সারিকার দ্বারা মন্ত্র-ভেদের ফলে নিহত হয়েছিলেন ; শ্রাবস্তীর রাজার গোপন মন্ত্র প্রকাশ করেছিল শুক, তাতেই তিনি রাজলক্ষ্মী হারিয়েছিলেন ; অমাত্য পুষ্যমিত্র মৌর্য রাজা বৃহদ্রথকে গোপন ষড়যন্ত্রে নিহত করেছিলেন ; শুঙ্গরাজ দেবভূতি ছিলেন কামাসক্ত, স্ত্রীসঙ্গে মগ্ন থাকার সময় তার মন্ত্রী বসুদেব এক দাসীকন্যাকে মহিষীর বেশে পাঠিয়ে তাকে হত্যা করেছিলেন ; বৎসরাজ উদয়ন নাগবনে ভ্রমণ করতে ভালোবাসতেন,

সেই অবস্থায় কাষ্ঠনির্মিত কৃত্রিম হাতীর অভ্যন্তর থেকে রাজা মহাসেনের সৈন্যরা নির্গত হ'য়ে তাকে বন্দী করেছিল; রমণীবেশে সজ্জিত মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত শত্রুপুরীতে প্রবেশ ক'রে পরদারাসক্ত জনৈক শকরাজাকে নিহত করেন; পুত্রকে রাজ্যদানের বাসনায় মহারাজ্ঞী সুপ্রভা খাদ্যের সঙ্গে মদ্য ও মধুরক বিষ মিশিয়ে কাশীরাজ মহাসেনকে হত্যা করেছিলেন; দেবকী কানের নীলপদ্মে বিষমধু মিশিয়ে প্রেমমুগ্ধ দেবরের অধরে প্রেম নিবেদন ক'রে তাকে হত্যা করেছিলেন'।

রাজা হর্ষ সর্বতোভাবে রাজ্যের শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করলেন। কঠোর প্রতিজ্ঞার পর যেদিন তিনি যুদ্ধযাত্রার জন্য আদেশ দিলেন, সেদিন থেকেই সামন্তরাজাদের ঘরে দুর্নিমিত্তের সূচনা হোল। তাদের রাজ্যে যমের দৃষ্টির মতো কৃষ্ণসার হরিণদের দল ঘুরে বেড়াতে লাগল; রাজলক্ষ্মীর চঞ্চল চরণধ্বনির মতো মৌমাছিদের গুঞ্জন শোনা গেল: অমঙ্গল শেয়ালের দল দিনের বেলা ঘুরে বেড়ায়, তাদের হাঁ-করা মুখ থেকে যেন আগুন বেরোচ্ছে; বাঁদরের গালের মতো লাল পায়রার দল মরা মাংসের লোভে ঘরের ছাদে বসতে লাগল; উপ-বনের গাছগুলোতে অকাল-কুসুমের সমারোহ, যোদ্ধারা ভূত দেখল, যেন তাদের ধড় থেকে মাথা আলদা হ'য়ে গেছে; চেটীদের হাত থেকে অকস্মাৎ চামর খসে পড়ল; যুদ্ধের ঘোড়ারা বুঝি যমরাজের মহিষের গন্ধ পেয়ে ভয়ে খাওয়া বন্ধ করেছে। মন্দির-ময়ূরেরা নাচ পরিত্যাগ করল; যে কুকুরগুলো রাত্রে চাঁদের হরিণের দিকে তাকাত, তারা তোরণের উপকণ্ঠে তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল; রাজভবনের কুট্টিমে হরিণের পায়ের মত লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে উঠল; মদের পাত্রে একবেণীধরা মলিননয়না সৈনিক-বধূদের ছবি প্রতিবিম্বিত হোল; মাটি অপহরণের ভয়ে কাঁপতে লাগল; ভয়ঙ্কর বায়ু প্রতিহারীর মতো সামন্তরাজাদের চামর ও রাজছত্রের হাওয়া কেড়ে নিয়ে প্রাসাদের সর্বত্র বইতে শুরু করল!

নাটক

শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান

[অভিজ্ঞানশকুন্তলের পঞ্চমাঙ্ক]

মহাকবি কালিদাসের সপ্তাঙ্ক নাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের এক গৌরবময় অবদান। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয় ভারত-তত্ত্ববিদ উইলিয়ম্ জোন্স্ কর্তৃক এর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর পাশ্চাত্য সাহিত্যরসিকগণ এই অমূল্য নাটকটির প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্রমে ক্রমে জার্মান, ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতি বহু বিদেশী ভাষায় এর রূপান্তর সম্পন্ন হয়। 'ফাউস্তের' কবি গ্যেয়টে কৃত শকুন্তলার প্রশস্তি বহুজনবিদিত। তাঁর মতে বাসন্তিক মুকুল আর গ্রীষ্মের পরিণত ফল, প্রাণের রসায়ন ও আত্মার আনন্দ, স্বর্গ আর মর্তের সার্থক মিলন এই নাটকেই ধ্বনিত। ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক বিদগ্ধ সমাজও কালিদাসের প্রতিভায় বিমুগ্ধ; তাঁদের মতে 'কালিদাসস্য সর্বস্বম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'।

পুরুবংশের রাজা মৃগয়াবিহারী দুষ্যন্ত মালিনীতীরে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমপালিতা কন্যা শকুন্তলার প্রণয়ে মুগ্ধ হ'য়ে গান্ধর্বমতে তাকে বিবাহ করেন, তারপর শীঘ্রই তাকে হস্তিনাপুরে আনয়নের প্রত্যাশা দিয়ে স্বয়ং রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বামীর চিন্তায় আত্ম-বিস্মৃতা শকুন্তলা আতিথ্য-সৎকারের কর্তব্যে অনবধানতার জন্য সুলভকোপ ঋষি দুর্বাসার দ্বারা অভিশপ্তা হলেন; ফলে দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে বিস্মৃত হলেন। কিন্তু ঐ অভিশাপবার্তা শকুন্তলার দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারলেন না। আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের পর কণ্ব আপন শিষ্য শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ও গৌতমীর সঙ্গে সন্তানসম্ভবা শকুন্তলাকে হস্তিনাপুরে দুষ্যন্তের সকাশে পাঠালেন। তখন বিস্মৃতপ্রণয় রাজা শকুন্তলাকে পরস্ত্রী বলে প্রত্যাখ্যান করতে চাইলেন, অন্যদিকে ঋষিকন্যা ও শিষ্যেরা আত্ম-

মর্যাদা ও সততার প্রতিষ্ঠায় কৃতসংকল্প। এই নাটকীয় দ্বন্দ্বের ক্রমপরিণতি পঞ্চম অঙ্কে রূপায়িত।

নাট্য-চরিত্র : দুষ্যন্ত—নায়ক, হস্তিনাপুরের রাজা
শকুন্তলা—নায়িকা, কণ্বের পালিতা কন্যা
সোমরাত—রাজপুরোহিত
শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত—কণ্বশিষ্য
গৌতমী—কণ্বাশ্রমের জ্যেষ্ঠা তাপসী
কঞ্চুকী—অন্তঃপুরে নিযুক্ত বৃদ্ধ রাজপুরুষ
প্রতিহারী—দ্বারপাল

সস্ত্রীক কণ্বশিষ্যদের আগমনের প্রত্যাশায় মহারাজ দুষ্যন্ত প্রতিহারী ও পরিচারিকার সঙ্গে পূর্বেই মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। এমন সময় ধীরে ধীরে প্রবেশ করছেন—সর্বাগ্রে কঞ্চুকী ও পুরোহিত, পরে শকুন্তলাকে সামনে রেখে গৌতমী, শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত।

কঞ্চুকী : এই দিকে—এই দিকে আগমন হোক।

শকুন্তলা : (প্রবেশকালে অশুভ লক্ষণের সূচনা ক'রে) ওমা! আমার ডান চোখ নাচে কেন?

গৌতমী : মা! তোমার অমঙ্গল দূরে যাক। পতিকুলের দেবতারা তোমায় সুখসম্পদ দান করুন।

(সকলে অগ্রসর হলেন)

পুরোহিত : (রাজাকে নির্দেশ ক'রে) হে তপস্বিগণ! বর্ণাশ্রমের রক্ষাকর্তা মাননীয় মহারাজ আপনাদের আগমনের পূর্বেই রাজাসন পরিত্যাগ ক'রে দর্শনের অপেক্ষায় রয়েছেন; এই আমাদের মহারাজ।

শার্ঙ্গরব : মহাব্রাহ্মণ, নরপতির এ ব্যবহার প্রশংসনীয়! আমরা কিন্তু নিরপেক্ষ; কারণ—ফলসমাগমে তরুরা আনম্র

হয়, মেঘেরা আনত হয়; সজ্জনেরা ঋদ্ধিতে বিনীত হন। পরোপকারীর এই স্বভাব।

দুষ্যন্ত : (শকুন্তলাকে দেখে) অবগুণ্ঠনবতী কে এই নারী তনুর অস্ফুট লাবণ্যে মণ্ডিতা! তাপসমণ্ডলীতে কে ইনি? যেন জীর্ণ পাতার মাঝে নব কিশলয়!

প্রতিহারী : মহারাজ, কৌতূহলের বশে আমিও অবাক! সত্যিই এঁর আকৃতি দর্শনীয়।

দুষ্যন্ত : যাই হোক, পরস্ত্রীদর্শন অনুচিত।

শকুন্তলা : (বুকে হাত রেখে। স্বগত) হৃদয়! অকারণে কেন কম্পিত হও? আর্যপুত্র আমার কতো অনুরাগী ছিল সে কথা মনে ক'রে ধৈর্য ধর।

পুরোহিত : (রাজার সম্মুখে এগিয়ে) মহারাজের মঙ্গল হোক। এই তপস্বীরা যথাবিধি অভ্যর্থনা লাভ করেছেন। এঁদের উপাধ্যায় সংবাদ পাঠিয়েছেন, আপনি অবধান করুন।

দুষ্যন্ত : আমি অবহিত হলাম।

শিষ্যদ্বয় : (হাত তুলে) মহারাজের জয় হোক।

দুষ্যন্ত : আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

শিষ্যদ্বয় : ইষ্টলাভে ধন্য হোন।

দুষ্যন্ত : মহর্ষি কণ্ব কি আদেশ পাঠিয়েছেন?

শার্ঙ্গরব : তিনি আপনার কুশল জিজ্ঞাসার পর বলেছেন, দুজনার স্বেচ্ছায় শপথের পর আপনি আমার কন্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন—এ কাজ আমি প্রীতচিত্তে অনুমোদন করেছি; কারণ মান্যকুলের শ্রেষ্ঠ বলেই আপনি আমাদের পরিচিত, আর আমার কন্যা শকুন্তলা যেন মূর্তিমতী সংক্রিয়া; যোগ্য বধূ-বরের মিলন ঘটালেন প্রজাপতি, তাই তিনি আজ চিরকালের লোকনিন্দা

থেকে মুক্ত। সুতরাং অন্তঃসত্ত্বা এই পত্নীকে ধর্মাচরণের জন্য গ্রহণ করুন।

গৌতমী : আর্য! আমারও দু-একটি কথা বলার ছিল, কিন্তু তার আর প্রয়োজন হবে না, কারণ আত্মদানের সময় শকুন্তলাও গুরুজনের অপেক্ষা রাখে নি, আপনিও বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করেন নি; এ বিবাহ দুজনের একান্ত আপন কাজ। তাই আমাদের আর কি বক্তব্য থাকতে পারে?

শকুন্তলা : (স্বগত) ন জানি আর্যপুত্র কি বলেন!

দুষ্যন্ত : (বিস্ময় ও আশঙ্কায়) আপনারা এ কোন্ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন!?

শকুন্তলা : (স্বগত) এ কি! ওঁর কথা যেন জ্বলন্ত আগুন!

শার্ঙ্গরব : এ আপনার কেমন প্রশ্ন? সংসারের রীতিনীতি বিষয়ে আপনারাই নিপুণ; সুতরাং নিশ্চয় জানেন—সধবা কন্যা পতিব্রতা হলেও বিবাহের পরে দীর্ঘদিন পিত্রালয়ে অবস্থান করলে লোকে নানান সন্দেহ করে। পত্নী পতির প্রিয় বা অপ্রিয় হোক, আত্মীয়েরা সকলেই তার স্বামিগৃহে বাস কামনা করেন।

দুষ্যন্ত : এই নারী কি আমার পূর্বপরিণীতা?

শকুন্তলা : (সবিষাদে। স্বগত) হৃদয়! যা তোমার আশঙ্কা ছিল, তাই ঘটল!

শার্ঙ্গরব : কৃতকর্মের প্রতি বিদ্বেষবশে ধর্ম থেকে বিমুখ হওয়া রাজাদের শোভা পায় কি?

দুষ্যন্ত : এমন অসৎ কল্পনার প্রসঙ্গ কোথায়?

শার্ঙ্গরব : ঐশ্বর্যমদমত্তদের মনে এরূপ বিকার সহজেই জাগে।

দুষ্যন্ত : আপনি অকারণে আমায় তিরস্কার করছেন।

গৌতমী : (শকুন্তলাকে) বাছা! মুহূর্তের জন্য লজ্জা সংবরণ

কর। তোমার ঘোমটা সরিয়ে দিই, তবেই স্বামী তোমাকে চিনতে পারবেন। (শকুন্তলার মুখ থেকে ঘোমটা তুলে দিলেন)

দুষ্যন্ত : (শকুন্তলার মুখ দেখে। স্বগত) এমন অম্লানকান্তি সুন্দর রূপ উপনীত; এ কি আমার পূর্ববিবাহিতা, নাকি আর কেউ! তাইতো সংশয় জাগে মনে, একে গ্রহণ নাকি বর্জন করি? আমি যেন প্রভাতের তুষারসিক্ত কুন্দে আকৃষ্ট এক ভ্রমর!

প্রতিহারী : (স্বগত) বাঃ! আমাদের মহারাজের কেমন ধর্মানুরাগ! এমন সৌন্দর্য অনায়াসে লাভ করলে কে আর ইতস্ততঃ করে?

শার্ঙ্গরব : মহারাজ, নীরব রইলেন কেন?

দুষ্যন্ত : দেখুন তপস্বিগণ! গভীর চিন্তা করেও কিছুতেই স্মরণ করতে পারছি না যে এঁকে পূর্বে বিবাহ করেছিলাম। তাহলে কেমন ক'রে এই গর্ভলক্ষণাক্রান্তা নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ ক'রে পরস্ত্রীদূষণের পাপে লিপ্ত হই?

শকুন্তলা : (দর্শকদের উদ্দেশ্যে) হায়! হায়! পরিণয়েই আর্য-পুত্রের সন্দেহ! তবে কোথায় রইল আমার ঊর্ধ্ব-চারিণী আশালতা?

শার্ঙ্গরব : এমন কথা উচ্চারণ করবেন না! যে মুনি আপন কন্যার ধর্ষণ অনুমোদন করেছিলেন আর দস্যুতুল্য আপনার মতো দুরাচারকে সৎ বিবেচনা ক'রে নিজের সেই কন্যাকে দান করেছিলেন—এমন ইতরের হাতে সেই কণ্বের অপমান প্রাপ্যই বটে!

শারদ্বয় : শার্ঙ্গরব! শান্ত হও। শকুন্তলা, আমাদের যা বক্তব্য ছিল তা বলেছি; মাননীয় মহারাজ তার এই উত্তর

দিয়েছেন। তাহলে এখন তোমাকে বিশ্বাসের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে হবে।

শকুন্তলা: (দর্শকদের দিকে মুখ ক'রে) আগের সেই প্রেম যখন এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, তখন পূর্বের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলেই বা কি লাভ? তবু যাতে নিজের কলঙ্ক থেকে মুক্ত হতে পারি তাই এই প্রচেষ্টা। (প্রকাশ্যে) আর্যপুত্র—(অর্দ্ধ উচ্চারণ করে) না না, বিবাহেই যখন সন্দেহ, তখন স্বামী বলে সম্বোধন করা অনুচিত! হে পৌরব, স্বভাবসরলা এই নারীকে মহর্ষির আশ্রমে প্রেমের শপথ উচ্চারণের সঙ্গে অঙ্গীকার ক'রে আজ এমন কটুবাক্যে প্রত্যাখ্যান করছেন —এমন দুষ্কর্ম আপনার মতো ব্যক্তির পক্ষেই সাজে!

দুষ্যন্ত: (দুকান ঢেকে) ছি! ছি! ও পাপ আর শুনতে চাই না। আপন কুলে কালি দিয়ে আমাকেও কলঙ্কিত করার এ কি অপচেষ্টা! যেমন কূলটা নদী নিজের নির্মল কূল আর তীরতরুকে ডোবায়, এও তেমনি।

শকুন্তলা: বেশ! পরস্ত্রী বলেই যদি এমন ব্যবহার করেছেন, তবে এই 'অভিজ্ঞান' দেখিয়ে আপনার সন্দেহ দূর করব।

দুষ্যন্ত: অতি উত্তম প্রস্তাব!

শকুন্তলা: (আঙুলে হাত দিয়ে) ও মা! একি! আমার আঙুলের আংটি কোথায় গেল? (সখেদে গৌতমীর দিকে তাকালেন)

গৌতমী: তাহলে নিশ্চয় শক্রাবতারের কাছে শচীতীর্থের জলে স্নানের সময় সেটি তোমার হাত থেকে পড়ে গেছে।

দুষ্যন্ত: একেই বলে স্ত্রীজাতির উপস্থিত বুদ্ধি!

শকুন্তলা : বিধির বিড়ম্বনায় ভাগ্যই বলবান হোল! আচ্ছা, আপনাকে একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিই।

দুষ্যন্ত : এবার তাহলে শোনার পালা?

শকুন্তলা : মনে পড়ে কি? একদিন বেতসলতাকুঞ্জে আপনার হাতে পদ্মপাতার ঠোঙায় জল ছিল—

দুষ্যন্ত : বলে যান, আমি শুনছি।

শকুন্তলা : ঠিক সেই সময় দীর্ঘাপাঙ্গ নামে আমারই পালিত হরিণশিশুটি উপস্থিত হোল। তাকে দেখে তোমার দয়া হোল; তুমি বললে, 'এ তবে আমার হাতেই জল পান করুক'—এই বলে স্বেচ্ছায় তার সামনে জলটুকু ধরলে। কিন্তু অপরিচিত বলে সে তোমার হাতে জল পান করলো না; তারপর যেই আমি জল হাতে নিলাম, অমনি সে আমার সঙ্গে ভালোবাসা পাতাল। তখন তুমি ঠাট্টা ক'রে বলেছিলে, 'স্বজাতিকে সবাই বিশ্বাস করে, তোমরা দুজনেই জংলী কি না!

দুষ্যন্ত : মধুর অথচ মিথ্যাবাক্যে পটু স্বার্থপর নারীজাতি এমনি ক'রেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষদের আকৃষ্ট করে!

গৌতমী : মহাভাগ! এ অতি অনুচিত কথা। ঐ মেয়ে তপোবনে পালিতা, ছলনা কাকে বলে কিছুই জানে না।

দুষ্যন্ত : ওগো বৃদ্ধা তাপসী! স্ত্রীজাতি স্বভাবতই পণ্ডিত! অমানুষীদের মধ্যেও এমন দৃষ্টান্ত সুলভ; মানবীদের কথায় আর কি কাজ! দেখুন, কোকিল-স্ত্রীরা আপন সন্তানগুলিকে আকাশে বিচরণের পূর্ব পর্য্যন্ত অন্যের দ্বারা পালন করিয়ে নেয়।

শকুন্তলা : (সরোষে) অনার্য! আপনি নিজের হৃদয় দিয়ে সবার বিচার করেন। ধর্মধ্বজী! ভণ্ড! তৃণাচ্ছন্ন কূপের মতো আপনাকে আর কে বিশ্বাস করতে পারে!

দুষ্যন্ত : ···ভদ্রে! দুষ্যন্তের চরিত্র সর্বজনবিদিত। আমার প্রজাদের মধ্যেও এমন নীচ কাজ দুর্লভ।

শকুন্তলা : পুরুবংশে বিশ্বাস ক'রে আপনার মতো 'মুখে-মধু অন্তরে-গরল' এক পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলাম, তাই আজ কুলটা বলে প্রতিপন্না হলেম! (আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন)

শার্ঙ্গরব : অবিমৃষ্যকারিতার এই ফল! তাই পূর্বপশ্চাৎ পরীক্ষা করেই গোপনে প্রণয় বিধেয়; অজানা হৃদয়ে সাজানো প্রেম পরিণত হয় শত্রুতায়।

দুষ্যন্ত : ওহে মহাশয়! শুধু এই নারীর কথায় বিশ্বাস ক'রে কেন আমায় রূঢ় ভাষায় ভৎর্সনা করছেন?

শার্ঙ্গরব : (সরোষে দর্শকদের প্রতি) আপনারা শুনছেন ওর জঘন্য অভিযোগ! জন্মাবধি যে শেখেনি কাপট্য, তার কথা অবিশ্বাস্য? পর-প্রবঞ্চনায় যাঁরা পটু, তাঁরা হলেন সত্যবাদী?

দুষ্যন্ত : ওহে সত্যবাদী! আমরা রাজারা না হয় পর-প্রবঞ্চক, তাই বলে এই নারীকে বঞ্চনা ক'রে কি লাভ?

শার্ঙ্গরব : নরক!

দুষ্যন্ত : পুরুবংশের রাজারা নরকগামী হবেন—এমন কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

শারদ্বত : শার্ঙ্গরব, আর উত্তর-প্রত্যুত্তরে কি প্রয়োজন? গুরুর আদেশ আমরা পালন করেছি, এবার ফিরে যাবো। (রাজাকে উদ্দেশ্য ক'রে)—এই আপনার পত্নী; একে ত্যাগ করুন বা গ্রহণ করুন যা আপনার অভিরুচি। পত্নীর বিষয়ে পতির সর্বাঙ্গীণ প্রভুত্ব স্বীকৃত। গৌতমী, ফিরে চলুন—

(গৌতমী, শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত প্রস্থানোদ্যত)

শকুন্তলা ঃ হায়! হায়! এই প্রতারকের কাছে আমি যখন বঞ্চিত হলাম, তখন তোমরাও সবাই আমাকে ত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছ? (সবার পশ্চাৎ অনুসরণ করতে লাগলেন)

গৌতমী ঃ (পশ্চাদভিমুখে দাঁড়িয়ে) বৎস শার্ঙ্গরব! শকুন্তলা যে সকরুণ বিলাপ করতে করতে আমাদেরই অনুসরণ করছে; যে স্বামী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই নিঠুর স্বামীর কাছে থেকেই বা মেয়ে আমার কি করবে?

শার্ঙ্গরব ঃ (সক্রোধে ফিরে দাঁড়িয়ে) আঃ পুরোভাগিণী! কেন তুমি স্বেচ্ছাচারিণী হতে চাইছ! (শকুন্তলা ভয়ে কম্পমানা) শকুন্তলা শোন, মহারাজ যা বলেছেন, তাই যদি সত্য হয়—তবে কুলকলঙ্কিনী তোমাকে নিয়ে পিতার কি প্রয়োজন? আর যদি নিজেকে নিষ্পাপা শুদ্ধা মনে কর, তাহলে পতিকুলে দাস্যবৃত্তি করাও তোমার পক্ষে মঙ্গল। তুমি এখানেই অপেক্ষা কর। আমরা বিদায় নিই।

[সংক্ষেপিত]

আলেখ্য-দর্শন

[উত্তররামচরিতের প্রথমাঙ্ক]

কালিদাসযুগের বিখ্যাত নাট্যকার শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছন ভবভূতি। তাঁর নাটকত্রয়ীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ উত্তররামচরিতে আদর্শ দাম্পত্য প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বে কারুণ্যবৃত্তির সার্থক পরিস্ফুরণ ঘটেছে। ভবভূতির কাল আনুমানিক অষ্টম শতক।

নাট্যচরিত্র ঃ রাম। লক্ষ্মণ। সীতা। অষ্টাবক্র মুনি। কঞ্চুকী। প্রতিহারী ও দূত দুর্মুখ।

মূল কাহিনী শুরু হওয়ার পূর্বে প্রস্তাবনা। সূত্রধার জানালেন,

'আজ কালপ্রিয়নাথের উৎসব ; এই উপলক্ষ্যে শ্রীকণ্ঠ ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটকের অভিনয় হবে। নাট্যামোদী দর্শকগণ! আপনারা আমাদের অভিনয় দেখতে সমবেত হয়েছেন। এখন আমি আপনাদের সকলকে অযোধ্যায় রামরাজত্বের অতীত অধ্যায়ে উপস্থাপিত করছি। রাবণকে নিধনের পর রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার ক'রে অযোধ্যায় ফিরেছেন। সীতা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণা হ'য়ে লোকনিন্দার অপবাদ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এই সময় দশরথের জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ যে যজ্ঞের আয়োজন করেছেন, রাম ও সীতা ছাড়া রাজবাটীর সকলেই সেখানে উপস্থিত। কিন্তু লোকচরিত্র কি অদ্ভুত! সীতার চরিত্র সম্পর্কে প্রজারা এখনও কুৎসা রটাচ্ছে! বাক্যের অর্থ আর নারীর চরিত্র—এ দুইয়ের সাধুতায় লোকে সহজেই সন্দেহ প্রকাশ করে। মহারাজ জনক সন্তানসম্ভবা কন্যার সংবাদ নিয়ে অযোধ্যা থেকে মিথিলায় ফিরেছেন।

স্থান—অন্তঃপুরের শয়নগৃহ। আসন্নপ্রসবা সীতা দুঃখিতমনে সেখানে রয়েছেন ; এমন সময় রামচন্দ্র বিচারাসন ছেড়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। রাম ও সীতা উভয়ে বসে আছেন, এই অবস্থায় দৃশ্যের শুরু।

রাম ঃ দেবী! তুমি একটু শান্ত হও। গুরুজনেরা আমাদের ছেড়ে বেশীদিন থাকতে পারবেন না ; তাঁরা আবার তোমাকে দেখতে আসবেন। আসলে কি জানো, সাগ্নিক গৃহীরা যদি অনেক দিন গৃহের বাইরে কাটান, তাহলে যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি গৃহস্থ ধর্মের নানান ব্যাঘাত হয়। সেই কারণেই তো তোমার পিতা এত তাড়াতাড়ি বিদেহে ফিরে গেলেন।

সীতা ঃ আর্যপুত্র! সবই জানি ; তবু আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদে মনকে প্রবোধ দিতে পারি নে।

রাম ঃ তোমার কথা মানি। আসলে এগুলিই হোল সংসারের দুঃখ। তাই মুনি-ঋষিরা সব কামনা-বাসনা থেকে নিরাসক্ত হয়ে বনে গিয়ে বাস করেন।

[কঞ্চুকীর প্রবেশ]

কঞ্চুকী ঃ রামভদ্র—! (অর্ধেক বলেই থেমে গেলেন)

রাম ঃ (ঈষৎ হেসে) দেখ, তুমি পিতার পুরাতন পরিচারক; তোমার মুখে 'রামভদ্র' ডাকই শোভা পায়। তুমি তাই বলেই আমাকে ডাকবে।

কঞ্চুকী ঃ দেব! ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম থেকে অষ্টাবক্র এসেছেন।

সীতা ঃ ওঃ! তাহলে উনি এখানে আসতে দেরী কচ্ছেন কেন?

রাম ঃ তাড়াতাড়ি তাঁকে নিয়ে এস।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান। অষ্টাবক্রের প্রবেশ]

অষ্টাবক্র ঃ তোমাদের মঙ্গল হোক।

রাম ঃ ভগবান! আপনাকে প্রণাম জানাই। এখানে বসুন।

সীতা ঃ ভগবান! আমার প্রণাম নিন্। আর্যা শান্তা, তাঁর স্বামী আর অন্যান্য গুরুজনদের কুশল তো? তাঁরা আমাদের কথা কিছু বলছিলেন কি?

অষ্টাবক্র ঃ হেঁ মা, সবাই তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করছিল। ভগবান তোমার উদ্দেশে বলেছেন—

মা সীতা, ভগবতী বসুন্ধরা তোমার জননী,
প্রজাপতিতুল্য জনকরাজা তোমার পিতা;
দেব সবিতা ও আমবা যে বংশেব গুরু—
ওগো নন্দিনী, তুমি সেই বংশের পুত্রবধূ।
অন্য কি আশিস্ তোমায় দেব! তুমি বীরপ্রসবিনী হও।

রাম ঃ এ আপনার অশেষ কৃপা।

অষ্টাবক্র ঃ হ্যাঁ শোন, ভগবতী অরুন্ধতী, শান্তা ও অন্যান্যেরা বলেছেন এসময় যেন সীতার আমোদ-আহ্লাদ পূরণের

ঠিকঠিক ব্যবস্থা হয়।······(সীতার প্রতি) আর ঋষ্যশৃঙ্গ বলেছেন তুমি পুত্রের জননী হলে তিনি সপুত্রা তোমাকে দেখতে আসবেন।

রাম : (সলজ্জ হাসিতে) তাই হোক। আচ্ছা, ভগবান বশিষ্ঠ কি আমায় কিছু বলেছেন ?

অষ্টাবক্র : তিনি বললেন, 'আমরা যজ্ঞের কাজে ব্যস্ত। তুমি বয়সে নবীন, রাজ্যভারও নতুন, তাই প্রজানুরঞ্জনে মনোযোগী হবে। প্রজাপালনের যশই তোমার সম্পদ।

রাম : প্রজাদের সুখী করার জন্য আমি দয়া মায়া সুখ, এমন কি সীতাকেও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

সীতা : এই জন্যই তো তুমি রঘুবংশের গৌরব।

রাম : এখানে কে আছ ? ভগবান অষ্টাবক্রের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর।

অষ্টাবক্র : (এগোতে লাগলেন) ঐ লক্ষ্মণ আসছে দেখছি।

[লক্ষ্মণের প্রবেশ। অষ্টাবক্রের প্রস্থান]

লক্ষ্মণ : অগ্রজের জয় হোক। আপনাদের কথামতো সেই চিত্রশিল্পী অভ্যন্তর ভিত্তিতে আপনার কাহিনী চিত্রিত করেছেন। একবার দেখুন।

রাম : ভাই, সীতাকে কেমন ক'রে সান্ত্বনা দিতে হয় তা তুমি বেশ জানো দেখছি। আচ্ছা, ওখানে কোন্ পর্য্যন্ত অঙ্কিত আছে ?

লক্ষ্মণ : আর্যাব অগ্নিশুদ্ধি পর্যন্ত।

রাম : থাম ! আজন্ম শুদ্ধ যে, তাকে আবার শুদ্ধ করবে কে ! তীর্থের জল, আর আগুন—এ দুটিকে অন্যের দ্বারা শুদ্ধ করতে হয় না। দেবী ! যজ্ঞভূমিতে তোমার জন্ম ; তুমি বিচলিত হয়ো না। হয়ত এ নিন্দা তোমাকে আজীবন শুনতে হবে।

সীতা : ওগো, সেসব কথা থাক। এস আমরা তোমার কীর্তিকাহিনী দেখি গে। (উঠে দাঁড়িয়ে সকলে এগোতে লাগলেন)

লক্ষ্মণ : এই দেখুন সেই আলেখ্য।

সীতা : আচ্ছা, ওপরে একসঙ্গে এগুলি কি ?

লক্ষ্মণ : এর নাম জৃম্ভক অস্ত্র।

রাম : এখন এই অস্ত্র তোমার সন্তানের হস্তগত হবে।

সীতা : এ আমার পরম ভাগ্য।

লক্ষ্মণ : এই সেই মিথিলা-বৃত্তান্ত।

সীতা : ওমা! তাইতো।··আর্যপুত্র কেমন অবহেলায় হরধনু ভঙ্গ করছেন।

লক্ষ্মণ : এবার দেখুন এখানে আপনার পিতা কুলগুরু শতানন্দ, বশিষ্ঠ ও অন্যান্য গুরুজনদের বন্দনা করছেন।

সীতা : সত্যিই তো! দেখার মতো চিত্র! আবাব এখানে দেখছি তোমাদের চারভাইকে বিবাহের মঙ্গল অনুষ্ঠানে বরণ করা হয়েছে। মনে হচ্ছে, আবার সেই পুরাণো দিনে ফিরে গেছি!

রাম : হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে! সুমুখী, সেই সময় শতানন্দ কঙ্কণে সাজানো তোমার সুন্দর হাতখানি আমার হাতে সমর্পণ করেছিলেন।

লক্ষ্মণ : দেবী, এই আপনার ছবি। এটি মাণ্ডবীর আর এটি শ্রুতকীর্তির।

সীতা : (ঊর্মিলার ছবি দেখিয়ে) আচ্ছা, এটি কার ছবি ?

লক্ষ্মণ : (সলজ্জ হাসিতে। স্বগত) ওঃ! উনি ঊর্মিলার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। যাই হোক, ওঁদের দৃষ্টি অন্য দিকে নিয়ে যাই। (প্রকাশ্যে) আর্যা! এবার আপনি দর্শনীয় জিনিস দেখুন।

সীতা : বাব্বা ! একেবারে ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো !

লক্ষ্মণ : দেখুন, আমার অগ্রজ অবলীলায় এই পরশুরামকে—

রাম : আঃ ! আরও অনেক দ্রষ্টব্য আছে, তাই দেখাও।[১]

সীতা : (রামচন্দ্রকে) আর্যপুত্র ! এমন বিনয়ের ভাব দেখালে তোমাকে বেশ সুন্দর দেখায় তো !

লক্ষ্মণ : দেবী ! আমরা অযোধ্যায় ফিরে এসেছি, এবার সেই চিত্র।

রাম : (সজলচক্ষে) সব স্মৃতি স্পষ্ট মনে পড়ে ! তখন আমরা নববিবাহিত, বাবা জীবিত আছেন, মায়েরা সব কাজকর্ম দেখাশুনা করছেন। আমাদের সেই সব দিন কি একেবারেই চলে গেছে ! সেদিনের সীতার চিত্রটি কেমন মধুর—

অনতিনিবিড় সূক্ষ্ম কিবা চারু কেশ
শোভিত ও ললাটের দুই প্রান্তদেশ।
মুকুল-দশন-পাঁতি, মুগ্ধ কচি মুখ
হেরি মাতাদের মনে হোত কতো সুখ।
নিরমল সুললিত জোছনার সম
মধুর শৈশব-অঙ্গে অশিক্ষ-বিভ্রম।
অপ্রাপ্ত-যৌবনা সীতা স্নেহের পুতুলী
মাতৃগণ দেখিতেন হ'য়ে কুতূহলী।

লক্ষ্মণ : এই দেখুন সেই মন্থরা !

রাম : (উত্তর না দিয়ে[২]) বিদেহনন্দিনী, এই দেখ সেই ইঙ্গুদী তরু। শৃঙ্গবের নগরে এই তরুতলে ব্যাধরাজ গুহের

১। রামচন্দ্র পরশুরামকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন, লক্ষ্মণ একথা জানাতে চান, কিন্তু রামচন্দ্র আত্মশ্লাঘা শুনতে অনিচ্ছুক।

২। রঘুবংশের বিপর্যয়ের মূলে মন্থরার দায়িত্ব অনেক ; তবু তার সম্বন্ধে কটূক্তি যেন না হয় এই অভিপ্রায়ে রাম মন্থরার চিত্র এড়িয়ে গেলেন।

সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমাদের উপর তার ভালোবাসা মনে রাখার মতো।

লক্ষ্মণ : (সহাস্যে। স্বগত) আচ্ছা! কৈকেয়ীর প্রসঙ্গ উনি এড়িয়ে যেতে চান।

সীতা : ওমা! এতো দেখছি বনবাসের প্রাক্কালে তোমাদের জটাবন্ধনের ছবি। এখানে নির্মল-পুণ্য-সলিলা ভগবতী গঙ্গা।···

লক্ষ্মণ : এই সেই 'শ্যাম' নামে প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষ। চিত্রকূট পর্বতে যাওয়ার সময় যমুনানদীর তীরে মহর্ষি ভরদ্বাজ এই বনস্পতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

সীতা : আর্যপুত্র, এখানের কথা মনে আছে তো?

রাম : সুন্দরী, সে কি ভুলতে পারি—

শান্তির ভবে এইখানে, প্রিয়া,
এই যমুনারই তীরে,
শিথিল শয়নে এলায়ে দিয়েছো
শ্রান্ত ও তনুটীরে—
বক্ষে আমার, সেকি জাগে মনে,
আমার নিবিড় বাহুর বাঁধনে
অলস আলস আবেশে কখন
ঘুমায়ে পড়েছো ধীরে,—
শিথিল শয়নে এইখানে প্রিয়া
এই যমুনারই তীরে॥

লক্ষ্মণ : এই দেখুন, বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশের সময় রাক্ষস বিরাধ আমাদের পথ রোধ করেছিল।

সীতা : ও থাক[১]। এবার দেখি আমাদের দক্ষিণারণ্যে

১। রামচন্দ্র বিরাধকে বধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই আত্মপ্রশংসা এড়িয়ে যেতে চান।

প্রবেশবৃত্তান্ত। ওমা! এই যে, আর্যপুত্র নিজের হাতে আমার মাথায় তালপাতার ছাতা ধ'রে আছেন।

লক্ষ্মণ : এদিকে দেখুন, এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি। আকাশপথে বর্ষণশীল মেঘের দল এর উপর স্নিগ্ধ-শ্যামল ছায়া ফেলে যেত। প্রান্তদেশ ঘন বনরাজিতে স্নিগ্ধনীল। তরঙ্গিণী গোদাবরী সেই বনদেশকে আলিঙ্গন ক'রে বহে যেত, আর স্রোতের বেগে পর্বতের গুহাগুলি কুলুকুলু শব্দ ক'রে উঠত।

রাম : সুতনু! তোমার মনে পড়ে কি সেই প্রস্রবণ গিরিতটে লক্ষ্মণের সেবা আর পরিচর্যায় দিনগুলি কেমন সুন্দর কেটে যেত? স্বাদুসলিলা গোদাবরীকে মনে আছে তো?

সেদিনের কথা পড়ে নাকি মনে—
মনে কি পড়ে না প্রিয়া,
জীবনের কতো মধুবেলা হেথা
উঠেছিলো উছলিয়া।
পল্লবছাওয়া গিরিতটতল,
কলকল ছোটে গোদাবরীজল,—
কুঞ্জকুটীরে আমরা দুজনা
দুটি বিমুগ্ধ হিয়া,
সেই কথা আজ মনে কি পড়ে না,
পড়ে নাকি মনে প্রিয়া॥
দুজনে দোঁহারে জড়ায়ে নিয়েছি
নিবিড় বাহুর পাশে,
কপোলে কপোল রেখে কত কথা
কয়েছি যে মৃদুভাষে।
গুঞ্জন সুরে করিয়াছি গান,
যা এসেছে মনে, যা চেয়েছে প্রাণ,

বুঝি নি কখন কেটে গেছে রাত,
কখন প্রভাত আসে,
দুজনে দোঁহারে জড়ায়ে ছিলাম
নিবিড় বাহুর পাশে

লক্ষ্মণ : এই দেখ, পঞ্চবটীতে শূর্পণখা-বৃত্তান্তেব চিত্র।

সীতা : নাথ! তোমাব সঙ্গে এই বোধ হয আমার শেষ দেখা!

রাম : তোমার মনে বিচ্ছেদেব ভয় কি এখনো আছে? এতো ছবি!

সীতা : তা হোক! দুর্জনের নাম উচ্চাবণ করলেও দুঃখের আশঙ্কা থাকে।

বাম : হায়! জনস্থানেব ঘটনাগুলি আজ যেন আবার প্রত্যক্ষ দেখছি।

লক্ষ্মণ : এই সেই ঘটনা—দুরাচাব বাক্ষস সোনার হরিণের ছলনায় এমন অন্যায় করেছিল, যার উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের পরেও মনের জ্বালা একেবারে মুছে গেল না। আমার অগ্রজ পত্নীর বিরহে এমন আচরণ করতে লাগলেন, যা দেখে পাষাণও কেঁদে উঠেছিল, বজ্রের হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়েছিল।···আচ্ছা, এখন তাহলে চিত্রের কোন্ দিকে এঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি?

সীতা : লক্ষ্মণ, এই পাহাড়ে কদমগাছেব শাখায় শাখায় ফুল ধরেছে আর তরুতলে ময়ূরেরা আনন্দে নাচছে। আর্যপুত্র শোকে দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছেন; তোমারও চোখে জল; তুমি ওঁকে আশ্বস্ত করছো। এর নামটি কি যেন?

লক্ষ্মণ : মাল্যবান্ গিরি। এর শৃঙ্গদেশ যেন নীল আকাশকে স্পর্শ করেছে।···

সীতা : চিত্রাবলী দেখে আমার ইচ্ছা হচ্ছে—

রাম : কি ইচ্ছা ?

সীতা : আর একবার সেই সব স্থানে যাই, আবার ভাগীরথীর পুণ্য শীতল জলে অবগাহন করি।

রাম : লক্ষ্মণ ?

লক্ষ্মণ : এই তো আমি। কি আজ্ঞা ?

রাম : গুরুজনদের ইচ্ছা এ অবস্থায় সীতার সব মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে হবে। তুমি রথ সজ্জিত করার আদেশ দাও। আসন যেন বেশ আরামপ্রদ হয়।

সীতা : নাথ ! তুমি আমার সঙ্গে যাবে তো ?

রাম : কঠিনহৃদয়া, এ কথাও কি জিজ্ঞাসা করতে হয় ?

সীতা : এ আমার পরম আনন্দ।

লক্ষ্মণ : আমি তবে রথ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করি। (লক্ষ্মণের প্রস্থান)

রাম : প্রিয়তমা ! এস গবাক্ষের পাশে নিরালায় একটু শয়ন করি।

সীতা : চল যাই। আমিও ভীষণ ক্লান্ত ; ঘুমে অঙ্গ অবশ হয়ে আসছে।

রাম : সুন্দরী ! আমায় গাঢ় অলিঙ্গন দিয়ে শয়ন কর।

শ্রমস্বেদে আজ ভরেছে পেলব
বাহু দুটি তব প্রিয়া,
জোছনায় যেন চন্দ্রকান্ত
মণি উঠে উছসিয়া।
মালাখানি এই বাহু-লতিকার,
সোহাগে জড়াও কণ্ঠে আমার,
তোমার পরশ সঞ্জীবনীতে
জাগুক মুগ্ধ হিয়া
কণ্ঠে আমার দাওগো জড়ায়ে
বাহু দুটি তব প্রিয়া ॥

(সীতা রামের কথামত আচরণ করলেন)

রাম : (সানন্দে) প্রিয়তমা ! এ কেমন আনন্দ ! ?

সুখ না দুঃখ একি অনুভূতি
জাগিছে মরমে মম,
একি বিষজ্বালা, না এ মদিরার
মায়া শুধু অনুপম ।
বিস্মৃতি একি, না এ ঘুমঘোর !
বিবশ বিকল তনু মন মোর,
নিজেরে হারাই বিস্মৃতি-তলে.
ক্ষণিকে স্বপ্নসম ;
পরশে তোমার একি মোহমায়া
জাগিছে মরমে মম[১] ॥

সীতা : নাথ, এ আর কিছু নয় ; শুধু তোমার ভালোবাসার আতিশয্য। এ যে আমার কি আনন্দ কেমন ক'রে বোঝাই !

রাম : ওগো কমলনয়না ! তোমার বাণীতে—

জীবন-কুসুম ম্লান হয় বিকশিত,
সকল ইন্দ্রিয়গণ তৃপ্ত বিমোহিত,
কর্ণে হয় সুমধুর অমৃত-বর্ষণ
মনের ঔষধি ওযে মৃত-সঞ্জীবন[২] ॥

১। বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সম্মীলয়তি চ ॥

২। ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাসনানি/সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়-মোহনানি ।
এতানি তে সুবচনানি সরোরুহাক্ষি/কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি ॥

সীতা ঃ আর্যপুত্র, তুমি কেমন সুন্দর করে কথা বলতে পারো। এসো, এবার নিদ্রা যাই। (বালিশ খুঁজতে লাগলেন)

রাম ঃ তুমি আবার খুঁজে বেড়াচ্ছ কি? বালিশ?

রচিয়াছে নিতি শ্রান্ত তোমার
উপাধান গৃহে বনে
অকলুষ মোর এই বাহু প্রিয়া—
সে কথা কি নাই মনে?
আবার তেমনি সেই লীলাভরে,
মাথাটিরে রাখো এ বাহুর 'পরে
শয়নে তোমার মিছে তবে আর
কিবা কাজ আয়োজনে,
এ বাহুই তব চির উপাধান
সে কথা কি নাই মনে।

সীতা ঃ (নিদ্রার অভিনয় করতে করতে) ঠিক বলেছো। তাই বটে—হাঁ—। (নিদ্রা)

রাম ঃ একি! প্রিয়বাদিনী আমার কোলেই বুঝি ঘুমিয়ে পড়ল! (সাদরে দেখতে দেখতে)

গৃহে তুমি লক্ষ্মী প্রিয়া, নয়নে
কাজল-মায়া যে রাণি!
স্পর্শন তব চন্দন সম
স্নিগ্ধতা দেয় আনি।
বাহুলতা দুটি মুকুতার মালা,
অধরে তোমার সুধারাশি ঢালা,
সবই যে মধুর, দুঃসহ শুধু
বিরহ তোমার জানি;

ওগো প্রিয়তমা, প্রেয়সী আমাব
চির-বাঞ্ছিতা রাণী[1] ॥

প্রতিহারী : (দূব থেকে) মহারাজ ! এসে গেছেন ।

রাম : কে ?

প্রতিহাবী : মহারাজের হাজিরা-চাকব তুর্মুখ ।

বাম : (স্বগত) হাঁ, জানি গুপ্ত দূত তুর্মুখকে পাঠিয়েছিলাম গ্রাম ও নগরবাসীদের মনোভাব জানতে । (প্রকাশ্যে) ওঃ, আচ্ছা, আসতে বল ।

(প্রতিহাবীর প্রস্থান । তুর্মুখের প্রবেশ)

তুর্মুখ : (স্বগত) হায় ! সীতাদেবীব চবিত্রের এমন কুৎসা কোন্ মুখে প্রভুকে জানাই ! কিন্তু আমি যে হতভাগ্য ! গুপ্ত সংবাদ জানানোই আমাব কাজ !

সীতা : (স্বপ্নে) আর্যপুত্র ! আমার প্রিয়াকাঙ্ক্ষী, তুমি কোথায় ?

বাম : একি ! চিত্রদর্শনে যে বিরহের আশঙ্কায় সীতা ব্যথিতা হয়েছিল, সেই ভয় এখোনো তাকে তুঃস্বপ্নের মধ্যে পীড়া দিচ্ছে । (সস্নেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন)

তুর্মুখ : (কিছুটা এগিয়ে) মহারাজেব জয় হোক ।

রাম : বলো কি সংবাদ ?

তুর্মুখ : নগর আর জনপদের লোকেবা আপনার সুখ্যাতি ক'রে বলছে, বামভদ্রকে পেয়ে আমরা দশরথকে প্রায় ভুলতে বসেছি ।

১ । ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তির্নয়নয়োর্
অসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পরমসহ্যস্তু বিরহঃ ॥

রাম : এতো শুধু প্রশংসা ; নিন্দার কথা কিছু শুনেছি কি ? তাহলে বলো।

দুর্মুখ : (সজলচোখে) মহারাজ, শুনুন। (কানে কানে বললেন)

রাম : ওঃ! এ যে ভয়ঙ্কয় বজ্রের আঘাত। (দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লেন)

দুর্মুখ : প্রভু, আশ্বস্ত হোন।

রাম : হায়! বৈদেহী কিছুদিন রাবণগৃহে থাকতে বাধ্য হয়েছিল বলে তার সম্বন্ধে যে নিন্দা রটেছিল, আমি তা অদ্ভুত উপায়ে মোচন করেছিলাম। হায় ধিক! কুক্কুরের বিষের মতো সে নিন্দা দৈবদোষে আবার ছড়িয়ে পড়েছে! এ আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু এখন কি করি! (চিন্তা করতে করতে করুণ স্বরে) আর কোন উপায় নেই! সমস্ত কর্মের মধ্য দিয়ে প্রজাদের সেবা করাই সদাচার রাজার ব্রত। আমার পিতা আমাকে এবং নিজের জীবনকে বিসর্জন দিয়ে সেই মহাব্রত পালন করে গেছেন। ভগবান বশিষ্ঠও এই আদেশ পাঠিয়েছেন। তাছাড়া সূর্যবংশের লোকমান্য নৃপতিরা জগতে যে নির্মল চরিত্রের আদর্শ রেখে গেছেন, আজ যদি আমাকে কেন্দ্র ক'রে তার মধ্যে লোকনিন্দার অপবাদ রটে, তবে পাপিষ্ঠ আমাকে ধিক্! হায় দেবী! যজ্ঞভূমিসমুদ্ভবা! তোমার জন্মে ধরিত্রী শুদ্ধা হোল। তুমি ছিলে রঘুবংশের আনন্দদায়িনী। ভগবতী অরুন্ধতী আর অগ্নিদেব তোমার প্রশংসায় মুখর। আমি ছিলেম তোমার জীবন, আর তুমি ছিলে আমার অরণ্যবাসের সহচরী। ওগো মিতভাষিণী প্রিয়ংবদা, তোমার ভাগ্যে এমন পরিণতি ঘটবে!

তুমি কিনা ত্রিজগৎকে পবিত্র করলে, আর লোকে তোমার নামে কলঙ্ক রটাবে ? তোমাকে পেয়ে পৃথিবী শক্তিমতী হোল, আর আজ তুমিই অনাথা ! দুর্মুখ, আমি নতুন রাজা। তুমি লক্ষ্মণকে আমার এই আদেশ জানিয়ে দাও। (কানে কানে আদেশটি বললেন)

দুর্মুখ : প্রভু ! সীতাদেবী অগ্নিশুদ্ধা ; তাঁর গর্ভে রঘুকুলের পবিত্র সন্তান। আপনি দুষ্ট লোকের মুখে মিথ্যা অপবাদ শুনে তাঁর উপর এমন অন্যায় আচরণ করবেন ?

রাম : থাম। নগর আর গ্রামবাসীদের দুর্জন আখ্যা দিতে চাও কোন অভিপ্রায়ে ? প্রজারা ইক্ষাকুবংশকে চায় তা জানি ; কিন্তু সীতার নামে কলঙ্ক সে তো দৈবের অধীন। অগ্নি-পরীক্ষায় তার চরিত্রশুদ্ধির ব্যাপার তো একটা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ঘটনা মাত্র। তাই দিয়ে বহুদূরে লঙ্কায় কি ঘটেছে না ঘটেছে তা প্রমাণ করা যায় না। তুমি এখন যাও।

দুর্মুখ : হায় দেবী ! [প্রস্থান]

রাম : ওঃ কি কষ্ট ! আমি এক ঘৃণিত নৃশংস মানুষে পরিণত হলাম। কৈশোর থেকে প্রিয়াকে লালন করেছি, গভীর প্রণয়ে তাকে একদিনের জন্যও চোখের আড়াল করি নি ; আর আজ, কষাই যেমন গৃহপালিত পাখীকে বধ করে, আমিও তেমনি ছলনার আশ্রয় নিয়ে সেই প্রিয়তমাকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করছি। না ! না ! না ! এই অস্পৃশ্য, পাপ হাত দিয়ে ওকে আর স্পর্শ করব না ! (ধীরে ধীরে সীতার মাথা তুলে নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে) ওগো মুগ্ধহৃদয়া, আমি যে চণ্ডাল ! তাই চণ্ডালের কুকর্ম করতে চলেছি। তুমি

আমায় পরিত্যাগ কর; যাকে চন্দনতরু ভেবে আলিঙ্গন করে আছ, সে এক ভয়ানক বিষবৃক্ষ। (উঠে দাঁড়িয়ে) হায়! রামের কাছে সমস্ত সংসার আজ ওলট-পালট হয়ে গেল। জীবনের সমস্ত মূল্য এক মুহূর্তেই অর্থহীন হয়ে দাঁড়াল! সমগ্র পৃথিবী আজ যেন জীর্ণ অরণ্য, সংসার অসার, দেহ দুঃখের আধার। আমি নিজেই রক্ষকহীন হয়ে গেলাম। কি করি! কোথায় যাই! কি আমার গতি! বিধাতা কি শুধু দুঃখের বোঝা বইবার জন্য আমার শরীরে চৈতন্য দিয়েছিলেন। বজ্রসূচি দিয়ে তিনি আমার মর্মে মর্মে একি দাহ জ্বালিয়ে দিলেন? ওগো মা অরুন্ধতী, ভগবান্ বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্র, হে দেব অগ্নি, দেবী পৃথিবী, হে পিতা জনক! ওগো মাতৃদেবীরা, হে ভক্ত হনূমান, পরোপকারী বিভীষণ, প্রিয় মিত্র সুগ্রীব, সখী ত্রিজটা—তোমাদের সবাইকে আমি পাপে লিপ্ত করেছি। না! না! কৃতঘ্ন, দুরাত্মা আমি তাঁদের পুণ্য নাম এ পাপমুখে আর উচ্চারণ করব না। আমার গৃহের শোভা, প্রিয়তমা ভার্যা অগাধ বিশ্বাসে বুকের উপর ঘুমিয়ে পড়েছিল; অজানা আতঙ্কে তার গর্ভ কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আমি দয়ামায়া বিসর্জন দিয়ে হিংস্র জন্তুর মুখে মাংস-উপহারের মতো তাকে বনে বিসর্জন দিচ্ছি। (সীতার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে) দেবী, রামের মস্তকে তোমার চরণকমলের এই শেষ স্পর্শ! (কাঁদতে লাগলেন)

(নেপথ্যে) অমঙ্গল! মহা অমঙ্গল!

রাম ঃ কি হোল! কে আছ এখানে? কি হয়েছে সত্বর খোঁজ নাও।

(নেপথ্যে) মহারাজ, যমুনাতীরের তপস্বীরা লবণ নামে এক দানবের ভয়ে ভীত হয়ে আপনার শরণাগত হয়েছেন।

রাম ঃ বটে! এখনও রাক্ষসের ভয়! আচ্ছা, এই দুরাত্মাদের বধের জন্য আমি শত্রুঘ্নকে পাঠিয়ে দিই। (কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এসে) হায় দেবী! এখন তোমাকে কার কাছে রেখে যাই? ভগবতী বসুন্ধরা, সীতা তোমারই আদরিণী মেয়ে, তুমিই তার দায়িত্ব নাও। (প্রস্থান)

জুয়াড়ী-সমাচার

[মৃচ্ছকটিক নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কের একটি দৃশ্য]

শূদ্রকবিরচিত দশাঙ্ক নাটক মৃচ্ছকটিক সংস্কৃতসাহিত্যের এক অতুলনীয় সৃষ্টি। রচনাকাল আনুমানিক ১ম—২য় খৃষ্টাব্দ। দরিদ্র ব্রাহ্মণ চারুদত্ত ও গণিকা বসন্তসেনাব প্রণয় এর বিষয়বস্তু। রাজশ্যালক দুর্বিনীত শকারও বসন্তসেনার অনুগ্রহপ্রার্থী। মূল কাহিনীর পাশাপাশি শর্বিলক-মদনিকার প্রেমবৃত্তান্ত যুক্ত। এই নাটকে নানান চিত্তাকর্ষক ঘটনা ও চরিত্রের সমন্বয়—বিদগ্ধা গণিকা ও মনস্বী ব্রাহ্মণের ভালোবাসা, জাতিতে ব্রাহ্মণ অথচ বৃত্তিতে সিঁধেল চোর শর্বিলক কর্তৃক চুরির কলা-কৌশল প্রদর্শন, মিথ্যা খুনের মামলা, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের গণিকাসক্তি, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, জুয়াড়ীদের বিবাদ প্রভৃতি।

কুশীলব ঃ মাথুর—জুয়ার ওস্তাদ। সংবাহক—প্রথম জুয়াড়ী
(পূর্বে গাত্রমর্দক পরে বৌদ্ধভিক্ষু)
দ্যূতকর—দ্বিতীয় জুয়াড়ী। দর্দুরক—তৃতীয় জুয়াড়ী

এই অনুবাদে তারকাচিহ্নিত কবিতা দুটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা থেকে এবং অবশিষ্টগুলি গঙ্গেশ রায়চৌধুরী কৃত অনুবাদ থেকে গৃহীত।

স্থান—প্রশস্ত বাজপথ, একপাশে শূন্য মন্দির। দৃশ্যের শুরুতে নেপথ্যে কোলাহল। সংবাহক জুয়াতে দশ টাকার দান হেরে না দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে; তার পিছনে বিজয়ী দ্বিতীয় জুয়াড়ী আর ওস্তাদ মাথুর তাড়া করছে।

(নেপথ্যে) আরে দাদারা—এ ব্যাটা জুয়াতে দশ টাকা হেরে সট্‌কে পড়ল। ওকে ধর্—ধর্—ওরে থাম, থাম, দূর থেকে তোকে ঠিক দেখতে পাচ্ছি!

[ব্যস্ত শঙ্কিত সংবাহকের প্রবেশ]

সংবাহক ঃ ওঃ! কপালে কি গেরো! জুয়াড়ীর এমন দুরবস্থাই হয়! এরা সবাই মিলে আমাকে দড়ি-ফস্‌কানো গাধার মতো ধরে ফেল্ল বলে! তাহলে বেদম মার্‌ধর্ করবে। হায়, হায়! অঙ্গরাজ কর্ণ যেমন বল্লমের ঘায়ে ঘটোৎকচকে সাবাড় করেছিল, এরা সব আমাকেও তেমনি খুঁচিয়ে মারবে।

ওস্তাদ যখন হিসেব নিয়ে ছিলেন অতি ব্যস্ত,
অমনি আমি সট্‌কে পড়ি হ'য়ে ভীষণ ত্রস্ত।
এখন যে হায় পথের মাঝে কোথায় যাই,
ভেবে দেখি মিলবে কি আর এতটুকু ঠাঁই!

জুয়াড়ী আর ওস্তাদ দুজনে মিলে আমাকে গরুখোঁজা খুঁজছে; ঠিক আছে, পিছু হেঁটে ওই ফাঁকা মন্দিরটায় ঢুকে পাথরের দেবতা সেজে দাঁড়িয়ে যাই। (মন্দিরে ঢুকে নানারকম অঙ্গভঙ্গী ক'রে পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চলভাবে অবস্থান)

[ওস্তাদ মাথুর ও দ্বিতীয় জুয়াড়ীর প্রবেশ]

মাথুর ঃ দেখেন দাদারা, জোচ্চোর ব্যাটা দশ টাকা হাপুস ক'রে ভেগে পড়েছে। ওকে ধর্—ধর্, থাম থাম, তোকে ঠিক দেখতে পাচ্ছি!

২য় জুয়াড়ী : ওরে ! পাতালেই যাস্, আর ইন্দ্রের প্রাসাদেই লুকোস্, ওস্তাদ থাকতে স্বয়ং রুদ্রও তোকে বাঁচাতে পারবে না।

মাথুর : তোর সারা গা টালমাটাল, হোঁচট খাস্ পায়েপায়ে ; কুলে কালি দিয়ে, ওস্তাদকে ডুবিয়ে কোথায় পালাবি !

২য় জুয়াড়ী : (রাস্তায় পায়ের ছাপ দেখে) ব্যাটা এ পথ দিয়েই গেছে ! কিন্তু এরপর তো আর পায়ের ছাপ দেখছি না।

মাথুর : (নিপুণভাবে লক্ষ্য ক'রে) আরে ! এখান থেকে দেখছি পায়ের ছাপ উল্টো হ'য়ে গেছে ! (মন্দিরের দিকে তাকিয়ে) মন্দিরটা কি প্রতিমাশূন্য ? শয়তনটা ঠিক পিছু হেঁটে মন্দিরে ঢুকেছে।

২য় জুয়াড়ী : চলুন্ তো ওখানে খুঁজি।

মাথুব : চল।

(মন্দিরে প্রবেশ ক'রে প্রতিমারূপী সংবাহককে নিপুণভাবে পরীক্ষা ক'রে পরস্পরের ইঙ্গিত)

২য় জুয়াড়ী : আচ্ছা একি কাঠের প্রতিমা ?

মাথুর : ওহে ! না, না, পাথরের। (দুজনে সংবাহককে ধরে এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করে) তবে চলে এস। দু-এক দান হয়ে যাক।

(মন্দিরের এক কোনে দুজনে পাশা খেলতে শুরু করল। প্রতিমারূপী সংবাহক তাদের খেলা দেখতে থাকে এবং অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে)

সংবাহক : (স্বগত) ঢাকের শব্দ যেমন রাজ্যহারা রাজার হৃদয় নাচায়,
জুয়ার কর্‌তা কর্‌তা ডাক নির্ধনের বুকে ঢেউ দোলায়।
পাশায় হার আর সুমেরুচূড়া থেকে পতন দুই সমান ;
তাই শপথ করি এ জীবনে কোনদিন খেলবো না পাশা !
তবু হায় পাশার ডাক কুহুরবের মতো জুয়াড়ীর মন টানে।

২য় জুয়াড়ী ঃ আমার দান, আমার দান !

মাথুর ঃ আরে না—না—আমার দান !

(ততক্ষণে সংবাহক নিজেকে সামলাতে না পেরে ছুটে এসে খেলার সামনে হাজির)

সংবাহক ঃ আরে ! আমার দান।

২য় জুয়াড়ী ঃ (সংবাহককে ধরে) ধরেছি ঢ্যামনাকে !

মাথুর ঃ ব্যাটা ধ্বজভঙ্গ ! এবার ধরা পড়েছিস। দশ টাকা ছাড়্—

সংবাহক ঃ আ—আ—আজকেই দেব।

মাথুর ঃ এখনি দে।

সংবাহক ঃ বল্‌ছি তো দেবো। একটু দয়া করুন !

মাথুর ঃ শালা ! এখ্‌খুনি দে।

সংবাহক ঃ আমার মাথা ঘুরেছে ! (মাটিতে পড়ে গেল)

(দুজনে মিলে সংবাহককে ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করতে থাকে)

মাথুর ঃ তুই তবে জুয়াড়ী দলের কাছে বন্ধক হ'য়ে রইলি।

সংবাহক ঃ (সহসা উঠে দাঁড়িয়ে হতাশভাবে) কি ! জুয়াড়ীদেব কাছে বন্ধক ? হায় ! হায় ! ওদের হাতে বাঁধা পড়লে আর মুক্তি নেই। কিন্তু দশ টাকা কোথেকে শোধ দিই ?

মাথুর ঃ ওরে শালা, একটা রফা কর্। রফা কর্।

সংবাহক ঃ তাই কবছি। (২য় জুয়াড়ীর কাছে এসে নীচু গলায়) আপনাকে পাঁচ টাকা দিচ্ছি, পাঁচটা টাকা আমায় মাফ ক'রে দিন।

২য় জুয়াড়ী ঃ ঠিক আছে, তাই দে।

সংবাহক ঃ (মাথুরের কাছে গিয়ে) ওস্তাদ ! পাঁচ টাকা দিচ্ছি, বাকী পাঁচ টাকা রফা ক'রে দাও

মাথুর ঃ (স্বগত) তাতে এমন ক্ষতি কি? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তাই দিলাম।

সংবাহক ঃ (মাথুরকে প্রকাশ্যে) মশাই! অর্ধেক ছাড়লেন তো?

মাথুর ঃ হ্যাঁ, ছেড়েছি।

সংবাহক ঃ (২য় জুয়াড়ীকে প্রকাশ্যে) মশাই! আপনিও অর্ধেক ছাড়লেন তো?

২য় জুয়াড়ী ঃ হ্যাঁ, ছাড়লাম।

সংবাহক ঃ (উভয়কে) এখন তবে যাই?

মাথুব ঃ দশ টাকা মিটিয়ে তবে যাবি। কোথায় পালাবি?

সংবাহক ঃ (দর্শকদের উদ্দেশ্যে) ভদ্দলোকেবা দেখুন, এইমাত্র প্রত্যেকেব কাছে অর্ধেক অর্ধেক মাফ করিয়ে পুরো ছাড় পেলুম; তবু কিনা আমাকে দুর্বল ভেবে টাকা চাইছে।

মাথুব ঃ (সংবাহককে ধ'রে) ফাঁকিবাজ কোথাকার! আমার নাম মাথুব; চালাকি মারছিস! আমায় ঠকাবি? শালা হিজড়ে, পুবো টাকা মিটিয়ে দে।

সংবাহক ঃ কি ক'বে দিই?

মাথুব ঃ তোব বাপকে বিক্রী ক'বে দে।

সংবাহক ঃ কোথায় আমাব বাপ?

মাথুব ঃ তোব মাকে বিক্রী ক'বে দে।

সংবাহক ঃ কোথায় আমাব মা?

মাথুব ঃ নিজেকে বিক্রী ক'বে দে।

সংবাহক ঃ তাহলে আমায় দয়া করুন। বড় রাস্তায় নিয়ে চলুন।

মাথুর ঃ চল্।

সংবাহক ঃ চলুন। (কিছুটা এগিয়ে রাস্তার অভিমুখে তাকিয়ে) এই যে দাদারা! মাত্র দশ টাকা দিয়ে এই ওস্তাদের

কাছ থেকে আমায় কিনবেন ? কি বলছেন ? আমাকে দিয়ে কি হবে ? আপনাদের বাড়ীতে বেগার খাটবো। কি হলো ? আপনারা সবাই উত্তর না দিয়েই চলে যাচ্ছেন ? ঠিক আছে। তবে অন্য লোকের কাছে যাই। (মঞ্চের অন্য দিকে গিয়ে) এই যে মশায়রা ! দশ টাকার বিনিময়ে আমায় কিনবেন কি ? কি ! এরাও পাত্তা দিল না। হায় ! হায় ! চারুদত্তমশায় গরীব হয়েছেন বলেই অমার মতো অভাগাদের এই হাল !

মাথুর ঃ এবার টাকাটা ছাড়্।

সংবাহক ঃ কোত্থেকে দিই ? (মাথুরের পায়ে পড়ল এবং মাথুব তাকে টানাটনি করতে থাকে)

[দর্দুরকের প্রবেশ]

দর্দুরক ঃ ওহে, জুয়াখেলা আর রাজা হওয়া—দুইই সমান। শুধু সিংহানটা জোটে না জুয়াড়ীর কপালে, এই যা পার্থক্য। তাই বলে—

টাকাকড়ি, সুন্দরী বউ, বন্ধু-লাভ জুয়াতেই ঘটে,
ভোগসুখ, দানধর্ম, বাকী সব ছারখারও বটে !

(সম্মুখে দেখে) আরে ! আমাদের সেই ওস্তাদ ! কি করি ? এর হাত থেকে বাঁচা গেল না ! যাক্, কোন রকমে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকি। (শতচ্ছিন্ন চাদরে গা ঢাকতে ঢাকতে) ধ্যুৎ ! ও শালা আমার কি করবে ? ······

মাথুর ঃ (সংবাহককে) ছাড়্ ব্যাটা, টাকা ছাড়্।

সংবাহক ঃ মশায়, কেমন ক'রে দিই ?

[মাথুর সংবাহককে ধ'রে টানাহ্যাঁচড়া করতে থাকে]

দর্দুরক ঃ (দূর থেকে) আরে বাব্বা ! সামনে কি সব কাণ্ড !

হ্যাঁ? কি বলছেন? ওস্তাদ জুয়াড়ীকে পেটাচ্ছে। কেউ ছাড়িয়ে দিচ্ছে না? ওরে রাস্তা ছাড়্, রাস্তা ছাড়্। এই তো শালা মাথুর; ওই তো বেচারা সংবাহক।...ঠিক আছে, আগে মাথুরকে ঠাণ্ডা করি। (মুখোমুখি এসে) এই যে দাদা, নমস্কাব।

মাথুব ঃ নমস্কার।

দর্দুরক ঃ ব্যাপার কি?

মাথুব ঃ আরে এই লোকটা দশ টাকা হেরেছে—

দর্দুরক ঃ দশ টাকা? সে আব এমন কি

মাথুব ঃ (দর্দুরকের বগলে পুঁটলিকরা ছেঁড়া চাদর টেনে খুলে ফেলে) এই যে ভদ্র মশায়েরা, একবার দেখেন! এই লোকটা ছেঁড়া তালিমারা চাদর বগলে ক'রে ঘুরে বেড়ায়, আর বলে কি না যে দশ টাকার কি দাম!

দর্দুরক ঃ আরে বুদ্ধু, আমি এক দানে দশ টাকা শোধ ক'রে দিতে পারি। যার টাকা আছে, সে কি টাকা কোলে ক'রে দেখিয়ে বেড়ায়? অজাত কোথাকার, উচ্ছন্নে গেছিস! দশ টাকার জন্য একটা জলজ্যান্ত লোককে খুন করবি?

মাথুব ঃ মশায়, আপনার কাছে দশ টাকাব দাম নেই; আমার কাছে অনেক দাম।

দর্দুবক ঃ আচ্ছা, তাহলে এক কাজ কর, ওকে আরও দশটা টাকা দাও; তাই দিয়ে আর একবার রেস্ত খেলুক।

মাথুব ঃ তাতে হবেটা কি?

দর্দুরক ঃ যদি জিতে যায় তোমার টাকা পুরো শোধ পাবে।

মাথুর ঃ যদি হারে?

দর্দুরক ঃ তাহলে পাবে না।

মাথুর ঃ নাঃ, তোর্ সঙ্গে বক্‌বক্ ক'রে লাভ নেই। এই শালা

জোচ্চোর! এমন লম্বা লম্বা বাত মারছিস্, ওর হয়ে টাকাটা তুই মিটিয়ে দে না। দেখ্ আমি হলাম ধড়িবাজ মাথুর; জুয়াতে আমার সঙ্গে নক্সাবাজি! কোন শালাকে ভয় পাই নে। পাজি, ছিনাল কোথাকার—

দর্দুরক : আরে কে ছিনাল?

মাথুর : তুই ছিনাল।

দর্দুরক : আরে, তোর বাপ ছিনাল। (এই সুযোগে সংবাহককে পালিয়ে যেতে ইঙ্গিত করে)

মাথুর : বটে রে মাগীর ব্যাটা! তুই এমন জোচ্চুরি ক'রে জুয়ো খেলিস্?

দর্দুরক : জোচ্চুরি করি বেশ করি।

মাথুর : এই শালা সংবাহক, দশ টাকা দে।

সংবাহক : আজই দেব, এখ্খুনি দেব।

[ক্রুদ্ধ মাথুর সংবাহককে উৎপীড়ন করতে থাকে]

দর্দুরক : এই ছ্যাচড়া! অসাক্ষাতে যা করিস্ করবি, আমার সামনে মার্ধোর্ করবি না।

[ইত্যবসরে মাথুর সংবাহকের নাকে সজোরে এক ঘুঁসি মারে। সংবাহকের পতন ও মূর্ছা। দর্দুরক উভয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়; তারপর মাথুর ও দর্দুরকের মারামারি শুরু হয়]

মাথুর : আরে শালা খানকির ছেলে, এর ফল তুই পাবি।

দর্দুরক : বেজন্ম কোথাকার! রাস্তার মধ্যে মারলি? কাল যদি রাজবাড়ীতে আমার গায়ে হাত তুলিস্, তখন দেখবি—

মাথুর : হ্যাঁ রে, দেখব।

দর্দুরক : কেমন ক'রে দেখবি?

মাথুর ঃ (চোখ দুটি বড় বড় ক'রে) এমনি ক'রে দেখব।
[সঙ্গে সঙ্গে দর্দুরক মাথুরের চোখের মধ্যে এক মুঠো ধুলো ছুঁড়ে দিল। এমন সময় সংবাহক উঠে দাঁড়িয়েছে ; দর্দুরক তাকে পালাবার ইঙ্গিত দেয়। মাথুর চোখ রগড়াতে থাকে এবং চোখের জ্বালায় মাটিতে পড়ে যায়। এই সুযোগে সংবাহক পালিয়ে গেল]

দর্দুরক ঃ ইস্‌স্‌! শহরের জুয়াড়ী সর্দারের সঙ্গে ঝগড়া লেগে গেল! আর তো এখানে বাস করা যাবে না। তবে প্রিয় বন্ধু শর্বিলক বলেছেন বটে আর্যক নামে এক গোয়ালার সন্তান নাকি রাজা হতে চলেছেন। নেতারা এমন সব কথা কানাঘুষো কচ্ছেন। আসলে আমার মতো লোকেরাই তো তাকে মদত দিচ্ছে। আচ্ছা, এখন তাহলে তার সন্ধানেই চলি। (প্রস্থান)

পাষণ্ড-সমাগম

[প্রবোধচন্দ্রোদয়। দ্বিতীয় অঙ্ক]

কৃষ্ণমিশ্র-বিরচিত ছয় অঙ্কের নাটক প্রবোধচন্দ্রোদয়। রচনাকাল আনুমানিক চতুর্দশ শতক। সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ। মহামায়ার অজ্ঞান-আবরণে জীবের নিকট আত্মার স্বরূপ রহস্যে আবৃত। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যাপ্রপঞ্চ। সগুণ পরমাত্মাই হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বর ও মায়ার মিলনে মনের জন্ম ; তার দুই স্ত্রী—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিমার্গে ভোগসুখের বশে জীব বিবিধ কর্মে লিপ্ত হয়ে কামক্রোধাদির বশবর্তী হয়, আর নিবৃত্তিমার্গে বিবেকের নির্মল দৃষ্টিতে মহামোহের দুষ্ট শক্তি অপসারিত হলেই প্রবোধচন্দ্রের উদয় অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি—তারই নাম মোক্ষ অর্থাৎ আত্যন্তিক

দুঃখনিবৃত্তি। এই নাটকে বিবেক ও মহামোহ পরস্পর বিরোধী পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই রাজা। শম, দম, মতি, বিদ্যা প্রভৃতির সহায়তায় মহারাজ বিবেক আত্মার মুক্তিসাধনে সচেষ্ট। অন্যদিকে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, তৃষ্ণা প্রভৃতি অনুচর এবং চার্বাক, ক্ষপণক প্রভৃতি নাস্তিকদের সহযোগিতায় রাজা মহামোহ বিবেকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। উভয় পক্ষের ঘাঁটি হয়েছে মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী।

কুশীলব ঃ

মহামোহ—বিবেকের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা

কাম, ক্রোধ, অহংকার } মহামোহের মন্ত্রী

লোভ—অহংকারের পুত্র

দম্ভ—লোভের পুত্র।

তৃষ্ণা—লোভের স্ত্রী

হিংসা—ক্রোধের স্ত্রী

মিথ্যাদৃষ্টি—মহামোহের উপপত্নী

বিভ্রমাবতী—মিথ্যাদৃষ্টির সখী

বটু—দম্ভের অনুচর

চার্বাক—নাস্তিক-শিরোমণি

এবং দৌবারিক, চার্বাকশিষ্য ও পারিষদ্‌গণ

[দম্ভের প্রবেশ]

দম্ভ ঃ মহারাজ মহামোহ আমায় আদেশ করেছেন, 'বৎস দম্ভ, রাজা বিবেক অমাত্যদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে 'প্রবোধচন্দ্রের' অভ্যুদয় ঘটাবেন। তাই প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে শম, দম ও অন্যান্যকে প্রেরণ করেছেন। আমাদের বংশ লুপ্ত হওয়ার উপক্রম; তোমরা সকলে এর প্রতিবিধান কর। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী নগরী। অতএব তোমরা সেখানে গিয়ে ব্রহ্মচারী, গৃহী, বাণপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী—সকলের মুক্তিপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিশেষ সংগ্রাম চালাও।' সেই কারণে আমি সমগ্র বারাণসী করায়ত্ত করেছি, আর

প্রভুর আদেশ পালন ক'রে কার্যসিদ্ধির জন্য পাষণ্ডদের নিয়োগ করেছি ; তাই—

ধূর্তগণ বেশ্যা-গৃহে সুরাগন্ধী মুখ-মধু করিয়া সেবন,
মন্মথোৎসব-রসে সমস্ত চাঁদিনী রাত করিয়া যাপন,
বলে 'মোরা সর্বজ্ঞ, মোরা চির-অগ্নিহোত্রী ব্রহ্মজ্ঞ তাপস'।
এইরূপে জগতেরে করে তারা প্রবঞ্চনা হইলে দিবস ॥*

(দূরে দেখে) ভাগীরথী পেরিয়ে ঐ পথিক এ-দিকেই আসছেন। উনি দেখছি—

আত্ম-অহংকারের ছটায় জগতকে যেন গ্রাস করছেন,
বাক্-চাতুর্যে যেন সকলকে তিরস্কার করছেন,
পাণ্ডিত্যের অভিমানে যেন উপহাস করছেন।

মনে হচ্ছে দক্ষিণ রাঢ় দেশের অধিবাসী। তাহলে এঁর কাছে অহংকারের সংবাদটা জানা যাবে।

[পূর্ববর্ণিত অহংকারের প্রবেশ]

অহংকার ঃ জগৎটা দেখছি মূর্খে ভরা ! এরা সব—

গুরু প্রভাকরের মত, আর কুমারিলের দর্শন,
অথবা শারিক-শাস্ত্রের তত্ত্ব—শোনেনি কিছুই ;
বাচস্পতির ন্যায়শাস্ত্রের কথা তুলে কি লাভ ?
মহোদধিসূক্ত কিংবা মহাব্রতী পাশুপত সবই অজ্ঞাত।
পশুবৎ নরগণ কি বোঝে সূক্ষ্ম বস্তুতত্ত্ববিচার ?

বেদবিরোধী পণ্ডিতদের মতো এরা আপন আপন শাস্ত্র পড়েই যায়, মাথায় ঢোকে না কিছু ! (মঞ্চের অন্যত্র গিয়ে) শুধু ভিক্ষার লোভে মুণ্ডিতমস্তক এই সন্ন্যাসীদের দল আত্মম্ভরিতায় মত্ত হয়ে আছে, আর দোষ দিচ্ছে বেদান্তশাস্ত্রের ! (উপহাসের সুরে) বেদান্তীরা যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরুদ্ধবাদী হন, তবে বৌদ্ধদের অপরাধ কি ? এদের কথা শোনাও

পাপ। (অন্যদিকে গিয়ে) এখানে দেখছি শৈব পাশুপত গোষ্ঠীর লোকেরা আর অক্ষপাদ মতালম্বী পাষণ্ড পশুর দল! এদের সঙ্গে আলাপ করলেও নরকবাস হয়! পাপিষ্ঠদের দর্শনপথ পরিহার করাই বিধেয়। (অন্যদিকে গিয়ে) এখানে দেখা যাচ্ছে দ্বৈত-অদ্বৈত-পরিত্যাগীরা ত্রিদণ্ডী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। (এগিয়ে গিয়ে) এ তো মনে হচ্ছে কোন গৃহস্থের বাড়ী। দিনকয়েক এখানে থাকলে কেমন হয়?

[বাড়ীতে ঢুকতে গেলে দম্ভ হুংকার দিয়ে নিষেধ করেন। এমন সময় বটু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বালকের প্রবেশ]

বটু ঃ মশাই, দূরেই দাঁড়ান। পদ প্রক্ষালন ক'রে এই আশ্রমে ঢুকতে হয়।

অহংকার ঃ আরে আরে দুরাচার! এ তো দেখছি তুর্কীস্থান বানিয়ে ফেলেছে। অতিথিকে পাধোওয়ার জল পর্যন্ত দিলে না!

[দম্ভ হাতের ইঙ্গিতে তাকে আশ্বস্ত করেন]

বটু ঃ এ আমার গুরুদেবের আদেশ। আপনি তো বিদেশ থেকে আসছেন, কুলশীল সবই অজ্ঞাত।

অহংকার ঃ এ্যাঁ! আমাদেরও কুলশীল পরীক্ষা করতে হবে? শোন

গৌড় নামে অনুত্তম রাষ্ট্রে রাঢ় নগরী,
সেখানে ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামে মহাজন পিতা আমার।
কে না জানে তাঁর মহামান্য গুণবান পুত্রদের?
বিদ্যা-বুদ্ধি-বিনয়-আচারে আমি তাদের সর্বোত্তম।

[দম্ভ বালককে ইঙ্গিত করলে সে তামার ঘটিতে জল নিয়ে এল]

বটু ঃ প্রভু, এই আপনার পাদ্য।

অহংকার ঃ (মনে মনে) যাই হোক, এতে আর দোষ কি? (বালকের হাত থেকে জলের ঘটি নিয়ে এগিয়ে

এলেন। দম্ভ দাঁত কড়মড় করে বটুর দিকে তাকালেন)

বটু ঃ মশাই, একটু দূরে দাঁড়ান ; কি জানি আপনার গায়ের ঘামের ফোঁটাগুলো উড়ে আসতে পারে।

অহংকার ঃ আহা-হা-! ব্রাহ্মণত্বের কি অপূর্ব মহিমা!

বটু ঃ মহিমাই তো।

অহংকার ঃ (স্বগত) ওঃ, এ তাহলে দম্ভের রাজ্য। (প্রকাশ্যে) যাই হোক এই আসনটায় একটু বসি। (বসতে গেলেন)

বটু ঃ আরে আরে করেন কি ? গুরুদেবের আসনে কেউ বসতে পারে না।

অহংকার ঃ ওরে নরাধম, আমরা হলেম দক্ষিণ রাঢ়ের শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ। এ আসনে অনায়াসে বসতে পারি। শোন্ রে মূর্খ—আমার জননীর বংশ যদিও তেমন উজ্জ্বল নয়, আমার ধর্মপত্নী এক উচ্চ বংশের কন্যা। তাই কুল-মর্যাদায় আমি পিতাকেও ছাড়িয়ে গেছি। একবার আমার শ্যালকের ভাগিনেয়ের কন্যার নামে মিথ্যা বদনাম রটেছিল, আমি তৎক্ষণাৎ সেই অপবাদে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছি।

দম্ভ ঃ মশাই, তাই নাকি ? তাহলে আমার ঘটনা আপনি জানেন না—বহুপূর্বে একবার গিয়েছিলাম ব্রহ্মার গৃহে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে মুনিরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর স্বয়ং ব্রহ্মা আমার অনুমতি নিয়ে গোময় সলিলে উরু মার্জিত করলেন এবং আমাকে সাদরে তার কোলে বসালেন।

অহংকার ঃ (স্বগত) অহো! দাম্ভিক ব্রাহ্মণের কি আত্মম্ভরী কথা! (কিছুক্ষণ চিন্তা করে) ওঃ, ইনিই তো স্বয়ং

দম্ভ। আচ্ছা। (প্রকাশ্যে) আরে এত অহংকার কিসের? ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অথবা ঋষিদের জনকই হোন, আমার কাছে তারা সবাই অতি তুচ্ছ। আমার তপস্যার যা শক্তি, তার দ্বারা শত শত ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র আর মুনিঋষিদের পরাজিত করতে পারি।

দম্ভ: (সানন্দে) তাই তো বলি। আপনি আমাদের পিতামহ অহংকার। ঠাকুরদা, আমি হলেম লোভের পুত্র, নাম দম্ভ।

অহংকার: বৎস, দীর্ঘজীবী হউ। যখন দ্বাপরের শেষ, তখন তোমাকে বালক দেখেছিলাম। এখন বুড়ো হয়েছি, তাই ঠিক চিনতে পারি নি। আচ্ছা, তোমার পুত্র অসত্য কুশলে আছে তো?

দম্ভ: আজ্ঞে হাঁ। মহামোহের আদেশে সেও এখানেই আছে। তাকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্তও থাকতে পারি না।

অহংকার: তোমার পিতা 'লোভ' আর মাতা 'তৃষ্ণা' কুশলে আছে তো?

দম্ভ: আজ্ঞে হাঁ; তাঁরাও এখানে! আচ্ছা, কি উদ্দেশ্যে আপনার এখানে আগমন?

অহংকার: শুনছি বিবেক মহামোহকে বিপদে ফেলতে চাইছে। সেই সংবাদটা নিতেই এখানে এসেছি।

দম্ভ: আপনাকে স্বাগত জানাই। শুনলুম ইন্দ্রলোক থেকে মহামোহ আসছেন, বারাণসী তাঁর রাজধানী হবে।

অহংকার: তার কারণ?

দম্ভ: বিবেকের কাজে বাধা দেওয়া।

[পারিষদগণের সঙ্গে মহামোহের প্রবেশ]

মহামোহ: (উচ্চ হাস্যে) কি আশ্চর্য! এই মূর্খগুলোর তুলনা

হয় না। এরা বলে, দেহ ছাড়া আছে এক বিদেহ আত্মা, মৃত্যুর পরেও সেই আত্মা নাকি কর্মফল ভোগ করে। এ যেন রমণীয় আকাশকুসুমের সুমিষ্ট ফল! এই সব জড়বুদ্ধিরা নানান পদার্থতত্ত্বের কল্পনা ক'রে জগৎটাকে বঞ্চনা করছে।

বাচাল আস্তিক সত্যবাদী নাস্তিকের বৃথা নিন্দা করে,
মিথ্যা যুক্তিজালে 'নাস্তি'কে 'অস্তি' কবে সদা;
তত্ত্বমতে ভেবে দেখ সবে—কি আশ্চর্য কথা!
দেহাতীত আত্মার পৃথক অস্তিত্ব কি কখনো সম্ভব?

আরও দেখ—এরা শুধু অন্যকে প্রতারণা করে তাই নয়, নিজেদেরও ঠকাচ্ছে। সব মানুষেরই মুখাদি অবয়ব সমান, তাহলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, প্রভৃতি জাতিভেদ কি ক'বে সম্ভব হয়? 'পরের স্ত্রী', 'পবের সম্পদ' এইসব ভেদজ্ঞান কেন আমরা তা বুঝতে পারি না। যারা কাপুরুষ তারাই ব'লে বেড়ায় যে হিংসা, পরস্ত্রীগমন, পরেব সম্পদ্ গ্রহণ—এ সব পাপ কাজ। যাক্ শোন—লোকায়ত দর্শনই হোল শাস্ত্র; প্রত্যক্ষই প্রমাণ; পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারটি তত্ত্ব। অর্থ আর কাম জীবনের মূল উদ্দেশ্য। পঞ্চভূতের মিলনই জীবদেহের চৈতন্য; পবলোক বলে কিছু নেই, মৃত্যুই মোক্ষ। আমাদের এই সব তত্ত্বকথা সংগ্রহ ক'রে স্বয়ং বৃহস্পতি চার্বাককে শিক্ষা দেন এবং তাঁর শিষ্য-পরম্পরায় এই দর্শন পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছে।

[শিষ্যের সঙ্গে চার্বাকের প্রবেশ]

চার্বাক: (শিষ্যকে) বৎস, জান তো দণ্ডনীতিই হোল বিদ্যা, অর্থনীতি তার অন্তর্গত। বেদ হচ্ছে ধূর্তদের প্রলাপ। কখনো দেখলাম না যে বেদ পড়ে কারো স্বর্গলাভ

হয়েছে। তাছাড়া দেখো—যাজ্ঞিকেরা বলেন যে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে হাতে হাতে ফল পাওয়া যায় না বটে, তবে মৃত্যুর পরে স্বর্গলাভ হয়; তাহলে দাবাগ্নিতে বনের তরুলতা দগ্ধ হওয়ার পরেও তাদের ফুলফল জন্মানো উচিত। আবার দেখো—যজ্ঞে প্রাণিবধ করলেই যদি স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটত, তাহলে গৃহী মানুষ আপন আপন পিতাকে বলি দিয়েই স্বর্গ লাভ করতে পারে। অধিকন্তু যদি শ্রাদ্ধ করলে মৃত্যুর পরেও মানুষের তৃপ্তি হয়, তাহলে প্রদীপ নিভে যাওয়ার পরেও তাতে তেল দিলে আগুনের শিখা দরদর ক'রে জ্বলে ওঠা উচিত।

শিষ্য ঃ আচ্ছা গুরুদেব! ইচ্ছামত খাওয়া বা পান করাই যদি পুরুষার্থ হয়, তাহলে এই সব আস্তিকেরা সংসারসুখ ছেড়ে কঠোর সাধনা করতে গিয়ে নিজেরা এত কষ্ট ভোগ করে কেন?

চার্বাক ঃ আরে যতো সব ধূর্ত পণ্ডিতেরা বেদ রচনা ক'রে মূর্খদের ঠকাচ্ছে; পরকালের আশা-মোদক খাইয়ে তাদের বুঁদ করে রেখেছে। ভেবে দেখ—

কোথায় আয়তলোচনা সুন্দরীর বাহুমূলে মধুর পীড়ন,
আর নিটোল উন্নত উরসের মনোহর আলিঙ্গন!
কোথায় বা নির্বোধের ভিক্ষা-উপবাস-ব্রত-সূর্যউপাসনা?

শিষ্য ঃ কিন্তু গুরুদেব, তীর্থিকেরা বলেন যে সংসার সুখদুঃখে ভরা; একে পরিহার করাই বিধেয়।

চার্বাক ঃ ধুৎ! ও সব হোল নরপশুদের দুর্বুদ্ধিবিলাস!

মহামোহ ঃ ওহে, অনেক দিন পর এমন প্রামাণিক শাস্ত্রকথা শুনে শ্রুতিসুখ বাড়ল। (ভালো ক'রে দেখে সানন্দে) একি! প্রিয়বন্ধু চার্বাক যে!

চার্বাক : মহারাজ মহামোহ ! জয়তু মহারাজ। চার্বাকের প্রণাম নিন।

মহামোহ : শুভ আগমন। এখানে বোস।

চার্বাক : (বসে) কলি আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়েছেন।

মহামোহ : তার সব কুশল তো ?

চার্বাক : মহারাজের কৃপায় সর্বাঙ্গীণ কুশল। তিনি প্রভুর আদিষ্ট কাজ সেরে ফিরে এসে শ্রীচরণ দর্শন করবেন।

মহামোহ : আচ্ছা, কলি তার কাজে কতটা সফল হয়েছে ?

চার্বাক : কলির প্রভাবে মহাজনেরা আপন আপন ধর্মপথ ছেড়ে স্বেচ্ছামত বৃত্তি অবলম্বন করেছেন। অবশ্য এতে আমার বা কলির কোন কৃতিত্ব নেই ; সবই মহারাজের কৃপা। উত্তরপথিক এবং পাশ্চাত্যেরা বেদ পরিত্যাগ করেছে ; শম, দম প্রভৃতির কথা আর কি বলব ? বাকী সবাই বেদকে জীবিকারূপে গ্রহণ করেছে। আমাদের আচার্য মহাশয় তাই বলেন—অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, ত্রিদণ্ড ধারণ, আর দেহে ভস্মলেপন—এ সবই হোল পৌরুষহীন জড়বুদ্ধি লোকদের জীবিকা অর্জনের উপায় মাত্র। তাই বলি, মহারাজ, এমন কথা স্বপ্নেও ভাববেন না যে কুরুক্ষেত্র বা অন্য কোথাও বিদ্যা ও প্রবোধের আবির্ভাব ঘটবে।

মহামোহ : তাহলে কলির প্রভাবে সে'সব তীর্থস্থানের দফা রফা হয়ে গেছে।

চার্বাক : মহারাজ, আর একটি সংবাদ আছে—

মহামোহ : কি সংবাদ ?

চার্বাক : বিষ্ণুভক্তি নামে এক মহাশক্তি যোগিনীর উদয় হয়েছে !

মহামোহ : ···কাম, ক্রোধ প্রভৃতি উপস্থিত থাকতে তার কি শক্তি !

চার্বাক : তবু ক্ষুদ্র শত্রু ব'লে উপেক্ষা করাটা ঠিক নয়।

মহামোহ ঃ (নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) ওরে কে আছিস ?

[দৌবারিকের প্রবেশ]

দৌবারিক ঃ জয়তু মহারাজ। প্রভুর কি আদেশ ?

মহামোহ ঃ ওহে অসৎসঙ্গ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য প্রভৃতিকে আমার আদেশ জানাও যে তারা যেন যোগিনী বিষ্ণু-ভক্তির কাজে সযত্নে বাধা দেয়।

দৌবারিক ঃ যথা আজ্ঞা মহারাজ। [প্রস্থান]

[পত্রহস্তে দূতের প্রবেশ]

দূত ঃ মহারাজের জয়। পত্রখানি দেখতে অনুগ্রহ হোক।

মহামোহ ঃ তোমাব আগমন ?

দূত ঃ পুরুষোত্তম দেশ থেকে।

মহামোহ ঃ (স্বগত) সেখানে তাহলে কি কোন অনিষ্ট ঘটেছে ? (প্রকাশ্যে) ওহে চার্বাক, তুমি সেখানে যাও, আর ভালো ক'রে মন দিয়ে কাজ কর।

চার্বাক ঃ যথা আজ্ঞা মহারাজ। [প্রস্থান]

মহামোহ ঃ (পত্র হাতে নিয়ে পাঠ) স্বস্তি, বারাণসীর মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর মহামোহের শ্রীচরণকমলযুগলে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক মদ ও মানের নিবেদন—আমাদের মঙ্গল জানিবেন। পরন্তু দেবী শান্তি ও তদীয়া মাতা শ্রদ্ধা বিবেকের সহিত উপনিষদ্‌দেবীর মিলনের জন্য দূতীর কার্য করিতেছে এবং উপনিষদকে এই কার্যের জন্য নিরন্তর প্রোৎসাহিত করিতেছে। অন্যদিকে বৈরাগ্য ও অন্যান্যেরা কামের সহচর ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টায় নিরত ; সেই কারণে ধর্ম কামকে পরিত্যাগপূর্বক গোপনে বিচরণ করিতেছে। বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া মহারাজ কর্তব্য নির্ধারণ করিবেন।

মহামোহ ঃ (সক্রোধে) বটে ! এই মূর্খেরা শান্তিকেও ভয় পায় ?

কাম, ক্রোধ ও অন্যান্যেরা বর্তমান থাকতে শান্তির কতটুকু শক্তি ?…… (দূতের প্রতি) ওহে বৎস, তুমি সত্বর কামের নিকটে গিয়ে আমার আদেশ জানাও। বলবে, দুরাত্মা ধর্মের অভিপ্রায় আমরা জানতে পেরেছি। এক মুহূর্তেব জন্যও তাকে বিশ্বাস কোর না, সেখানেই বন্দী ক'রে আটকে বেখো।

দূত : যথা আদেশ মহারাজ। [প্রস্থান]

মহামোহ : (স্বগত) এখন শান্তিকে দমনের উপায় কি ? কিংবা অন্য উপায়েব প্রয়োজনই বা কি ? ক্রোধ আর লোভকে ও ব্যাপারে নিযুক্ত করলেই হবে। (প্রকাশ্যে) ওবে কে আছিস ?

[দৌবারিকের প্রবেশ]

দৌবারিক : আদেশ করুন মহারাজ।

মহামোহ : ক্রোধ ও লোভকে ডেকে নিয়ে আয়।

দৌবারিক : যথা আদেশ। [প্রস্থান]

[ক্রোধ ও লোভের প্রবেশ]

ক্রোধ : আমি সেই রকমই শুনেছি যে শান্তি, শ্রদ্ধা ও বিষ্ণুভক্তি মহারাজের প্রতিকূলতা আচরণ করছে। ওরে, আমি জীবিত থাকতে কেন তাদের এই দুঃসাহস। শোন্—

অন্ধ করিতে পারি এ তিন ভুবনে,
বধীর করিতে পারি ধীরচিত্ত জনে।

আর তার ফলে আমার বশবর্তী হয়ে সবাই আপন কর্তব্য ভুলে যাবে, হিতবাক্যে কান দেবে না, বুদ্ধিমানেরা শাস্ত্রবাক্য অবহেলা করবে।

লোভ : ওহে, যারা আমার পাল্লায় পড়ে, তারা আশা-নদীই পেরোতে পারে না, শান্তিটান্তির কথা ভাববে কখন ? (নেপথ্য অভিমুখে দেখে) প্রিয়ে, এদিকে এসো।

[তৃষ্ণার প্রবেশ]

তৃষ্ণা : কি আদেশ নাথ ?

লোভ : প্রিয়ে শোন, ক্ষেত্র-গ্রাম-অরণ্য-পর্বত-নগর-দ্বীপ অথবা ভূমণ্ডলের যে কোন স্থানে লোভের আশায় যাদের মন বদ্ধ—তারা যতই পায়, লালসা ততই বেড়ে চলে। ওগো দেবী তৃষ্ণা, তুমি যদি প্রসন্ন হও, আর তোমার উত্তুঙ্গ অঙ্গগুলি বিস্তার কর তাহলে কোটি ব্রহ্মাণ্ড লাভ করলেও তাদের মনে শান্তি আসবে না।

তৃষ্ণা : প্রিয়তম, আমি তো স্বয়ং দীর্ঘকাল এ কাজে নিযুক্ত আছি। বিশেষত, তুমি যখন পুনরায় আদেশ করছ, কোটি ব্রহ্মাণ্ডেও আমার উদরপূরণ হবে না।

ক্রোধ : (নেপথ্য অভিমুখে দেখে) প্রিয়ে, এদিকে এস।

[হিংসার প্রবেশ]

হিংসা : নাথ, এই ত আমি। কি আদেশ ?

ক্রোধ : সুন্দরী, তুমি ধর্মচারিণী হয়ে আমার পাশে থাকলে পিতামাতাকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হবো না। (দেখে) ওই তো আমাদের মহারাজ, ওঁর কাছেই যাই। (এগিয়ে এলেন) প্রভুর জয় হোক।

মহামোহ : দেখ, শ্রদ্ধার কন্যা শান্তি আমাদের উপর বিদ্বেষ-পরায়ণা ; তোমরা তাকে নিগৃহীত কর।

উভয়ে : যথা আদেশ মহারাজ। [প্রস্থান]

মহামোহ : শ্রদ্ধার এই মেয়েটিকে নিপীড়ন করার অন্য এক উপায়ও আমার মনে এসেছে। আমার দলে মিথ্যাদৃষ্টি নামে এক প্রগল্‌ভা বারবিলাসিনী আছে, এ কাজে তাকেই নিয়োগ করি। ওগো বিভ্রমাবতী, সত্বর মিথ্যাদৃষ্টিকে ডাক দাও।

বিভ্রমা ঃ যথা আজ্ঞা মহারাজ। (বেরিয়ে গিয়ে মিথ্যাদৃষ্টির সঙ্গে পুনঃপ্রবেশ)

মিথ্যা ঃ সখী, অনেকদিন হোল মহারাজ আমার সঙ্গলাভে বঞ্চিত; আমাকে দেখলে উনি আবার তিরস্কার করবেন না তো?

বিভ্রমা ঃ সই, তোকে দেখলে আমাদের মহারাজের বিবেকবুদ্ধি লোপ পায়; নিজের কথাই ভুলে যান, আবার কিনা বকাবকি?

মিথ্যা ঃ এমন মিথ্যা সৌভাগ্যের কথা ব'লে কেন মিছেমিছি প্রতারণা করছিস?

বিভ্রমা ঃ তোর সৌভাগ্য মিথ্যা না সত্যি তা এখ্‌খুনি দেখতে পাবি। ওলো এদিকে তোব চোখদুটি যে একেবারে ঢুলুঢুলু কবছে। প্রেমসুখের অনিদ্রায় রাত্রি জাগরণ বুঝি?

মিথ্যা ঃ সখী, একজন পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হলেই নিদ্রা দুর্লভ; আর আমি তো বহুচারিণী।

বিভ্রমা ঃ ওলো সই, তোর নাগর কে কে বলতো?

মিথ্যা ঃ প্রথমে মহারাজ মহামোহ, তারপর কাম, ক্রোধ, লোভ, অহংকার আরও কত আছে। এ বংশে যারা যারা জন্মেছে—বালক, যুবক, বৃদ্ধ সবাই আমার দিনরাতের প্রেমিক।

বিভ্রমা ঃ আচ্ছা দেখ, কামের রতি, ক্রোধের হিংসা, লোভের তৃষ্ণা—সবারই ঘরে তো একটি ক'রে ঘরণী রয়েছে; তাদের স্বামীরা তোকে নিয়ে বাত কাটায়—তারা তোকে হিংসা করে না?

মিথ্যা ঃ ওলো হিংসা করবে কেন? তারাও যে আমার কাছে আসে।

বিভ্রমা : তাহলে বলতে পারি, তোর মতো সৌভাগ্যবতী কেউ নেই।

মহামোহ : (মিথ্যাদৃষ্টিকে দেখে) এই তো সুন্দরী মিথ্যাদৃষ্টি উপস্থিত।
এস প্রিয়ে, অঙ্কে মোর,
দাও নখক্ষতচিহ্ন অঙ্কপালী আলিঙ্গন ;
ওগো হরিণাক্ষী, দেখাও বিলাসলীলা—
শঙ্করের কোলে আদরিণী পার্বতীর মতো।
(মিথ্যাদৃষ্টি স্মিতহাস্যে যথাপ্রার্থিত আচরণ করলেন)

মহামোহ : (সোল্লাসে) আহা-হা ! প্রিয়ার আলিঙ্গনে যেন নব-যৌবন ফিরে পেলাম। সুন্দরী, তোমার স্পর্শসুখে মানসবৃত্তি যেন তিরোহিত, প্রৌঢ় প্রেম নবায়িত, প্রণয়চেতনা সঞ্জীবিত হোল।

মিথ্যা : মহারাজ, আমিও যেন নবযৌবনা হলেম। দেখুন, গভীর প্রেম কোন কালেই ছিন্ন হয় না। এখন আদেশ করুন প্রভু কেন আমায় স্মরণ করেছেন ?

মহামোহ : ওগো বামোরু সুন্দরী,
হৃদয়বাহিরে যে, তাকেই স্মরণ করি ;
হৃদয়-মন্দিরে মম
তুমি আছ প্রিয়ে পুত্তলিকা সম।

মিথ্যা : এ আপনার অশেষ অনুগ্রহ।

মহামোহ : তুমি যেমন সর্বত্র অঙ্গবিলাস প্রকাশ ক'রে বেড়িয়েছ, ঠিক তেমনই আচরণ করবে। হাঁ, আর একটি কথা আছে—বিবেকের সঙ্গে উপনিষদের মিলন ঘটিয়ে দিতে দাসীর বেটি শ্রদ্ধা কুটনীর কাজ করছে। তাই—
প্রতিকূলা দুষ্কুলা পাপে রতা পাপিনী সে,
কেশে আকর্ষিয়া সে রণ্ডা নারীরে
ভোগ্যরূপে দাও যত পাষণ্ডের হাতে।

মিথ্যা ঃ এই তুচ্ছ কাজের জন্য প্রভুর এত চিন্তা কেন? সেই শ্রদ্ধা প্রভুর এক কথায় দাসীর মতো আজ্ঞা পালন করবে। ধর্ম মিথ্যা, মোক্ষ মিথা, বেদ মিথ্যা, শাস্ত্রবাক্য সব সুখের বাধা, তাই মিথ্যা, স্বর্গলাভও মিথ্যা—এই সব বুঝিয়ে আমি তাকে ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত করব; তখন সে যে উপনিষদ নামে নষ্ট মেয়েটাকে ছাড়বে তাতে আর সন্দেহ নেই। আরও যখন বলবো যে মোক্ষের মধ্যে লৌকিক সুখ নেই, তখন শ্রদ্ধা উপনিষদ্‌কে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে।

মহামোহ ঃ প্রিয়ে, তাই যদি পারো, তবে সত্যি বড়ো খুশী হবো।
(পুনর্বার আলিঙ্গন ও চুম্বন)

মিথ্যা ঃ প্রভু, সর্বসমক্ষে এমন আচরণ করলে বড়ো লজ্জা পাই।

মহামোহ ঃ তাই বুঝি, চলো তবে প্রমোদকক্ষে যাই।[১]

[সকলের প্রস্থান]

কর্পূর-মঞ্জরী

[প্রথম জবনিকা]

প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত কবি, নাট্যকার ও আলংকারিক মহারাষ্ট্রনিবাসী রাজশেখর রাজা মহীপালের (১০ম খৃঃ) সভাপণ্ডিত-রূপে বিদুষী পত্নী অবন্তীর চিত্তবিনোদনের জন্য প্রাকৃত ভাষায় চার অঙ্কের নাটক 'কর্পূরমঞ্জরী' রচনা করেন। এর বিষয়বস্তু হোল রাজা চন্দ্রপালের সঙ্গে জনৈকা রাজকুমারীর প্রণয়।

পাত্র-পাত্রী ঃ রাজা, রাজমহিষী, বিদূষক, মহিষীর সখী বিচক্ষণা ও চেটী। স্থান—রাজার অন্তঃপুর।

১। এই নাট্যাংশের তারকাচিহ্নিত কবিতাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ।

বিদূষক : ওগো মেয়েরা, দেখ, আমি হলেম তোমাদের মধ্যে সব চাইতে সেরা পণ্ডিত। (চেটিকে) জানিস আমার শ্বশুরের শ্বশুর মস্ত এক পণ্ডিতের বাড়ীতে মোটা মোটা বই কাঁধে নিয়ে বয়ে বেড়াতেন।

চেটী : (সহাস্যে) তবে তো দেখছি আপনারা চোদ্দপুরুষ বরাবর পণ্ডিত।

বিদূষক : (সক্রোধে) আরে আরে ঝিয়ের বেটী ঝি! আগামী দিনের কুটনী! কুলক্ষণা, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীনা! আমি কি এমন মূর্খ যে তুইও আমাকে ঠাট্টা করছিস্! ওরে পরপুত্রনষ্টকারিণী! তুই তো ভ্রমরের মতো ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াস্। রাজপথলুণ্ঠনী! অর্থহারিণী! দুষ্টসঙ্গিনী! আমাদের বংশে সবাই পণ্ডিত সেটা কি আমার দোষ নাকি? (সকলকে) দেখুন, অকাল-জলদের বংশে যাদের জন্ম, তাদের পাণ্ডিত্য বংশগত। আরে হাতে কঙ্কণ থাকতে দর্পণের কি প্রয়োজন?

বিচক্ষণা : ওগো মশাই, তাই নাকি? দেখুন, কোন্ ঘোড়ায় কত জোরে ছোটে, তা যিনি প্রত্যক্ষদর্শী তিনিই জানেন। পণ্ডিতমশাই, বসন্তবর্ণনার একটা কবিতা আবৃত্তি করুন তো—

বিদূষক : ওরে, তুই তো খাঁচায় আটকানো বুড়ো শালিকের মতো কিচিরমিচির করছিস্। তুই কি বুঝিস্? ঠিক আছে, কবিতা যদি বলতেই হয়, তাহলে আমার প্রিয়-বয়স্য আর তাঁর মহিষীর কাছেই বলবো—কারণ অজ পাড়াগাঁয়ে কিম্বা বনের মাঝে মৃগনাভি বিক্রী হয় না; সোনা পরখ করতে হ'লে কষ্টিপাথরের দরকার।

রাজা : আচ্ছা প্রিয়বয়স্য, তুমি কবিতা আবৃত্তি কর, শোনা যাক।

বিদূষক : যে সিন্ধুবার তরু কল্‌মা ধানের মত
দেয় ফুল-উপহার,
আমি তাই ভালোবাসি ;
যে কুন্দকুসুমরাজি মহিষ দুধের মত
আনে খুশির বাহার,
আমি তাই ভালোবাসি।

বিচক্ষণা : এমন কবিতায় আপনার প্রিয়তমার মনোরঞ্জন হতে পারে, কিন্তু জগতে আর কারো উপকার হবে না।

বিদূষক : ওগো আমার প্রিয়ংবদা, এবার আপনি বলুন তো।

রাণী : (মুচকি হেসে) ওলো বিচক্ষণা, আমাদের কাছে তো তোর কবিত্বের খুব বড়াই করিস ; এবার মহারাজের সামনে স্বরচিত কবিতার একটু নমুনা দে তো। দেখ্‌, কবিতা হোল গিয়ে পণ্ডিতসভায় যা পাঠ করা যায় ; যেমন সোনা তাকেই বলে, যা কষ্টি পাথরে যাচাই করা হয় ; সেই হয় পত্নী, যে পতির মনোরঞ্জন করে ; তার নাম পুত্র, যে কুলের মর্যাদা বাড়ায়।

বিচক্ষণা : দেবীর যা আদেশ। (কবিতা পাঠ)

যে মলয় সমীরণ লঙ্কাগিরি-মেখলায় হইয়া স্খলিত
সুরত-সম্ভোগ-ক্লান্ত ভুজগফণার গ্রাসে হয়ে কবলিত
হয়েছিল অতিক্ষীণ বিরহিণী-দীর্ঘশ্বাসে, এবে তা সহসা
শিশুত্ব ঘুচিয়া যেন লভিলেক পরিপূর্ণ তারুণ্যের দশা।*

রাজা : আহা-হা—নামটি যেমন বিচক্ষণা, শব্দব্যবহারে এবং রচনাশৈলীতেও তেমনি বিচক্ষণা ; তুমি হলে কবিদের কবি, অর্থাৎ মহাকবি।

রাণী : মহারাজ, ও আমাদের কবি-চূড়ামণি।

* অনুবাদ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিদূষক : (রেগে) তাহলে সোজা কথায় বললেই পারেন যে কাব্য রচনায় বিচক্ষণা হোল উত্তম, আর এই ব্রাহ্মণ কপিঞ্জল অধম!

বিচক্ষণা : ঠাকুর, মিছে রাগ দেখিয়ে কি লাভ! আসলে কবির পরিচয় কবিতায়। তার মধ্যে রমণীয় শব্দই থাক, কিম্বা গৃহিণীর মানভঞ্জনই থাক, উদর-পূরণের কথা থাকলে মস্ত দোষ; সেটা কবিতা হয় না। উপমা দিয়ে বললে কথাটা দাঁড়ায়—যেমন লম্বিতস্তনীর গলায় হার, লম্বোদরীর কাঁচুলি, বৃদ্ধার কটাক্ষ, ন্যাড়া মেয়ের মাথায় মালতীর মালা, অথবা অন্ধের চোখে কাজল!

বিদূষক : তোমার কবিতায় অর্থের গৌরব আছে বটে, তবে শব্দ ব্যবহারে তেমন বাহাদুরি নেই। কেমন হয়েছে জান—যেমন সোনার বাজুবন্ধে লোহার ঘণ্টা, পাটের কাপড়ে তসরের বুনুনি, গৌরাঙ্গীর গায়ে চন্দনের ফোঁটা। আসলে এ সবের কোনটাই মানায় না। তবু লোকেরা তোমার প্রশংসা করে!

বিচক্ষণা : রাগ ক'রে কি হবে মহাশয়? আপনার সঙ্গে কি আমার মস্করা চলে? আপনি নিরক্ষর হয়েও লোহার শলাকার মতো রত্ন পরীক্ষা করেন; আর আমি সাক্ষর হয়েও তুলোর মতো অল্পদামে বিকোই। কেউ কোনদিন ভুল করেও সোনার পাত্রে রাখে না।

বিদূষক : তবে রে! 'যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা' নামে তোমার দুটি অঙ্গ[1] এখনি ছিঁড়ে দিই।

বিচক্ষণা : ঠিক আছে! আমিও উত্তরফাল্‌গুনির পরের নক্ষত্র নামে পরিচিত আপনার অঙ্গদুটি[2] ভেঙ্গে দিই।

১। অর্থাৎ কর্ণ বা কান। ২। অর্থাৎ হস্তা বা হাত।

রাজা : সখা, বিচক্ষণাকে এমন কথা বোলো না, ও হোল কবি-চক্রবর্তী।

বিদূষক : তা হলে আপনি বলতে চান, হরিচন্দ্র, নন্দিচন্দ্র ইত্যাদি ইত্যাদি কবি-চূড়ামণিরাও ওর কাছে হার মানবে ?

রাজা : হ্যাঁ, তাই।

বিচক্ষণা : ওগো মশাই, আপনি সেখানে যান—যেখানে গেছে আমার প্রথম শাড়ীটি।

বিদূষক : তুমিও সেখানে যাও—যেখানে গেছে আমার মায়ের প্রথম দাঁতগুলি। আর কামনা করি সেই রাজবাড়ীর মঙ্গল হোক—যেখানে একজন দাসী ব্রাহ্মণের সমান বলে দাবী করে ; যেখানে মদ আর পঞ্চগব্য এক পাত্রে স্থান পায়, কাঁচ আর কাঞ্চন সমান দরে বিক্রী হয়।

বিচক্ষণা : এবং সেই রাজবাড়ীতে আপনার কণ্ঠের অলংকার হোক্ তাই, যা ভগবান মহাদেব মাথায় ধারণ করেন[১]। আর আপনার মুখ তাই দিয়ে অলংকৃত হোক, যা অশোক গাছের ফুলফোটানোর জন্য ব্যবহৃত হয়[২]।

বিদূষক : আরে বেটী ছিনালি কোথাকার! অর্থপ্রবঞ্চিনী, রাজ-পথলুণ্ঠনী। বলি তোর মুখে এমন কথা? ফাগুন্ মাসে লোকের হাতে সজনে গাছের যে অবস্থা হয়, আর পামরদের হাতে দুষ্ট ষাঁড়ের যে অবস্থা, তোরও যেন তাই হয়[৩]।

বিচক্ষণা : মশায়, এর উত্তরে নূপুরপরা পায়ে আপনার মুখভঙ্গ ঘটতে পারে। কিংবা উত্তরষাঢ়ার পরে যে নক্ষত্র, আপনার সেই নামের অঙ্গটি ছিঁড়ে ফেলতে পারি[৪]।

১। অর্থাৎ অর্ধচন্দ্র। ২। তরুণীর পদাঘাত।
৩। নাকে দড়িবাঁধা। ৪। শ্রবণা অর্থাৎ কান।

বিদূষক ঃ (ক্রোধে বিচরণ করতে করতে পর্দার আড়ালে চলে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে) ওহে এমন রাজবাড়ী ছেড়ে চললুম—যেখানে দাসী ব্রাহ্মণের মুখে মুখে কথা বলে। এর চেয়ে আমার স্ত্রী বসুন্ধরার চরণসেবাই ভালো।

[সবার হাসি]

রাণী ঃ মহারাজ, বিদূষকহীন রাজসভা এবং চোখে কাজল না দিয়ে নারীর রূপচর্চা—দুইই সমান।

বিদূষক ঃ (পূর্ববৎ উচ্চকণ্ঠে) না—না—আমি আর আসছি না। মহারাজ, আপনি অন্য বয়স্যের খোঁজ করুন, আপনার ঐ লম্বকর্ণী দুষ্টা দাসীর মাথায় পাগড়ি পরিয়ে এবং গালে দাড়ি লাগিয়ে আমার চাকরাণী নিযুক্ত করুন ; না হলে জানবেন আমার মৃত্যু হয়েছে ; আর আপনারা দীর্ঘজীবী হোন। [প্রস্থান]

কথাসাহিত্য

প্রজাপতির উপদেশ

[বৃহদারণ্যক উপনিষদ]

প্রজাপতির ত্রিবিধ পুত্র—দেব, মানব আর অসুর। তারা সবাই পিতার কাছে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে শিক্ষা সমাপ্ত হোল। এবার গৃহে ফেরার পালা।

দেবতারা প্রজাপতিকে বললেন: 'আপনি আমাদের কিছু বলুন।'

প্রজাপতি শুধু বললেন: 'দ।'

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন: 'বুঝেছ তো?'

দেবগণ বললেন: 'হাঁ, বুঝেছি। আপনি আমাদের বললেন—দমন কর।'

তিনি বললেন: 'হাঁ, ঠিকই বুঝেছ।'

তারপর মানবপুত্রবা প্রজাপতিকে বললেন: 'আপনি আমাদের কিছু বলুন।'

প্রজাপতি শুধু বললেন: 'দ।'

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন: 'বুঝেছ তো?'

তারা উত্তর দিলেন: 'হাঁ, বুঝেছি। আপনি আমাদের বললেন—দান কর।'

তিনি বললেন: 'হাঁ, ঠিকই বুঝেছ।'

অবশেষে অসুরেরা প্রজাপতিকে বললেন: 'আমাদেরও কিছু বলুন।'

প্রজাপতি শুধু বললেন: 'দ।'

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন: 'বুঝেছ তো?'

তারা বললেন: 'হাঁ, বুঝেছি। আপনি আমাদের বললেন—দয়া কর।'

তিনি বললেন ঃ 'হাঁ, ঠিকই বুঝেছ।'

গর্জনশীল মেঘ এই দৈবী বাণী আবৃত্তি ক'রে চলেছে দ-দ-দ ঃ দমন কর—দান কর—দয়া কর। তাই তোমরা (শিষ্যরা) এই শিক্ষাই লাভ করবে দমন ঃ দান ঃ দয়া।

ভৃগুর ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা

[তৈত্তিরীয় উপনিষদ]

বরুণের পুত্র ভৃগু। একদিন তিনি পিতার কাছে এলেন। বললেন ঃ 'ভগবান, আমায় ব্রহ্মের উপদেশ করুন।'

পিতা বরুণ বললেন ঃ 'অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও বাক্যই ব্রহ্ম।' আবার বললেন ঃ 'যা থেকে এই প্রাণিসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও বিনাশ, তুমি তাঁকেই জান, তিনিই ব্রহ্ম।'

ভৃগু তপস্যা করলেন ; তিনি অনুভব করলেন অন্নই ব্রহ্ম। অন্ন থেকেই প্রাণীদের উৎপত্তি ও পুষ্টি ; তারা অন্নের অভিমুখে গমন করে, অন্নেই বিলীন হয়। এই জ্ঞান নিয়ে ভৃগু পুনরায় পিতা বরুণের সকাশে গেলেন ; বললেন ঃ 'ভগবান, আমায় ব্রহ্মের উপদেশ করুন।'

বরুণ বললেন ঃ 'তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জান ; তপস্যাই ব্রহ্ম।' তিনি তপস্যা করলেন ; জানলেন প্রাণই ব্রহ্ম। প্রাণের দ্বারাই জীবের জন্ম ও জীবন ; তারা অন্তিমে প্রাণের অভিমুখে গমন করে, প্রাণেই বিলীন হয়। এই বিদ্যা লাভ ক'রে ভৃগু পুনরায় পিতার সকাশে হাজির হলেন ; বললেন ঃ ভগবান 'আমাকে ব্রহ্মের উপদেশ করুন।'

বরুণ তাকে বললেন ঃ 'তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জান ; তপস্যাই ব্রহ্ম।' ভৃগু তপস্যা ক'রে জানলেন মনই ব্রহ্ম ; মন থেকেই ভূত-বর্গের সৃষ্টি ও সমৃদ্ধি ; অন্তিমে তারা মনের অভিমুখেই গমন করে, মনেই বিলীন হয়। এই বিদ্যা লাভ ক'রে ভৃগু পুনরায় পিতার কাছে

উপস্থিত হলেন ; তিনি বললেন ঃ 'ভগবান, আমাকে ব্রহ্মের উপদেশ করুন।'

বরুণ তাকে বললেন ঃ 'তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জান ; তপস্যাই ব্রহ্ম।' তিনি তপস্যা করলেন ; বুঝলেন জ্ঞানই ব্রহ্ম ; এই জ্ঞান থেকেই জীবের উৎপত্তি ও স্থিতি ; তারা অন্তিমে জ্ঞানের অভিমুখে গমন করে, জ্ঞানেই বিলীন হয়। এই বিদ্যা লাভ ক'রে ভৃগু পুনরায় পিতার কাছে উপস্থিত হলেন ; তিনি বললেন ঃ 'ভগবান, আমাকে ব্রহ্মের উপদেশ করুন।'

বরুণ পুনরায় তাকে বললেন ঃ 'তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জান ; তপস্যাই ব্রহ্ম।' ভৃগু তপস্যা ক'রে জানলেন আনন্দই ব্রহ্ম ; আনন্দ থেকেই জীবের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি ; তারা অন্তিমে আনন্দের অভিমুখে গমন করে, আনন্দেই লীন হয়[১]।

এই সেই ব্রাহ্মী বিদ্যা ; এর উপদেষ্টা বরুণ, লব্ধা ভৃগু। পরম ব্যোমে এর অধিষ্ঠান। যিনি এ বিদ্যা জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ; তিনি প্রকৃষ্ট অন্নবান ও অন্নভোজী হন ; সন্তান, প্রজা ও ব্রহ্মতেজের দ্বারা মহৎ হন ; কীর্তির দ্বারা মহৎ হন[২]।

নেকড়ে ও ভেড়ীর গল্প

[দ্বীপি জাতক]

কোন গ্রামে এক গৃহস্থের একপাল ভেড়া ছিল। রাখাল ভেড়াগুলোকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য গ্রামের বাইরে নিয়ে যেত। একদিন

১। আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাৎ হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।

২। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবান্ অন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া, পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চসেন ; মহান্ কীর্ত্যা।

চরানো শেষ হয়েছে ; সূর্য অস্ত যাচ্ছে ; রাখাল ভেড়াগুলো নিয়ে গ্রামের দিকে রওনা হোল।

এদিকে এক নেকড়ে বহুক্ষণ একটি বুড়ো ভেড়ীর পিছু নিয়েছে। সুযোগ বুঝে সে তার নাগাল পেল। ভেড়ী ভাবল আজ আর নিস্তার নেই। তবে এর সঙ্গে মিষ্টি কথায় আলাপ ক'রে যদি পার পাই। সে বলল—

'মা পাঠালেন জানতে মামা, খবর ত' সব ভাল ?
তোমার সুখে সুখী মোরা, কেমন আছ বল ?'

নেকড়ে বলল, 'ধ্যাৎ! আমার লেজ মাড়িয়ে এখন মামা-মামা আবদার!' 'এলি হেথায় ল্যাজ্‌টা আমার মাড়িয়ে চার পায়,

মামা বললে এখন বুঝি মুক্তি পাওয়া যায় ?'

ভেড়ী বলল, 'তা কেমন ক'রে হয় ? আমি আসছি আগে আগে, তুমি রইলে পিছনে পিছনে। তারপর—

মুখোমুখি হোল দেখা তোমায় আমায়,
ল্যাজ্‌টা আছে পিছন দিকে মাড়ান কি যায় ?'

নেকড়ে কিন্তু নাছাড়বোন্দা! তার মতে পৃথিবীর সব জায়গাতেই তার লেজ। তাই বলল—

'জানিস না কি ল্যাজ্‌টা আমার লম্বাচওড়া কত!
জুড়ে আছে চারটি দ্বীপ সাগর পর্বত।
আসবার কালে এড়ালি লেজ কেমন ক'রে বল ?
যেমন কর্ম তেমন এখন পাবি প্রতিফল।'

ভেড়ী বলল, 'হ্যাঁ, তা অবশ্য শুনেছিলুম। তাই তো আমি আকাশ-পথে উড়ে এসেছি।

মা বাপ ভাই সবাই আমায় করলো সাবধান,
দুষ্টের ল্যাজ লম্বা বড় বিশাল প্রমাণ ;
তাই এখানে এলেম উড়ে দেখিতে তোমায়,
মাড়ালেম ল্যাজ কেমন ক'রে বলতো আমায় ?'

নেকড়ে বলল, 'আরে হতভাগী, তা যেন হোল। কিন্তু তুই যে আমার আহার মাটি ক'রে দিলি। শোন্—

উড়ে যখন আসতেছিলি দেখি পেয়ে ভয়
হরিণ যত ছিল হেথা চৌদিকে পালায়।
আহার আমার করলি নষ্ট আসি অকারণ,
খেয়ে তোরে পেটের জ্বালা করি নিবারণ।'

নেকড়ের কথায় ভেড়ী কান্নাকাটি শুরু করল। কিন্তু ধূর্ত নেকড়ে তার ঘাড়ে লাফ দিয়ে পড়ল আর মনের আনন্দে মাংস খেল।

ভারণ্ডপক্ষি-কথা

[পঞ্চতন্ত্রের অপরীক্ষিতকারক]

কোন সরোবরের তীরে এক ভারুইপাখী বাস করত। তার ছিল দুটি গ্রীবা এবং দুই মুখ, কিন্তু একটিই উদর। একদিন সে সমুদ্রের তীরে ভ্রমণ করতে করতে দেখতে পেল ঢেউয়ের আঘাতে কতকগুলি ফল তীরে এসে জমা হয়েছে। সেগুলি আস্বাদন ক'রে সে বলতে লাগল, 'আঃ! কি সুন্দর আর মিষ্টি ফল, যেন অমৃতের আস্বাদ। এ ফল কি স্বর্গের পারিজাত নাকি হরিচন্দনের ফসল? নিশ্চয় স্বয়ং ভগবান এগুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন। কি ভাগ্য আমার!'

এই কথা শুনে তার গায়ে সংলগ্ন দ্বিতীয় মুখ বলল, 'ওহে, সত্যিই যদি এমন সুমিষ্ট ফল, তাহলে আমাকেও কিছু ভাগ দাও। আমার জিহ্বার সুখ হোক।' প্রথম মুখ অল্প হেসে এ কথার উত্তরে বলল, 'ভায়া, আমাদের দুটি মুখ পৃথক, কিন্তু উদর একই, তৃপ্তিও এক। সুতরাং দুই মুখে পৃথক খাওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি? বরং বাকী ফলগুলি প্রিয়াকে দিয়ে খুশী করব। এই বলে সে ঐ ফলগুলি গৃহিণীকে দিল। সুস্বাদু ফল খেয়ে পক্ষিণী প্রথম মুখকে আলিঙ্গন, চুম্বন আর চাটুবাক্যে সন্তুষ্ট করল।

---

* এই গল্পের কবিতাগুলি ঈশানচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ থেকে নেওয়া।

এদিকে তার দ্বিতীয় মুখ সেদিন থেকেই দুঃখে হতাশায় ম্লান হয়ে রইল। হঠাৎ একদিন সে একটি বিষফল পেল। তখন দ্বিতীয় মুখ প্রথম মুখকে বলল, 'ওহে স্বার্থপর অধম, আজ আমি বিষফল পেয়েছি। তুমি একদিন অমৃত ফল পেয়ে তার ভাগ না দিয়ে আমায় অপমান করেছিলে; এখন তার প্রতিশোধের জন্য এই ফল আমি খাব।' প্রথম মুখ বলল, 'ওহে মূর্খ! এমন কাজ কোর না, তাহলে আমরা দুজনাই মরব।' কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত না ক'রে দ্বিতীয় মুখ সেই ফল ভক্ষণ করল। বলা বাহুল্য, দুজনেরই মৃত্যু হোল।

তাই পণ্ডিতেরা বলেন,

একঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীত, নৈকঃ সুপ্তেষু জাগৃয়াৎ।
একো ন গচ্ছেদধ্বানং, নৈকশ্চার্থান্ প্রচিন্তয়েৎ॥

বহুজনের মধ্যে একাকী সুস্বাদু আহার গ্রহণ করবে না, নিদ্রিতদের মধ্যে একাকী জাগ্রত থাকবে না, একাকী পথে গমন করবে না এবং একাকী অর্থ উপার্জনের উপায় চিন্তা করবে না।

চণ্ডালকন্যার বিড়ম্বনা

[কথাসরিৎসাগর]

কোন গ্রামে এক চণ্ডালকন্যা বাস করত। সে ছিল খুব সুন্দরী। তার মনে বড় সাধ ছিল যে তার স্বামী হবেন সমাজের মধ্যে খুব গণ্যমান্য ব্যক্তি। একদিন ঐ দেশের রাজা হাতীর পিঠে চড়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। অসংখ্য পারিষদ পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। রাজাকে দেখে চণ্ডালকন্যার মনে হোল ঐ লোকটিই তার স্বামী হওয়ার যোগ্য। এই ভেবে সে রাজার পশ্চাৎ অনুসরণ করতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পর পথে এক সাধুর সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ হোল; তিনি হাতী থেকে নেমে সাধুকে প্রণাম করলেন। তাই দেখে চণ্ডালকন্যা ভাবল যে ঐ সাধু রাজার

চাইতেও বড়। তখন সে রাজাকে পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসীকে বরণ করার জন্য তার পশ্চাৎ অনুসরণ করল।

কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর সাধু পথপার্শ্বে এক শিব মন্দিরে প্রবেশ ক'রে শিবলিঙ্গকে প্রণাম জানালেন। চণ্ডালকন্যা এবার চিন্তা করল শিবলিঙ্গ মুনি অপেক্ষাও বড়। তাকে পতিরূপে বরণ করার জন্য সে মন্দিরে উপস্থিত হোল; এমন সময় দেখতে পেল এক কুকুর নির্জন মন্দিরের মধ্যে সেই শিবলিঙ্গের মাথায় প্রস্রাব ক'রে চলে গেল। এই ঘটনাতেও পাথরের দেবতা চুপ ক'রে রইল দেখে চণ্ডাল মেয়েটি ভাবল মহাদেব অপেক্ষা ঐ কুকুরটিই শ্রেষ্ঠ। তাই সে কুকুরটিকেই স্বামীরূপে ভজনা করতে গেল। এদিকে কুকুরটি মন্দির থেকে বেরিয়ে এক চণ্ডালের বাড়িতে প্রবেশ ক'রে জনৈক চণ্ডাল-যুবকের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। এবার চণ্ডাল মেয়েটি ভাবল ঐ চণ্ডালই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মনে মনে তাই ঠিক ক'রে সে তাকেই পতিত্বে বরণ করল।

অস্থিমুগ্ধ মূর্খের কথা

[কথাসরিৎসাগর]

কোন দেশে এক মূর্খ ব্রাহ্মণ বাস করত। তার স্ত্রীটি ছিল অতীব দুষ্টা ও অসতী। কিন্তু স্বামী বেচারা এমন স্থূলবুদ্ধি যে পত্নীর অসৎ কার্যকলাপের কোন খোঁজ-খবর জানত না; অধিকন্তু অতি বিশ্বাসের ফলে তাকে খুব ভালোবাসত। একবার মূর্খ ব্রাহ্মণ কার্যোপলক্ষ্যে কিছুদিনের জন্য গৃহের বাইরে গেল। সেই সুযোগে তার ভার্যা চতুরা দাসীর যোগসাজসে তারই উপর সমস্ত গৃহকাজের দায়িত্ব দিয়ে অবৈধ প্রেম চরিতার্থ করার জন্য উপপতির বাড়িতে গিয়ে স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে বাস করতে লাগল।

কিছুকাল পরে মূর্খ ব্রাহ্মণ হঠাৎ গৃহে ফিরল। তখন সেই দাসী মিথ্যা কান্নার ছল ক'রে জলভরা চোখে ব্রাহ্মণীর জন্য শোক

করতে করতে বলল, 'প্রভু, আপনার প্রিয়তমা পত্নী এমনই সতী-সাধ্বী ছিলেন যে আপনার বিরহ সহ্য করতে না পেরে দুঃখে প্রাণ-ত্যাগ করেছেন। আর মরার সময় আমাকে বলে গেছেন, 'ওলো, আমি মারা গেলে আমার অস্থিগুলো অন্তত তাঁকে একবার দেখাবি।' মূর্খ স্বামী দাসীর কথায় বিশ্বাস ক'রে তার সঙ্গে শ্মশানে গিয়ে কতকগুলি হাড় দেখে সেগুলিকে বুকে ক'রে কাঁদতে শুরু করল। তারপর সে স্ত্রীর তর্পণ সেরে হাড়গুলি নদীজলে বিসর্জন দিয়ে দাসীর সঙ্গে বাড়ীতে ফিরল। যথাসময়ে সে স্ত্রীর শ্রাদ্ধের আয়োজন করল; হঠাৎ সেই দিনে তার স্ত্রীর উপপতি দুষ্ট ব্রাহ্মণ এসে হাজির হোল এবং সমস্ত সংবাদ শুনে ব্রাহ্মণীর নামে মায়াকান্না জুড়ে দিল। মূর্খ স্বামীটি তাকে শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণরূপে নিমন্ত্রণ জানাল। চতুর ব্রাহ্মণ তাকে নানাবিধ উপদেশ দিয়ে নিত্য-নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণের ব্যবস্থাও পাকা ক'রে নিল। এদিকে মূর্খ ব্রাহ্মণের চতুরা স্ত্রীটি সাজসজ্জা ক'রে উপপতির সঙ্গে প্রতিদিন স্বামীর বাড়ীতে এসে ঘোমটায় মুখ ঢেকে সানন্দে ভোজন করতে লাগল।

একদিন ব্রাহ্মণীর সেই দাসী ব্রাহ্মণকে বলল, 'প্রভু, আপনার স্ত্রীর মতো সতী বিরল; আর তাই তার উপর আপনার ভালোবাসাও অগাধ। সেই কারণে দেবতারা পরামর্শ ক'রে আপনাদের দুজনের উপর অশেষ করুণা দেখিয়ে আমাদের ব্রাহ্মণীকে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। তারপর থেকে তিনি ঐ অতিথি ব্রাহ্মণের সঙ্গে আপনার বাড়ীতে এসে অন্ন গ্রহণ করেন।' মূর্খ ব্রাহ্মণ দাসীর কথা সহজেই বিশ্বাস ক'রে মহা সমারোহে স্ত্রীকে গ্রহণ করল।

টক্ক মূর্খের গল্প

[কথাসরিৎসাগর]

কোন গ্রামে টক্ক নামে এক মূর্খ বাস করত। আর্থিক অবস্থা সচ্ছল থাকলেও সে ছিল অতি কৃপণ। স্বামী-স্ত্রী দুজনে নুন ছাড়াই শুধু

ছাতু খেয়ে জীবনযাপন করত। একদিন টক্ক তার স্ত্রীকে বলল, 'শোন, আমরা তো এতকাল ছাতু খেয়েই কাটালাম ; অন্য খাদ্যের অস্বাদই পেলাম না। কবে জীবন শেষ হবে জানি না ; সুতরাং একটা দিন মনের সাধ মিটিয়ে ভাল খাবার খাওয়া যাক।' এই বলে সে বাড়ীর গাছে যে শশাটি ধরেছিল তাই এনে স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলল, 'আজ এটি খুব ভালো ক'রে সিদ্ধ কর, দুজনে মিলে মনের আনন্দে খাওয়া যাবে।'

কিন্তু টক্কের ভাগ্যে এমনি বিড়ম্বনা যে ঠিক সেই দিনই তার এক বন্ধু এসে উপস্থিত হোল। সে টক্কের নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করল। তৎক্ষণাৎ টক্ক একটা মতলব ঠিক ক'রে চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার স্ত্রী গোপনে স্বামীর সঙ্গে দেখা ক'রে জিজ্ঞাসা করল বন্ধুর কাছে কি উত্তর দেবে। টক্ক তাকে বলল, 'তুমি বন্ধুর কাছে না গিয়ে আমার পা ধরে কান্নাকাটি কর ; বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে বলবে যে আমি হঠাৎ মারা গেছি।'

টক্কের স্ত্রী স্বামীর কথামতো কাঁদতে শুরু করল। তাই শুনে টক্কের বন্ধু বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্। কিন্তু সে অতি ধূর্ত, তাই মূর্খ টক্কের চালাকি বুঝতে বাকী রইল না। সেও মনে মনে এক কৌশল ক'রে বন্ধুর মৃত্যুতে মায়াকান্না জুড়ে দিল। তাদের দুজনের কান্নাকাটি শুনে প্রতিবেশীরা এসে হাজির হোল। কিন্তু তারা কেউই আসল ব্যাপার বুঝে উঠতে পারল না। অতঃপর টক্ককে দাহ করার উদ্যোগে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাই দেখে তার স্ত্রী গোপনে স্বামীর কানে কানে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা ক'রে বলল, 'ওগো, তুমি আর মরে থেকো না, এবার উঠে পড়, নইলে ওরা তোমাকে দাহ ক'রে ফেলবে।'

তার পরামর্শ শুনে টক্ক বলল, 'দেখ, আমার এই বন্ধুটি যেমন চালাক, তেমন লোভী ; ও ঠিক শশা খাওয়ার লোভে এই সব চক্রান্ত করছে। আমি অতো বোকা নই ; কিছুতেই বেঁচে উঠছি না।' অবশেষে বন্ধু আর জ্ঞাতিরা মিলে টক্ককে সৎকারের জন্য শ্মশানে

নিয়ে এল। তার স্ত্রী ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করল। মূর্খ টক্ক আগুনে পুড়ে মরতে লাগল, কিন্তু সিদ্ধ শশার ভাগ দিতে হবে ভেবে সে চুপচাপ থেকে পুড়ে মারা গেল।

কলহপ্রিয়া নামে চতুরা ব্রাহ্মণীর গল্প

[শুকসপ্ততি]

দেউল গ্রামে রাজসিংহ নামে এক রাজপুত্র বাস করতেন। তার স্ত্রীটি অতিশয় ঝগড়াটে ছিলেন; তাই লোকে নাম দিয়েছিল কলহপ্রিয়া। একদিন তিনি স্বামীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া ক'রে দুই পুত্রকে নিয়ে বাপের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সেদিন কোন-মতেই রাগ কমল না। হাঁটতে হাঁটতে কলহপ্রিয়া মলয় পাহাড়েব পার্শ্ববর্তী বনে প্রবেশ করলেন। গভীর বনের মধ্য দিয়ে পথ চলতে চলতে হঠাৎ তিনি দূব থেকে এক বাঘকে আসতে দেখলেন। তিনটি মানুষকে একসঙ্গে দেখে বাঘের আনন্দ আর ধবে না। লেজটি মাটিতে আছড়াতে আছড়াতে সে তাদের দিকে এগোতে লাগল।

তখন কলহপ্রিয়া কপট রাগে দুই ছেলের গালে চড় মেরে ভৎর্সনা ক'রে উঠলেন, 'আরে একি! এক একজনে এই বাঘকে মেরে মাংস খাবি বলে তোরা ঝগড়া শুরু করেছিস? আপাতত যখন একটাই বাঘ পাওয়া গেছে তখন দুজনে মিলেমিশে ভাগ ক'রে খা; পরে যদি আবার কোন বাঘ দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে।' স্ত্রীলোকের মুখে এমন কথা শুনে বাঘ ভাবল এ রমণী নিশ্চয় কোন 'ব্যাঘ্রমারী'—যারা বাঘ দেখলেই হত্যা করে। এই চিন্তা ক'রে সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল। কিছুদূর যাওয়ার পর তার সঙ্গে এক ধূর্ত শেয়ালের দেখা। সে হাসতে হাসতে বলল, 'আরে বাঘমশাই, একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছেন। আপনি আবার কার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন?'

বাঘ বলল, 'ওহে ভায়া, তুমি একবার যাও না বনের ভেতরে। শাস্ত্রে যাকে 'ব্যাঘ্রমারী' বলে, আজ তার হাতেই পৈত্রিক জীবনটা যাচ্ছিল ; ভাগ্য ভাল, তাই প্রাণটা হাতে ক'রে তার নাগাল থেকে ফিরে এসেছি।'

শেয়াল বলল, 'ব্যাঘ্রমশাই, অপানি যা বলছেন, খুবই হাসির ব্যাপার। মাংসপিণ্ডের মানুষকে ভয় পাবে দুরন্ত শার্দূল ?'

বাঘ উত্তরে বলল, 'আরে, আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, সেই নারী তার দুই ছেলেকে চড়চাপড় মেরে শান্ত করছেন— কারণ তাদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল কে আগে বাঘ মেরে মাংস খাবে।'

শেয়াল বলল, 'প্রভু, আমাকে সঙ্গে নিয়ে একবার তার সামনে চলুন তো ; ব্যাঘ্রমারী যদি সাহসভরে আপনার দিকে তাকাতে পারে, তবে কিনা আপনাব কথার দাম। অবশ্য তেমন কিছু বুঝতে পাবলে আপনার মতই 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই নীতির অনুসরণ করব।'

বাঘ বলল, 'দেখ ভায়া, যদি বিপদের সময় আমায় একা রেখে পালিয়ে যাও, তাহলে এবার আর নিস্তার পাবো না।'

শেয়াল বলল, 'আচ্ছা, যদি এতই ভয়, তাহলে আপনার গলায় আমাকে বাঁধুন এবং তারপর সেই ব্যাঘ্রমারীব দিকে চলুন।' শেয়ালেব কথায় রাজী হয়ে বাঘ তাকে গলায় বেঁধে ব্যাঘ্রমাবীব উদ্দেশে রওনা হোল। তাদের দুজনকে দেখেই কলহপ্রিয়া শেয়ালেব দিকে অঙ্গুলিসংকেত ক'রে বলতে লাগলেন, 'ওরে ধূর্ত শেয়াল, এর পূর্বে তোকে তিন তিনটে বাঘ মেরে মাংস খেতে দিয়েছিলাম। আর আজ একটামাত্র বাঘকে নিয়ে আমার কাছে না এসে পালিয়ে যাচ্ছিস ?' এই বলে সেই রমণী তাদের দিকে এগোতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঘও শেয়ালকে গলায় বদ্ধ অবস্থায় নিয়ে প্রাণভয়ে পিছন ফিরে দৌড় দিল।

বিষম বিচার

[কথাসরিৎসাগর]

পাঞ্চাল দেশে দেবভূতি নামে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করতেন। তার স্ত্রীর নাম ছিল ভোগবতী। বলাসুর নামে এক রজক ছিল তাদের প্রতিবেশী। একদিন ব্রাহ্মণ স্নানের উদ্দেশ্যে নদীতে গিয়েছেন ; সেই সময় ব্রাহ্মণী বাড়ীর সংলগ্ন শাকখেতে শাক তুলতে গেলেন। সেখানে পৌঁছেই দেখলেন তাদের প্রতিবেশী রজকের গাধাটি সব শাক খেয়ে শেষ ক'রে ফেলেছে। রুষ্টা ব্রাহ্মণী লাঠি হাতে নিয়ে গাধাকে তাড়া করলেন। দৌড়ে পালাতে গিয়ে পাথরের উপর পিছলে পড়ে গাধার একটি পা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে গেল। এই অবস্থায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে গাধাটি রজকের বাড়ীতে পৌঁছাল।

একমাত্র গাধাটির এমন দুরবস্থা দেখে রজক লগুড়হাতে বেরিয়ে এল। এদিকে ব্রাহ্মণী রজক ও তার গাধার উদ্দেশ্যে গালমন্দ করতে করতে বাড়ী ফিরছিলেন। তাই শুনে রজক রাগে কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হয়ে পদাঘাতে ব্রাহ্মণপত্নীকে গুরুতর আহত করল। ব্রাহ্মণী গর্ভবতী ছিলেন। রজকের উৎপীড়নে তার গর্ভ নষ্ট হোল।

অতঃপর ব্রাহ্মণ নগরাধ্যক্ষের কাছে রজকের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন। বিচারপতি বাদী এবং প্রতিবাদী উভয় পক্ষেব বক্তব্য শুনে রায় দিলেন, 'যতদিন পর্যন্ত রজকের গাধা সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়, ততদিন ব্রাহ্মণ রজকের বাড়ীতে থেকে গাধার সমস্ত কাজ সম্পাদন কববে এবং যেহেতু রজকেব উৎপীড়নে ব্রাহ্মণীর গর্ভপাত ঘটেছে, সেহেতু ব্রাহ্মণী পুনরায় গর্ভবতী না হওয়া পর্যন্ত রজক তার সঙ্গে সহবাস করবে।'

প্রজ্ঞা-পারমিতার গল্প

[কথাসরিৎসাগর]

প্রাচীন কালে সিংহল দ্বীপে সিংহবিক্রম নামে এক চোর বাস করত। পরের ধনসম্পদ অপহরণ করেই তার সমস্ত জীবন অতিবাহিত

হোল। বৃদ্ধবয়সে যখন চুরি করার শক্তি রইল না, তখন সে মনে মনে ভাবতে লাগল, 'সারা জীবন তো অন্যায়-অধর্মের মধ্যে কাটল, এখন এই বয়সে ধর্মকর্ম না করলে পরকালে দুঃখকষ্টের শেষ থাকবে না। শুনেছি বিষ্ণু ও মহাদেব সবার চেয়ে বড় দেবতা। কিন্তু আমি যদি তাঁদের পূজা আরাধনা করি, তাহলে আমার মতো অধম চোরের উপরও কি তাঁদের কৃপাদৃষ্টি পড়বে? তাঁরা তো বড় বড় মুনিঋষিদের কথা ভাবতেই ব্যস্ত। তাহলে এক কাজ করি, সমস্ত মানুষের পাপপুণ্যের হিসাবরক্ষক যমরাজের প্রধান কেরাণী চিত্রগুপ্ত মহাশয়ের শরণাপন্ন হই। তিনি নিশ্চয় অতি অল্পেই সন্তুষ্ট হবেন। ঐ কায়স্থ চিত্রগুপ্তের কাছে দেবতাদেরও ভালমন্দের হিসাব থাকে।' এইসব ভেবে সিংহবিক্রম পরদিন থেকে খুব ঘটা ক'রে চিত্রগুপ্তের পূজা শুরু করল এবং পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য প্রতিদিন ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা করল।

চিত্রগুপ্ত চোরের উপর খুশী হলেন। কিন্তু তার ভক্তি যথার্থ কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য একদিন স্বয়ং এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধ'রে সিংহবিক্রমের বাড়ীতে অতিথিরূপে উপস্থিত হলেন। আতিথ্যে সন্তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণবেশী চিত্রগুপ্ত বললেন, 'ওহে সিংহবিক্রম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের মতো দেবতাদের বাদ দিয়ে তুমি কেন চিত্রগুপ্তের ভজনা করছ! এর দ্বারা তোমার কি লাভ?' চোর উত্তর দিল, 'সে কথায় আপনার কি প্রয়োজন? তবে জানবেন আমি চিত্রগুপ্তকে খুব শ্রদ্ধা করি।' ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, চিত্রগুপ্তকে খুশী করার জন্য তোমার স্ত্রীকে উপহার দিতে পারবে?' চোর ধীরচিত্তে জানাল, 'ইষ্ট দেবতার প্রীতির জন্য যে কোন বস্তু ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি।' তার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণবেশী চিত্রগুপ্ত স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'বৎস, আমিই চিত্রগুপ্ত; তোমার উপর অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। এখন কি উপকার করতে পারি বল?' চোর বলল, 'প্রভু, আমার জন্য শুধু এমন একটি উপায় ক'রে দিন, যাতে কোনদিন আমার মৃত্যু না হয়।'

চিত্রগুপ্ত বললেন, 'সিংহবিক্রম, মৃত্যুকে কেউ এড়াতে পারে না ; সকলে মহাকালের অধীন ; কাল সকলকে সংহার করে। তবে একটি মাত্র উপায় আছে—পুরাকালে ভগবান মহাদেব শ্বেতমুনির জন্য এই মহাকালকে ধ্বংস করেছিলেন। পরে দয়াপরবশ হয়ে তাকে পুনর্জীবিত করেন। কিন্তু মহাদেব আদেশ দিলেন যে শ্বেত-মুনি যেখানে বাস করবেন, সেখানে বসবাসকারী জীবগণ মহাকালের অধীন থাকবে না। পূর্বসাগর পার হয়ে তরঙ্গিণী নামে এক নদী আছে ; তার তীর অতিক্রম করলেই শ্বেতমুনির আশ্রম। সাধারণের পক্ষে ঐ স্থান অগম্য। আমি যদি তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিই তাহলে তুমিও অমর হবে। তবে ঐ তরঙ্গিণী পার হলেই তোমার মৃত্যু হবে। অবশ্য তাও খণ্ডন করার একটা উপায় আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। যদি দুর্বুদ্ধির বশে কখনো তেমন অবস্থায় পড় তাহলে আমার শরণাপন্ন হবে, আমিই তোমায় মুক্ত করব।' এই বলে চিত্রগুপ্ত সেই চোরকে শ্বেতমুনির আশ্রমে পৌঁছে দিলেন।

তারপর যখন চোরের মৃত্যুসময় উপস্থিত, মহাকাল প্রস্তুত হলেন ; কিন্তু অনেক সন্ধান করেও তাকে পেলেন না, কারণ চোর সিংহবিক্রম তখন শ্বেতমুনির আশ্রমে অবস্থান করছে। উপায়ান্তর না দেখে মহাকাল মায়াবলে এক সুন্দরী রমণী সৃষ্টি ক'রে তাকে ঐ আশ্রমে পাঠালেন। চোর তার রূপেগুণে বশীভূত হোল। একদিন ঐ রমণী ছলনার আশ্রয় ক'রে নদীতে সাঁতার কাটতে কাটতে ডুবে মরার ছলে চীৎকার শুরু করলেন। তৎক্ষণাৎ চোর নদীজলে ঝাঁপ দিয়ে তাকে উদ্ধার ক'রে আশ্রমের পরপারে উপস্থিত হোল। সঙ্গে সঙ্গে মহা-কাল চোরকে সংহার করলেন।

যমদূতেরা চোরকে যমালয়ে হাজির করানোর পর চিত্রগুপ্তের কাছে তার পাপপুণ্যের হিসাব নিতে গেল। চিত্রগুপ্ত চোরকে দেখেই বুঝতে পারলেন তার ভক্ত মোহের বশে এই কাজ করেছে। তাই তিনি চোরের কানে কানে বললেন, 'যখন যমরাজ তোমাকে

জিজ্ঞাসা করবেন, স্বর্গ না নরক—কোনটি আগে ভোগ করতে চাও? তখন তুমি প্রথমে স্বর্গভোগ প্রার্থনা করবে। তারপর স্বর্গে গিয়ে প্রতিদিন পুণ্যসঞ্চয় ক'রে নরকবাস থেকে মুক্তি পাবে।' সিংহবিক্রম চিত্রগুপ্তের কথায় রাজী হোল। অতঃপর ধর্মরাজ যম চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করলেন যে ঐ চোরের পাপপুণ্যের হিসাব কেমন। চিত্রগুপ্ত উত্তর দিলেন, 'প্রভু, এ ব্যক্তি সারা জীবন চুরি করলেও শেষ বয়সে খুব ধার্মিক হয়েছিল, অতিথিসেবার জন্যে নিজের স্ত্রীকেও উপহার দিতে কুণ্ঠিত হোত না। তাই হিসাবমতে এর জন্যে একদিনের স্বর্গবাস এবং বাকী নরকবাসের ব্যবস্থা আছে।' তারপর যমরাজের জিজ্ঞাসামত চোর প্রথমে স্বর্গবাসের কামনা জানাল। স্বর্গে পৌঁছানোর পর সে সমস্ত দিন পূজা-অর্চনা, তপস্যা, দানধ্যানের মধ্যে কাটাল; ফলে দ্বিতীয় দিনেও স্বর্গবাস বহাল রইল। এই ভাবে পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে চোর সিংহবিক্রম চিরকালেব জন্য স্বর্গে স্থান লাভ ক'বে অমর হয়ে বইল।

মূর্খ ব্রাহ্মণপুত্রদের কাহিনী

[পঞ্চতন্ত্রের অপরীক্ষিতকারক]

কোন গ্রামে চারজন ব্রাহ্মণকুমার বাস করতেন। তারা ছিলেন পরস্পরের প্রিয় বন্ধু। তারা ভাবলেন বাল্যকালে দেশান্তরে গিয়ে বিদ্যা উপার্জন করা একান্ত কর্তব্য। তারপর পরস্পর আলোচনার দ্বারা ঠিক হোল বিদ্যাশিক্ষার জন্য কান্যকুব্জই উপযুক্ত স্থান।

এক শুভদিনে ব্রাহ্মণসন্তানরা কান্যকুব্জের দিকে রওনা হলেন। তারপব সেখানে পৌঁছে চারজনই এক বিদ্যামঠে পাঠাভ্যাসে মন দিলেন। এইভাবে বারো বছর একনিষ্ঠচিত্তে শিক্ষা গ্রহণ করার পর তারা বিদ্বান পণ্ডিত হলেন। তখন চারজন মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত করলেন, 'আমরা প্রত্যেকেই সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেছি, অতএব উপাধ্যায়কে বিদায়-সম্ভাষণ ক'বে স্বদেশে ফিরে

যাব।' গুরুকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর আজ্ঞা লাভ ক'রে তারা নিজ নিজ পুস্তক হাতে নিয়ে স্বদেশের অভিমুখে চললেন।

নগরের প্রধান রাস্তা দিয়ে কিছু দূর যাবার পর দেখা গেল সেই রাস্তা দুভাগে ভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে। ব্রাহ্মণ-পুত্রেরা সেখানেই বসে পড়লেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কোন্ রাস্তায় যাওয়া ঠিক হবে?' সবাই বসে বসে ভাবতে লাগলেন, 'তাইতো, মহাসমস্যা!' এমন সময় দেখা গেল কিছু দূরে কয়েকজন ধনী মহাজন একটি শবদেহ নিয়ে ঐ দিকেই আসছেন। সেই নগরে এক বিত্তবান বণিকের পুত্র মারা গিয়েছিল। ঐ শবযাত্রা তারই।

এদিকে সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণপুত্রেরা তাদের পুঁথিপত্র ঘেঁটে উপযুক্ত পথ নির্ধারণের সমস্যা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। তাদের একজন বললেন, 'দেখ, শাস্ত্র বলছে মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ[১]। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হোল এই মহাজনেরা যে পথে যাচ্ছেন, আমরাও সেই পথে যাব।' এমন সিদ্ধান্তে বাকী তিনজনই তাকে বাহাবা দিলেন।

ব্রাহ্মণপুত্রেরা শ্মশানের পথ ধরে চলতে লাগলেন। এমন সময় সেই পথ দিয়ে এক গাধা যাচ্ছিল। তারা ভাবলেন, 'এখানে হঠাৎ গাধার উপস্থিতি! এর মানে কি হতে পারে?' অমনি একজন পুঁথি ঘেঁটে বিধান দিলেন—

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।

এর মানে উৎসবে, বিপদে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে এবং শ্মশানে যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন, তিনি পরম বন্ধু; অতএব এই গাধা আমাদের মিত্র।' তারপর একজন গাধাটিকে গলা জড়িয়ে

১। বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না, নাস্তি মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

আদর করতে লাগলেন, অন্য একজন পা ধুইয়ে দিলেন। গর্দভবন্ধুকে এভাবে আদর-আপ্যায়নের পর তারা চারজন তার সঙ্গে এগোতে লাগলেন। এই সময় দেখা গেল এক উট লম্বা লম্বা পা ফেলে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছে। তখন একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ আবার কি?' অন্যজন শাস্ত্রবচনের সঙ্গে উটের মিল খুঁজে জানালেন, 'পণ্ডিতেরা বলেছেন ধর্মস্য ত্বরিতা গতিঃ। এর অর্থ—ধর্মের গতি দ্রুত। অতএব ইনি সাক্ষাৎ ধর্ম।' সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন বললেন, 'পণ্ডিতরা আরও বলেছেন—ইষ্টং ধর্মেণ যোজয়েৎ[১]। অর্থাৎ প্রিয় বস্তুকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা কর্তব্য।' এই বলে তারা গাধা ও উটকে পরস্পরের গলায় শক্ত ক'রে বেঁধে দিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর গাধার অবস্থা শোচনীয় হয়ে এল।

এরই মধ্যে এক চালাক লোক গাধাব মালিক রজকের কানে এই সংবাদ পৌঁছে দিল। রজক তৎক্ষণাৎ গাধাকে বাঁচাতে আর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের শায়েস্তা করতে ছুটে এল। দূর থেকে তাকে দেখে ব্রাহ্মণপুত্ররা গাধা আর উটকে ফেলে পালিয়ে বাঁচলেন। কিছুদূব এগিয়ে যাওয়ার পর তারা এক নদীর তীরে পৌঁছালেন। নদীর জলে একটি পলাশপাতা ভেসে যাচ্ছিল। তাই দেখে একজন বললেন 'আগমিষ্যতি যৎ পত্রং তৎ অস্মান্ তারয়িষ্যতি'—অর্থাৎ যে পাতাটি আসছে, তাই আমাদের বাঁচাবে। এই বলে তিনি আত্ম-রক্ষার জন্য সেই পাতার উপর লাফ দিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন তার চুল ধরে ফেললেন। কিন্তু স্রোতের টানে তাকে কিছুতেই ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। অমনি তার মনে পড়ে গেল 'শাস্ত্রে তো বিধান আছেই সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ—অর্থাৎ সর্বনাশ উপস্থিত হলে পণ্ডিত ব্যক্তি অর্ধেক পরিত্যাগ

১। উত্তমং প্রণিপাতেন, শূরং ভেদেন যোজয়েৎ।
নীচমল্পপ্রদানেন, ইষ্টং ধর্মেণ যোজয়েৎ॥

করেন[১]।' এই বলে তিনি ডুবন্ত বন্ধুর গলা কেটে ফেললেন। তারপর তিনজনে নদীতীর থেকে প্রস্থান করলেন। ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে তারা এক গ্রামে পৌঁছালেন। সেখানে গৃহস্থের বাড়ীতে তাদের ভোজনের নিমন্ত্রণ হোল। একজনের পাতায় সামুইয়ের পায়স দেওয়া হোল। তখন সেই ব্রাহ্মণকুমার চিন্তা করলেন সুতোর মতো আকৃতিবিশিষ্ট এই পায়স খাওয়া উচিত কি না। তার মনে পড়ল শাস্ত্রের নিষেধবাক্য 'দীর্ঘসূত্রী বিনশ্যতি'। তৎক্ষণাৎ ভোজন ত্যাগ ক'রে তিনি পলায়ন করলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ভোজনের সময় বৃহদাকার মণ্ডা পরিবেশন করা হলে তিনি ভাবলেন 'অতিবিস্তার-বিস্তীর্ণং তদ্ ভবেৎ ন চিরায়ুষম্'—অর্থাৎ যাদের আকৃতি বৃহৎ, সেগুলি দীর্ঘ আয়ুর পক্ষে ক্ষতিকারক ; সুতরাং এ খাদ্য অবশ্যই বর্জনীয়। এই ভেবে তিনিও পলায়ন করলেন। তৃতীয় ব্রাহ্মণপুত্র দেখলেন তার ভোজন পাত্রে অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধি পিঠা সাজান আছে। সযত্নে তৈরী ঐ পিঠাগুলির গায়ে ছোট ছোট অসংখ্য ছিদ্র। তাই দেখে তার মনে পড়ল শাস্ত্রের কথা 'ছিদ্রেষু অনর্থা বহুলীভবন্তি'—অর্থাৎ ছিদ্র থাকলেই বহু অনর্থ ঘটে[২]। তাই ভয়ে ভয়ে তিনিও চম্পট দিলেন।

ধূর্তা কৌলিকপত্নীর কাহিনী

[কথাসরিৎসাগর]

কোন গ্রামে এক কৌলিক স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করত। একদিন সে মদ্যপানের আশায় নিকটবর্তী নগরের দিকে সস্ত্রীক রওনা হোল।

১। সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পাণ্ডিতঃ।
অর্ধেন কুরুতে কার্যং সর্বনাশো ন জায়তে॥

২। একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং গচ্ছাম্যহং পারমিবার্ণবস্য।
তাবদ্ দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে, ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি।

পথে দেবশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ। ব্রাহ্মণ বললেন, 'ওহে কৌলিক, আমি সায়ংকালপ্রাপ্ত অতিথি এবং এখানে আগন্তুক; সুতরাং আপনি আতিথ্যধর্ম পালন করুন।' দেবশর্মার অনুবোধ শুনে ধর্মভীরু কৌলিক স্ত্রীকে বলল, 'প্রিয়ে, তুমি অতিথির সঙ্গে গৃহে যাও এবং তার সৎকারের ব্যবস্থা কর; ইত্যবসরে আমি শহর থেকে তোমার জন্য উৎকৃষ্ট মদ নিয়ে ফিরে আসছি।' কৌলিকের পত্নী ছিল অতিশয় ধূর্তা ও ব্যভিচারিণী। সে খুশীমনে দেবদত্ত নামে আপন উপপতির কথা চিন্তা করতে করতে অতিথি দেবশর্মার সঙ্গে গৃহে ফিরল। শাস্ত্রে যথার্থই বলে, মেঘাচ্ছন্ন দিনে, গাঢ় অন্ধকারে, দুর্গম রাজপথে এবং স্বামীর বিদেশগমনে কুলটা নারীর অশেষ আনন্দ।

·পুংশ্চলী স্ত্রীরা কুলের কলঙ্ক; প্রণয় চরিতার্থতার জন্য তারা লোকনিন্দা, বন্ধন বা মৃত্যুকেও গ্রাহ্য করে না।

গৃহে পৌঁছানোর পর কৌলিকপত্নী অতিথি ব্রাহ্মণকে এক ভাঙ্গা খাট সমর্পণ ক'রে বলল, 'প্রভু, গ্রামান্তর থেকে আমার এক প্রিয় বান্ধবী এ গ্রামে এসেছে। আমি তার কাছেই যাচ্ছি; ততক্ষণ আপনি বিশ্রাম করুন।' এই বলে সে বেশভূষা ক'রে নাগরের উদ্দেশে রওনা হোল। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর মত্তপ স্বামীকে উন্মত্ত অবস্থায় ফিরতে দেখে সে তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কৌলিক স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে পূর্বেই সন্দিহান ছিল এবং লোকমুখে তার সন্দেহজনক গতিবিধির কথা শুনে সর্বদা সজাগ থাকত। সেদিন স্ত্রীর ঐরূপ কার্যকলাপ দেখে মত্তপ কৌলিক গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর স্ত্রীর প্রতি নানান কটূক্তি করতে থাকল। স্বামীর কথা শুনে কৌলিকপত্নী বলল, 'ওগো, আমি তোমার কাছ থেকে ফিরে সোজা বাড়ীতে চলে আসি, অন্য কোথাও যাই নি; তুমি মদের নেশায় উন্মত্ত হয়ে অকারণে আমাকে গঞ্জনা দিচ্ছ।' স্ত্রীর কথায় অপমানিত কৌলিক বলল, 'তবে রে! তোর এ কাজের উপযুক্ত শাস্তি দিচ্ছি।' এই বলে সে তাকে নানাভাবে

উৎপীড়িত ক'রে ঘরের ভিতর এক খুঁটিতে বেঁধে রেখে নেশার ঘোরে সেখানেই নিদ্রিত হয়ে পড়ল।

এই সুযোগে কৌলিকপত্নীর বান্ধবী এক ধূর্তা নাপিতানী এসে সংবাদ দিল যে তার উপপতি যথাস্থানে অপেক্ষা করছে। কৌলিকের স্ত্রী তাই শুনে বলল, 'কিন্তু এ-অবস্থায় আমি কেমন ক'রে নাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি! তুই গিয়ে জানিয়ে দে আজ কোন মতেই তার সঙ্গে দেখা হবে না।' নাপিতানী বলল, 'ওগো, কুলটার মুখে এমন কথা সাজে না। দেখ, পরলোক আছে কি না কেউ জানে না; এ-সংসারে লোকনিন্দাও বড় মজার, পরের নিন্দা কে না করে? জগতে একমাত্র পুণ্যবতীরাই স্বাধীনভাবে পরপুরুষসংসর্গের আনন্দ লাভ করে।' তখন কৌলিকস্ত্রী বলল, 'সই, কেমন ক'রে যাই? দুশ্চরিত্র মদ্যপ স্বামী তো পাশেই ঘুমিয়ে রয়েছে; ঘুম ভেঙে আমায় দেখতে না পেলে সর্বনাশ হবে।' নাপিতানী বলল, 'তোমার স্বামীটি তো নেশায় অচেতন, সূর্যোদয়ের পূর্বে তার ঘুম ভাঙবে না; তাই শোন, একটা মতলব করেছি—আমি তোমার বাঁধন খুলে দিই, আর তুমি আমাকে এখানে বেঁধে রেখে দেবদত্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এস।' কৌলিক-পত্নী সখীর পরামর্শ মতো কাজ ক'রে উপপতির কাছে যাত্রা করল। এদিকে নেশার ঘোর কিছুটা কাটলে কৌলিক স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল, 'ওরে কর্কশভাষিণী, তুই যদি আর কোনদিন আমার অমতে ঘরের বাইরে না যাস্, তবে তোকে এবারের মতো ক্ষমা করতে পারি।' কিন্তু সমস্ত ব্যাপার উদ্‌ঘাটিত হওয়ার ভয়ে নাপিতানী চুপ ক'রে রইল। তার মুখে কোন উত্তর না পেয়ে কৌলিক রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে অন্ধকারের মধ্যেই তীক্ষ্ণ খুর দিয়ে স্ত্রী ভেবে নাপিতানীর নাক কেটে ফেলল এবং রূঢ় ভাষায় তিরস্কার করতে করতে নেশার ঘোরে আবার সেখানে ঘুমিয়ে পড়ল।

অন্যদিকে সেই পরিব্রাজক দেবশর্মা ক্ষুধার জ্বালায় নিদ্রাহীন অবস্থায় ভাঙ্গা খাটে কাল কাটাচ্ছিলেন আর মহাবিস্ময়ে ঐসব ঘটনা

প্রত্যক্ষ করছিলেন। গভীর রাত্রিতে কৌলিকস্ত্রী গৃহে ফিরে নাপিতানীকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওলো, সব কুশল তো?' নাপিতানী বলল, 'সখী, নাকটি ছাড়া সমস্তই কুশল।' তার মুখে সব ঘটনা শুনে কৌলিকপত্নী যথাসাধ্য নাপিতানীর শুশ্রূষা ক'রে তাকে মুক্ত ক'রে দিল এবং নিজে পূর্ববৎ বদ্ধ অবস্থায় অপেক্ষা করতে থাকল। কিছুক্ষণ পর পুনরায় তার স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হোল; সে বলতে লাগল, 'ওরে ব্যভিচারিণী, তোর এখনও সুমতি হোল না! এবার তোর কান কেটে ফেলব।' মদ্যপ স্বামীর কথার প্রত্যুত্তরে কৌলিকস্ত্রী বলল, 'তুমি মহামূর্খ, তাই আমার চরিত্রে সন্দেহ করছ। চন্দ্র-সূর্য-আকাশ-বাতাস সাক্ষী! আমি যদি সতী হই আর স্বামীর উপর অবিচল নিষ্ঠা থাকে, তবে দেবতাদের আশীর্বাদে আমার কাটা নাক অক্ষত হোক।' কৌলিক আলো জ্বালিয়ে স্ত্রীর কাছে এগিয়ে গিয়ে তার নাক অক্ষত দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। সে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে বন্ধনমুক্ত ক'রে ক্ষমা ভিক্ষা করল এবং বিবিধ আদর-আপ্যায়নে তাকে খুশী করল।

পূর্বাপর ঘটনা প্রত্যক্ষ ক'রে দেবশর্মা মনে মনে ভাবলেন, 'শাস্ত্রে যথার্থই বলে একমাত্র নারীজাতিই সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করতে পারে; রমণীদের মুখে মধু, অন্তরে গরল; নারীরা সন্দেহের আবর্ত, অবিনয়ের আশ্রয়, হঠকারিতার ভিত্তি, দোষের আলয়, চাতুরীর নিকেতন, অবিশ্বাসের পাত্র; নারীর স্তনদ্বয়ে কাঠিন্য, নেত্রে চাপল্য, মুখে অসত্য, কেশে কুটিলতা, আলাপে মাধুর্য, নিতম্বে স্থূলতা ও হৃদয়ে ভীরুতা। তবু পুরুষেরা এগুলিকে গুণ বলে ভুল করে। নারী সমুদ্রের মতো চঞ্চল, সন্ধ্যার মেঘমালার মতো রাগরঞ্জিত। অসত্য, হঠকারিতা, মূর্খতা, অতিলোভ, অশুচিতা ও নির্দয়তা—এগুলি স্ত্রীচরিত্রের স্বাভাবিক দোষ।' এমনি চিন্তা করতে করতে ব্রাহ্মণের চোখের উপর দিয়ে রাত্রি কেটে গেল।

নাপিতানী সেই অবস্থায় অতিকষ্টে আপন ঘরে ফিরে নানা

দুশ্চিন্তায় রাত্রি কাটাল। পরদিন সকালে নাপিত রাজকার্য সমাধা ক'রে বাড়ী ফিরল; কিন্তু জরুরী কাজে উদ্‌বিগ্ন থাকার ফলে সে দরজা থেকে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল, 'তাড়াতাড়ি আমার ক্ষুরভাঁড় দাও, আমি আজ খুবই ব্যস্ত।' নাপিতানীও কৃত্রিম ব্যস্ততার ভাণ ক'রে ঘরেব ভিতর থেকেই একটি ক্ষুর স্বামীর অভিমুখে ছুঁড়ে দিল। তাই দেখে ক্রুদ্ধ নাপিত সেই ক্ষুর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে সজোরে ছুঁড়ে মারল। তৎক্ষণাৎ নাপিতানী চীৎকার শুরু ক'রে দিল, 'ওগো আমার কোন দোষ নেই গো, তবু আমার স্বামী ক্ষুর দিয়ে আমার নাক কেটে ফেলল, আমাকে বাঁচাও।' কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজ-পুরুষেরা উপস্থিত হোল এবং নাপিতানীর নাক কাটা দেখে তার স্বামীকে প্রচণ্ড মারধর করতে করতে বিচারালয়ে হাজির করল। প্রহারে অর্ধমৃত নাপিত বিচারকেব কোন কথার উত্তর দিতে না পারায় দোষী সাব্যস্ত হোল। বিচারক তাকে শূলে চড়ানোর আদেশ দিলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ দেবশর্মা সেখানে উপস্থিত হলেন এবং পূর্বরাত্রির ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। শেষ বিচারে নাপিত মুক্তি পেল, নাপিতানীর কর্ণচ্ছেদের আদেশ দেওয়া হোল এবং কৌলিক-পত্নীও উপযুক্ত শাস্তি লাভ করল।

মূর্খ স্বামী ও চতুরা স্ত্রীর গল্প

[পঞ্চতন্ত্রের কাকোলূকীয় কথা]

বীরধর নামে এক রথকার। তার স্ত্রীর নাম কামদমিনী। সে ছিল অসতী, অতিশয় দুষ্টা ও চতুরা। লোকে তাকে আড়ালে কলঙ্কিনী বলে উপহাস করত। বীরধর তার স্ত্রীকে খুব সন্দেহ করত এবং তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আপন মনে নানারকম পরিকল্পনা করত। কিন্তু চতুরা কামদমিনী আশ্চর্য কৌশলে স্বামীকে প্রতারণা করতে থাকে।

বীরধরের মনে হোল শাস্ত্রে ঠিকই বলে, 'নারীর সতীত্বও যা—

আগুনের শীতলতা, চন্দ্রের উষ্ণতা আর দুর্জন লোকের পরোপকারের ইচ্ছাও তা।' তাই সে ভাবল 'সবাই যখন আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কানাকানি করে, তখন তা নিশ্চয় একেবারে মিথ্যা হতে পারে না। সুতরাং শেষবারের মতো তাকে একবার পরীক্ষা করব।' একদিন সে স্ত্রীকে বলল, 'ওগো, আমি বিশেষ প্রয়োজনে গ্রামান্তরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাবো; সেখানে দু-একদিন থাকব।' কথা শুনে স্ত্রী কৃত্রিম অভিমান আর দুঃখের সঙ্গে বলল, 'তোমার যখন এতই কাজ, তখন আমি বাধা দিই কেন! যাহোক কিছু খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে যাও, রাস্তাঘাটে কাজে লাগবে।' এই বলে সে ঘি ও চিনি দিয়ে স্বামীর জন্য সুস্বাদু খাদ্য তৈরী ক'রে সঙ্গে দিল। কামদমিনী ভাবল, 'কামশাস্ত্রে ঠিকই বলে ঘন অন্ধকারে, বর্ষাকালে, অরণ্যে আর স্বামীর প্রবাসে অসতীদের খুব আনন্দ।'

বীরধরের বিদায়ের পর তার স্ত্রী সুন্দর সাজপোষাক ক'রে দিনের বেলা কোনমতে কাটাল। যখন সন্ধ্যা একটু গাঢ় হোল, সে তখন উপপতিকে সংবাদ দিল। ঠিক হোল গভীর রাত্রিতে তার বাড়ীতেই উপপতির সঙ্গে মিলন হবে। এদিকে স্বামী বেচারা সারাদিন বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরল এবং স্ত্রীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অন্দরে প্রবেশ ক'রে খাটের তলায় লুকিয়ে রইল।

কামদমিনীর উপপতি সংকেত অনুসারে যথাসময়ে উপস্থিত হলেন। তিনি এসেই শয়নঘরে বিছানার উপর বসলেন। বীরধর ভাবতে লাগল, 'নরাধমকে এই মুহূর্তেই খুন করি; নাকি দুজনে একত্র হলে দুজনকেই খুন করব! নাকি আমার স্ত্রী কতো অসতী শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে দেখি।' এরূপ ভাবতে ভাবতে সে তখনকার মতো শান্ত হয়ে রইল। অল্প সময়ের মধ্যেই তার স্ত্রী সেখানে উপস্থিত হোল, তারপর সাবধানে দরজা বন্ধ ক'রে উপপতির কাছে গিয়ে বসল। কিন্তু খাটে উঠতে গিয়ে হঠাৎ তলায় বসে

থাকা কার গায়ে যেন তার পা লেগে গেল। ধূর্তা স্ত্রীর বুঝতে বাকী রইল না যে স্বামী তাকে পরীক্ষার জন্য সেখানে লুকিয়ে রয়েছে। সে কিন্তু মোটেই উদ্‌বিগ্ন হোল না; বসে ভাবতে লাগল স্বামীকে কেমন ক'রে জব্দ করা যায়! তারপর সে নিজেই মনে মনে বলল, 'আজ একে মজা দেখাচ্ছি।' এদিকে তার অন্যমনস্কতা দেখে উপ-পতি অধীর হয়ে প্রেম নিবেদনের জন্য কাছে এগিয়ে এলেন। যেই তিনি তাকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত, অমনি চতুরা কামদমিনী কৃত্রিম রাগ ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে উঠল, 'আমি পতিব্রতা নারী, আপনি আমার শরীর স্পর্শ করবেন না। আমার কথা যদি না শোনেন, তাহলে সতীত্বের জোরে আমি আপনাকে অভিশাপ দিয়ে ভস্ম ক'রে দিতে পারি।' কথা শুনে তার জার বিস্ময়ে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি বললেন, 'তাহলে আমায় এখানে ডেকে নিয়ে এলে কেন?' কামদমিনী বলল "আপনাকে কেন ডেকেছি, তাই শুনুন—আজ সকালে আমি যথারীতি মা চণ্ডীর মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিলাম। পূজাশেষে তাঁকে যেই প্রণাম করেছি এমন সময় আকাশবাণী হোল। মা চণ্ডী বললেন, 'ওগো মেয়ে, আমি তোমার ভক্তিতে খুবই খুশী। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তাই কটুকথা হলেও তোমায় না জানিয়ে পারছি না—যদি কোন প্রতীকার করতে পার। শোন, ছমাসের মধ্যে তোমার কপালে বৈধব্যযোগ আছে!' এই নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনে আমার মন একেবারে ভেঙ্গে গেল। কাঁদতে কাঁদতে চণ্ডীকে বললাম, 'মাগো, আমি তাহলে কেমন ক'রে বাচব? ভক্তের দুর্ভাগ্য যেমন তুমি জান, তেমনি তার প্রতিকারের উপায়ও তোমাকে বলে দিতে হবে! দেবী, আমি যদি তোমায় ভক্তিভরে পূজা ক'রে থাকি, আর আমার সতীত্বের জোর থাকে, তবে স্বামীকে একশ বছর আয়ু দাও!' তখন চণ্ডী বললেন, 'মেয়ে, এ দুর্ভাগ্য খণ্ডন হতে পারে; কিন্তু তার উপায় জানাতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।' আমি বললাম, 'দেবী, আমার মুখের দিকে চেয়ে সব

সঙ্কোচ দূর কর। স্বামীর মঙ্গলের জন্য যে কোন দুঃসাধ্য কাজ করতে আমি রাজী আছি।' চণ্ডিকা আমার কান্নাকাটি আর দুঃখ দেখে বললেন, 'বাছা, যদি আজ রাত্রিতে স্বামীর বিছানায় পরপুরুষকে আলিঙ্গন করতে পার তবে তোমার বৈধব্য খণ্ডন হবে আর তোমার স্বামী একশ বছর আয়ু লাভ করবে।' দেবীর আদেশ শুনেই আমি আপনাকে ডেকে এনেছি ; আপনি আমার চরিত্রের উপব কুসন্দেহ করবেন না। স্বামীর কল্যাণের জন্যই এ কাজ করছি।" চতুরা কুলটার এ পরিহাস উপপতির বুঝতে বাকী রইল না। তিনি মনে মনে হেসে উঠলেন এবং তারপর যথারীতি আচরণ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বীরধর খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এসে সানন্দে বলে উঠল, 'ওগো, তুমিই যথার্থ সতী ; আমার বংশ উজ্জ্বল করেছ। আমি দুষ্ট লোকের কথায় তোমার উপর ভুল সন্দেহ ক'রে তোমাকে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম। সতীত্বের পরীক্ষায় মহা-গৌরবে তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। আমার অন্যায় মার্জনা করো।' তার পর সে স্ত্রীর উপপতিকে বলল, 'অন্যায় এবং গর্হিত কাজ জেনে প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের উপকারের জন্য আপনি যা করেছেন, জগতে তার দৃষ্টান্ত বিরল।' এই বলে বীরধর তার স্ত্রী ও সেই ব্যক্তিকে দুই কাঁধে তুলে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

বেতালপঞ্চবিংশতি

[একোনবিংশ কথা]

রাজা ত্রিবিক্রমসেন শিশু গাছের তলায় পৌঁছে বেতালের দ্বারা অধিষ্ঠিত শবদেহ কাঁধে নিয়ে পুনরায় শ্মশানে অপেক্ষ্যমাণ সন্ন্যাসীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। বেতাল রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আপনার পথশ্রম বিনোদনের জন্য এক মনোরম কাহিনী শোনাই— স্বর্গপুরীর তুল্য বক্রোলক নামে এক নগরী ছিল। সেখানে সূর্যপ্রভ নামে ইন্দ্রতুল্য রাজা রাজত্ব করতেন। সর্বজীবের আনন্দ-

দাতা ভগবান বিষ্ণু যেমন বরাহরূপে পৃথিবীকে উদ্ধার ও পালন করেছিলেন, তেমনি রাজা সূর্যপ্রভ নিজ ভুজবলে সমগ্র রাজ্য রক্ষা ও পালন করতেন এবং সর্বদা প্রজাদের কল্যাণ বিধানের দ্বারা আনন্দ দান করতেন।

সেই সময় তাম্রলিপ্ত নগরে ধনিক সমাজে খ্যাতিমান ধনপাল নামে এক মহাধনিক বণিক্ বাস করতেন। ধনবতী নামে তার এক সুন্দরী কন্যা ছিল। তাকে দেখে মনে হোত যেন সাক্ষাৎ বিদ্যাধরী দেবশাপে সুরলোক ত্যাগ ক'রে মর্তে জন্ম নিয়েছেন। সেই কন্যা যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন অকস্মাৎ বণিকের মৃত্যু হোল। এই সুযোগে আত্মীয়বর্গ রাজার আনুকূল্যে তাদের সমস্ত বিষয়সম্পদ অধিকার করলেন। তখন বণিকপত্নী হিরণ্যবতী সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখে লুক্কায়িত রত্নালংকার কাপড়ে বেঁধে রাত্রিতে কন্যার সঙ্গে গৃহত্যাগ করলেন। ঘরে বাইরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। বণিকপত্নী সেই অসহায় অবস্থায় কন্যার হাত ধরে পথ হাটতে লাগলেন। এদিকে সেই রাত্রিতে রাজপুরুষেরা এক চোরকে শূলে চড়িয়ে রাজ-পথের মধ্যেই পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন করেছিল। ঘন অন্ধকারে পথ চলতে চলতে বণিকপত্নী অজ্ঞাতে সেই চোরের গায়ে ধাক্কা দিলেন। চোর দুঃসহ যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠল, 'হায় হায়! অকস্মাৎ কার আঘাতে আমার প্রাণ গেল! ক্ষতের উপর কে নুনের ছিটা দিল!' বণিকপত্নী সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি?' সে বলল 'আমি একজন চোর। শূলে চড়ানোর পরও এই অভাগার প্রাণ গেল না। যাই হোক; ভদ্রে, আপনি কে, কোথায় চলেছেন—আমাকে বলুন।' চোরের বিনয়বাক্যে হিরণ্যবতী আপন ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে, চতুর্দিকের অন্ধকার অনেকটা দূর হয়েছে। চোর বণিককন্যাকে দেখে বণিকপত্নীকে বলল, 'আমার একটি প্রার্থনা আছে, আপনি শুনুন—আমি আপনাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করব, তার বিনিময়ে আপনার কন্যাকে আমার হাতে

সম্প্রদান করুন।' হিবণ্যবতী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললেন, 'আমার কন্যাকে গ্রহণ ক'রে তোমার কি লাভ?' চোর উত্তর দিল, 'আমার জীবন শেষ হতে চলল, অথচ আমি পুত্রহীন। অপুত্রক ব্যক্তি নরক ভোগ করে। তাই আমার প্রস্তাব আপনার কন্যা আমার স্ত্রী হোক এবং আমার মৃত্যুর পর আপনার কন্যা নিয়োগ প্রথায় পুত্রের জননী হলে বিধিমতে সেই সন্তান হবে আমার পুত্র। মা, আমার এই প্রার্থনা সফল করুন।' হিবণ্যবতী চোরের কথা শুনে লোভের বশে তার প্রস্তাবে রাজী হলেন। তারপর তিনি হাজার মুদ্রার বিনিময়ে কন্যাব মাথায় জল ছিটিয়ে এবং উভয়কে শপথ বাক্য উচ্চারণ করিয়ে চোরের উদ্দেশ্যে কন্যা ধনবতীকে সম্প্রদান করলেন।

ধনবতীকে গ্রহণ ক'রে চোর তাকে স্ত্রীর যোগ্য সমুচিত উপদেশ প্রদান করল এবং তারপর বণিকপত্নীকে বলল, 'মা এবার ঐ বট গাছের তলায় গিয়ে মাটী খুঁড়ে আমার সঞ্চিত এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করুন। আমার মৃতদেহ যথাবিধি সৎকার ক'রে অস্থি তীর্থে নিক্ষেপ করবেন, তারপর কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বক্রোলক রাজ্যে হাজির হবেন। সেখানে সূর্যপ্রভ নামে এক পরাক্রমশালী রাজা বাস করেন। আপনি তার রাজ্যে নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে বাস করতে পারবেন।' এই কথা বলে তৃষ্ণার্ত চোর বণিকপত্নীর প্রদত্ত জল পান করল। অতঃপর শূলব্যথায় তার মৃত্যু হোল। তখন হিরণ্যবতী বটগাছের তলায় লুকায়িত অর্থ সংগ্রহ ক'রে গোপনে স্বামীর বন্ধুদের গৃহে ফিরলেন এবং তাদের সাহায্যে চোরের মৃতদেহ সৎকার ক'রে অস্থিগুলি তীর্থে নিক্ষেপের ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর স্বর্ণমুদ্রাগুলি সঙ্গে নিয়ে একদিন উভয়ে বক্রোলক নগরে পৌঁছালেন এবং সেখানে বসুদত্ত নামক এক বণিকের নিকট একটি বসতবাড়ী ক্রয় ক'রে সেই গৃহে দিন কাটাতে লাগলেন। বিষ্ণুস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাদের প্রতিবেশী ছিলেন। তার শিষ্য ছিলেন মনঃস্বামী নামে এক

সুদর্শন তরুণ ব্রাহ্মণ। এই শিষ্যটি শিক্ষাদীক্ষায় আগ্রহী হলেও যৌবনের চাপল্যবশে হংসাবলী নামে এক বারবধূর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। হংসাবলীর পণ ছিল পাঁচ শ' স্বর্ণমুদ্রা। তরুণ মনঃস্বামীর আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না; তাই তিনি দুশ্চিন্তায় কাল কাটাতেন।

একদিন বণিককন্যা ধনবতী বাড়ীর ছাদ থেকে সেই ক্ষীণদেহ অথচ সুদর্শন মনঃস্বামীকে দেখে তার রূপে আকৃষ্ট হলেন। তিনি তার পরলোকগত স্বামীর আদেশ স্মরণ ক'রে জননীকে বললেন, 'মা, আমাদের প্রতিবেশী সুদর্শন ব্রাহ্মণ যুবককে দেখেছ কী?' হিরণ্যবতী বুঝলেন তার কন্যা ঐ যুবককে ভালোবেসেছে। তিনি চিন্তা করলেন, 'আমার কন্যা তার স্বামীর আদেশমত পুত্র উৎপাদনের জন্য অন্য পুরুষকে বরণ করতে পারবে। তাহলে সে ঐ যুবকটিকেই বা অভ্যর্থনা করছে না কেন?' এই ভেবে তিনি সেই যুবককে আনয়নের জন্য একজন চেটীকে পাঠালেন। চেটী গোপনে যুবকের কাছে হাজির হয়ে হিরণ্যবতীর প্রস্তাব নিবেদন করল। তার কথা শুনে প্রমদাসক্ত মনঃস্বামী বললেন যে তিনি গণিকা হংসাবলীর প্রতি আসক্ত; সুতরাং সেই গণিকার নির্ধারিত দক্ষিণা উপার্জনের জন্য পাঁচ শ' স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তিনি এক রাত্রির জন্য বণিককন্যার সঙ্গে সহবাস করতে পারেন। চেটী ফিরে এসে বণিকপত্নীকে একথা জানালে তিনি তার হাতে পাঁচ শ' মুদ্রা দিয়ে পুনরায় মনঃস্বামীর কাছে পাঠালেন। মনঃস্বামী প্রতিশ্রুত অর্থ আদায় ক'রে বণিক-কন্যা ধনবতীর বাসভবনে গমন করলেন এবং জ্যোস্নালোকে তৃপ্ত চকোরের ন্যায় ধনবতীর রূপসুধা পান করলেন। রতিরভসে সমগ্র রাত্রি অতিবাহিত ক'রে তিনি প্রাতঃকালেই গোপনে ধনবতীর শয়ন-গৃহ থেকে নির্গত হয়ে স্বগৃহে ফিরলেন। বণিককন্যা সেই মিলনের ফলে গর্ভবতী হলেন এবং যথাকালে এক পুত্রের জননী হলেন। হিরণ্যবতী ও ধনবতী দুজনেই অত্যন্ত খুশী হলেন।

অতঃপর এক রাত্রিতে ভগবান মহাদেব হিরণ্যবতী ও ধনবতীর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে জানালেন, 'হাজার স্বর্ণ মুদ্রার সঙ্গে তোমাদের শিশু সন্তানকে রাজা সূর্যপ্রভের রাজদ্বারে নিয়ে যাও এবং তারপর যে কোন উপায়ে তাকে রাজার শয্যায় পরিত্যাগ ক'রে ফিরে এস। এর ফলে সকলেরই মঙ্গল হবে।' স্বপ্নে মহাদেবের আদেশ শুনে উভয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং পবস্পর পরস্পরের স্বপ্নকাহিনী বর্ণনা করলেন। স্বপ্নে বিশ্বাস ক'রে উভয়ে সেই পুত্র সন্তানকে রাজান্তঃপুরে রাজার শয্যামধ্যে শুইয়ে রেখে গৃহে ফিরে এলেন। অন্যদিকে পুত্র-কামনায় উদ্বিগ্ন রাজা সূর্যপ্রভকেও মহাদেব স্বপ্নে বললেন, 'মহারাজ, সিংহদ্বারের অভ্যন্তরে একটি সুলক্ষণ শিশু পরিত্যক্ত হয়েছে; তার সঙ্গে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আছে। ঐ স্বর্ণমুদ্রা ও শিশুটিকে সযত্নে গ্রহণ কর।' প্রাতঃকালে যখন রাজার ঘুম ভাঙ্গল তখন দ্বাররক্ষীরা পরিত্যক্ত শিশু প্রাপ্তির সংবাদ মহারাজের কাছে নিবেদন করল। রাজা তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে হাজির হয়ে স্বর্ণমুদ্রাসহ শিশুটিকে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন তার হাতে ও পায়ে ছত্র এবং পতাকার সামুদ্রিক লক্ষণ। তার শুভ আকৃতি দেখে রাজা বলে উঠলেন, 'স্বয়ং শম্ভু আমাকে সর্বশুভলক্ষণযুক্ত পুত্র দান করছেন।' এই বলে তিনি শিশুটিকে সাদরে গ্রহণ করলেন। রাজ্যে মহোৎসব চলতে লাগল। দ্বাদশ দিনে শিশুর নামকরণ হোল চন্দ্রপ্রভ। কালক্রমে রাজকুমার সর্বগুণের অধিকারী হলেন এবং প্রজাদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হলেন। চন্দ্রপ্রভ ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করলেন; তিনি শৌর্যবীর্য প্রভৃতি গুণে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন এবং রাজ্যপরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। রাজা সূর্যপ্রভ পালিত পুত্রের ঈদৃশ গুণা-বলী দেখে তার হাতে রাজ্যভার অর্পণ ক'রে বৃদ্ধবয়সে বারাণসীতে গমন করলেন। রাজনীতিতে সুপণ্ডিত চন্দ্রপ্রভ দৃঢ়হস্তে বিশাল রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। কিছুদিন পর মহারাজ সূর্যপ্রভ বারাণসী ধামে কঠোর তপস্যায় দেহত্যাগ করলেন। ধার্মিক রাজা চন্দ্রপ্রভ

পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। তারপর তিনি যথাবিধি অশৌচাদি ক্রিয়া সম্পাদন ক'রে মন্ত্রীদের ডেকে বললেন, 'পিতার ঋণ আমি কোন উপায়েই শোধ করতে পারব না। তাঁর মুক্তির জন্য আমি স্বহস্তে গঙ্গায় অস্থি নিক্ষেপ করব এবং গয়ায় পিতা ও পিতৃপুরুষদের পিণ্ড দান করব। সুতরাং এই কাজ সম্পাদনের জন্য তীর্থযাত্রার প্রয়োজন।' তার কথা শুনে মন্ত্রীরা বললেন, 'প্রভু, এই মুহূর্তেই এমন কাজ করা উচিত হবে কি? রাজ-কার্যে সততই বহু অনর্থ; তাছাড়া আপনার অভিপ্রেত কর্ম রাজ-পুরোহিতগণই সম্পাদন করতে পারেন। রাজ্য পরিচালনা অপেক্ষা তীর্থযাত্রা অধিক কাম্য নয়; পথভ্রমণে বহু বিপদ-আপদ আছে। নরপতি স্বয়ং সুরক্ষিত থাকলে কোন দুশ্চিন্তাই থাকে না।' মন্ত্রীদের কথায় রাজা বললেন, 'আমি যা স্থির করেছি, তার কোন বিকল্প নেই। পিতৃকার্যের জন্য আমার অবশ্যই তীর্থে যাওয়া কর্তব্য। অধিকন্তু যতদিন শরীরে সামর্থ্য আছে, ততদিনই তীর্থযাত্রার উপযুক্ত সময়। ক্ষণস্থায়ী জীবনের কি পরিণাম ঘটবে কে জানে? তাই আমার প্রত্যাবর্তনকাল পর্য্যন্ত আপনারা রাজ্যভার পালন করুন।' মহারাজের দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা শুনে মন্ত্রীরা নিরুত্তর রইলেন। অতঃপর চন্দ্রপ্রভ তীর্থভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন।

শুভদিনে স্নানাদির পর যাগার্চনা ও ব্রাহ্মণদের অভ্যর্থনা সেরে রাজা চন্দ্রপ্রভ পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে সজ্জিত রথে আরোহন করলেন। পৌরজানপদেরা সীমান্ত পর্য্যন্ত তার অনুগমন করলেন। শান্তগতি রাজা সকলকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় নির্গত হলেন। পথে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান এবং বহুভাষাভাষী লোকজনদের দেখে তার আনন্দের সীমা রইল না। ক্রমে ক্রমে বহু দেশ অতিক্রম ক'রে গঙ্গার তীরে পৌঁছালেন। জলকল্লোলপ্লাবিনী সর্বজীবের স্বর্গসোপানপদ্ধতিস্বরূপা হিমালয়োৎপন্না গঙ্গা। এই গঙ্গা প্রণয়ক্রীড়াকালে কোপহেতু এবং

সপত্নী গৌরীর প্রতি ঈর্ষ্যাবশে স্বামী মহেশের কেশাকর্ষণ করেছিলেন; ইনি দেবর্ষি ও সিদ্ধদের পূজনীয়া। চন্দ্রপ্রভ যথাবিধি স্নান ও তর্পণাদি সমাপন ক'রে পিতা সূর্যপ্রভের অস্থি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর তিনি যথাশাস্ত্র দান ও শ্রাদ্ধকর্ম শেষ ক'রে রথারোহনে প্রয়াগে উপস্থিত হলেন এবং উপবাসী অবস্থায় শ্রাদ্ধ ও দানাদি সম্পাদনের পব বারাণসীতে পৌছালেন। তিনি সেখানে তিন দিন উপবাসের পর মহাদেবের অর্চনা ক'বে গয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। বহু গিরিনদী অতিক্রম ক'রে রাজা গয়াশির নামক প্রসিদ্ধ স্থানে পৌছে বিধিসম্মতভাবে বহুদক্ষিণাযুক্ত পিতৃশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান ক'বে গয়াকূপে পিণ্ডদানের জন্য প্রস্তুত হলেন। সেই সময় চন্দ্রপ্রভপ্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণেব জন্য তিনজন মানুষেব হাত কূপের জলমধ্যে আবির্ভূত হোল। বিভ্রান্ত বিমূঢ় রাজা আশ্চর্যান্বিত হয়ে ব্রাহ্মণদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'পিণ্ডগ্রহীতা তিন হাতের মধ্যে আমি কোন্ হাতে পিণ্ড দান করব ?' ব্রাহ্মণেরা জানালেন, 'মহারাজ, নিঃসন্দেহে বলা যায় এই তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন হলেন চোর, কারণ তার হাতে সিঁধ কাটার যন্ত্র; দ্বিতীয় জন ব্রাহ্মণ, কারণ তার হাতে কুশ এবং তৃতীয় জন রাজা, কারণ তাব হাতে রাজচিহ্ন। সুতরাং আমরা স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারছি না, আপনি কোন্ হাতে পিণ্ডদান করবেন।'

এই বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা ক'রে রাজা ত্রিবিক্রমসেনের স্কন্ধস্থিত বেতাল জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ, আমার পূর্ব অভিশাপ স্মরণ ক'রে বলুন রাজা কোন্ হাতে পিণ্ড দান করবেন ?' রাজা বললেন, 'বেতাল, রাজা চন্দ্রপ্রভ শাস্ত্রবিধি অনুসারে চোরের ক্ষেত্রজ পুত্র, অন্য কারো পুত্র নন। তাই চোরের হাতে পিণ্ড দান করাই বিধেয়। ব্রাহ্মণ মনঃস্বামীর ঔরসে তার জন্ম হলেও তিনি তার পুত্র নন, কারণ ঐ ব্রাহ্মণ পাঁচ শ' মুদ্রার বিনিময়ে এক রাত্রির জন্য নিজেকে বণিক্‌কন্যার কাছে বিক্রী করেছিলেন। রাজা সূর্যপ্রভ চন্দ্রপ্রভকে লালনপালনের জন্য পিতৃত্বের মর্যাদা লাভের অধিকারী হতেন, যদি তিনি ঐ শিশুর সঙ্গে

প্রদত্ত সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ না করতেন ; তিনি গচ্ছিত অর্থের বিনিময়েই শিশুকে পালন করেছিলেন। মায়ের সাক্ষাতে যে চোরের হাতে ধনবতীকে সম্প্রদান করা হয়েছিল সেই চোরের আজ্ঞা অনুসারেই নিয়োগ প্রথায় চন্দ্রপ্রভের জন্ম এবং সেই চোরই ব্রাহ্মণযুবা মনঃস্বামীর নিকট অর্থের বিনিময়ে সন্তান উৎপাদনের বীজ ক্রয় করেছিলেন। অতএব চন্দ্রপ্রভ চোরের ক্ষেত্রজ পুত্র, সুতরাং সেই পিণ্ডভাগী।’

রাজার মুখে এই উত্তর শুনে বেতাল পুনরায় রাজার কাঁধ থেকে শিশুগাছের শাখায় আশ্রয় নিলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজাও পুনরায় বেতালের সন্ধানে চললেন।

ধূর্ত জুয়াড়ীর আখ্যান

[কথাসরিৎসাগর]

বহুদিন পূর্বে উজ্জয়িনীতে ঢিণ্ডাকরাল নামে এক কুখ্যাত জুয়াড়ী বাস করত। দুর্ভাগ্যবশত সে প্রায়ই পাশাখেলায় পরাজিত হোত। অন্যান্য জুয়াড়ী বন্ধুরা দয়া ক’রে তাকে সামান্য অর্থ দান করত ; সে তার বিনিময়ে ময়দা কিনে আনত আর মাটির ভাঙা থালা যোগাড় ক’রে শ্মশানের আগুনে রুটি তৈরী করত এবং তারপর মহাকালের মন্দিরের প্রদীপ থেকে ঘি চুরি ক’রে আনত। ঘিমাখানো রুটি খেয়ে সে মন্দিরের মধ্যেই শয়ন করত। এইভাবে ঢিণ্ডাকরালের জীবন কাটত।

মহাকাল-মন্দিরের দেওয়ালে নানান দেবদেবীর কাষ্ঠনির্মিত অনেক মূর্তি সজ্জিত ছিল। একদিন ঐ জুয়াড়ী মন্দিরে শয়ন ক’রে দেবমূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, ‘আমি যদি এই দেবতাদের পাশাখেলায় ডাকি তাহলে কেমন হয় ?’ তাই ঠিক ক’রে দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে সে বলতে লাগল, ‘হে দেবদেবীগণ, আমি আপনাদের সবাইকে জুয়োখেলার জন্য ডাক দিচ্ছি।’ একথা

বলেই সে বাজী ধরে দান ফেলল এবং ভাগ্যবশে সমস্ত দান জিতে গেল। তখন সে দেবতাদের আরও বলল, 'আপনারা শীঘ্র আমার প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দিন।' কিন্তু দেবদেবীরা নিরুত্তর। ঢিণ্ডাকরাল রাগে আগুন হয়ে বলল, 'ওহে দেবতারা, আপনারা পরাজিত হয়েও পাথরের মতো মৌন হয়ে আছেন কেন? আমার প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে না দিলে তীক্ষ্ণ করাতের দ্বারা সকলকে খণ্ডবিখণ্ড করব।' এই বলেই জুয়াড়ী করাতহাতে এগিয়ে গেল। আশ্চর্যের বিষয় দেওয়ালের কাছে আসতেই পণের সমস্ত টাকা তার সামনে এসে পড়ল। এভাবে প্রতি রাত্রিতে সে মন্দিরের দেবতাদের কাছে যা রোজগার করত, পরদিন জুয়ার আড্ডায় গিয়ে তাই দিয়ে পাশা খেলত এবং নিঃস্ব হয়ে বাড়ী ফিরত।

এই ব্যাপার কিছুদিন যাবৎ চলতে থাকলে মহাকাল-মন্দিরের দেবদেবীরা ভীষণ বিপদে পড়লেন। তাদের দলনেত্রী চামুণ্ডা দেবী একদিন সবার উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে দেবদেবীগণ, যখন ঢিণ্ডাকরাল পাশাখেলায় তোমাদের আহ্বান করবে, তখন তোমরা সবাই জুয়ো-খেলা থেকে বিচ্ছিন্ন বলে ঘোষণা করবে। খেলার নিয়ম অনুসারে তখন তোমাদের কোন দায়িত্ব থাকবে না।' পরের রাত্রিতে জুয়াড়ী দেবতাদের আহ্বান জানালে তারা সবাই চামুণ্ডার উপদেশমতো ঘোষণা করল। তখন অন্য উপায় না দেখে ঢিণ্ডাকরাল প্রধান দেবতা মহাকালকে ডাক দিল। কিন্তু জুয়াড়ীর ভয়ে তিনিও একই উত্তর দিলেন। এরপর জুয়াড়ী ভাবল যে মহাকালের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া পথ নেই। সে দণ্ডবৎ হয়ে দেবতার স্তব শুরু করল, 'হে মহাদেব, আপনার সেই মূর্তিকে প্রণাম—যে মূর্তিতে দিগম্বর বেশে আপনি পার্বতীর সঙ্গে পাশায় আপনার বাহন ষাঁড়, পরণের বাঘছাল, মাথার অলংকার ও চন্দ্রকলা পণস্বরূপ স্থাপন ক'রে পরাজিত হয়েছিলেন এবং মড়ার খুলির সাহায্যে লজ্জা নিবারণ করেছিলেন। প্রভু, আপনার কৃপাতেই দেবগণ সর্ব সম্পদের

অধিকারী, অথচ আপনি স্বয়ং সর্বত্যাগী। আমি অতি অধম, পাপী ; আপনার যদি এত দয়া, তবে কেন আমায় বঞ্চনা করছেন ? শরণাগতকে কেন পায়ে ঠাঁই দিচ্ছেন না ? আমি তো আপনারই কিংকর ; গায়ে ছাই মাখি, আর মাটির পাত্রে উদর পূরণ করি। প্রভু, যে মুখে আপনার স্তব করছি, সেই মুখে জুয়াড়ীদের সঙ্গে কেমন ক'রে আলাপ করব ?'

প্রশংসায় খুশী হয়ে মহাদেব বললেন, 'বৎস, আমি তোমার উপর প্রসন্ন ; তুমি নিশ্চিন্ত মনে আমার মন্দিরে বাস কব। আমার কৃপায় ভোগ-বিলাসের সব উপকরণ জুটে যাবে।' তারপর এক রাত্রিতে মহাকালের মন্দিরসংলগ্ন সরোবরে একদল অপ্সরা স্নান করতে এল। মন্দিরচত্বরে পরিধেয় বস্ত্রাদি বেখে যখন তারা সবোবরের জলে ক্রীড়া করতে নামল, তখন মহাদেব জুয়াড়ীর কানে কানে বললেন, 'বৎস, তুমি অপ্সবাদেব কাপড়গুলি লুকিয়ে রাখ, যখন তারা সেগুলি ফেরৎ চাইবে তখন তুমি অপ্সবা কলাবতীকে দাবী করবে।' জুয়াড়ী দেবতার আদেশ অনুসাবে কাজ করল এবং অপ্সরাগণ তাব প্রস্তাবে সম্মত হোল। তাদেব মনে পড়ল অপ্সবা অলম্বুষাব কন্যা এই কলাবতীর উপব বিবক্ত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র তাকে মর্তবাসেব অভিশাপ দিয়েছিলেন ; তাই তাব ভাগ্যে এমন ঘটল। তাবপব মহাদেবেব কৃপায় জুয়াড়ীর জন্য এক রমণীয় প্রাসাদ গড়ে উঠল এবং অপ্সবা কলাবতীর সঙ্গে সে আনন্দে দিন কাটাতে লাগল।

কলাবতী দিনের বেলায় স্বর্গে গিয়ে দেবরাজের পরিচর্যা করত এবং রাত্রিতে জুয়াড়ীর সেবা করত। জুয়াড়ীর প্রেমে পরিতুষ্ট অপ্সরা একদিন তাকে বলল, 'নাথ, ইন্দ্রের অভিশাপ আমার কাছে আশীর্বাদ ; তা না হলে তোমার সঙ্গ পেতাম না। প্রিয়তম, তোমার সঙ্গে এক গোপন পরামর্শ আছে। আগামীকাল দেবসভায় রম্ভার নৃত্যপরীক্ষা হবে ; আমি সেখানে নিমন্ত্রিত। তাই এখানে ফিরতে সামান্য বিলম্ব হতে পারে।' একথা শুনে জুয়াড়ী তার সঙ্গে যাওয়ার

জন্য জিদ ধরল। কলাবতী অনেক চেষ্টা করেও যখন তাকে নিবৃত্ত করতে পারল না তখন তার যাওয়াই স্থির হোল।

পরদিন অপ্সরা কলাবতী যথাসময়ে ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত। জুয়াড়ী ঢিণ্ডাকরালও মাছির রূপ ধরে তার কানের দুলের উপর বসে স্বর্গে হাজির হোল। রম্ভার নাচের পর ছাগলের আকৃতিবিশিষ্ট স্বর্গের এক ভাঁড় বিবিধ কৌতুকনাচে সকলকে খুশী করল। তাকে দেখেই জুয়াড়ী চিনতে পারল, কারণ সে প্রতিরাত্রে উজ্জয়িনীতে মহাকালের মন্দিরে নাচ দেখায়। সভাশেষে সবাই আপন আপন আবাসে ফিরে এল। পরের দিন জুয়াড়ী উজ্জয়িনীর পথে সেই ছাগমুখ ভাঁড়কে দেখেই বলল, 'ওরে, তুই ইন্দ্রের সভায় নাচ দেখিয়ে যেমন সবাইকে হাসিয়েছিলি এখানে সেই কৌতুকনাচ নাচতো।' কিন্তু ভাঁড় তার কথায় রাজী হোল না। জুয়াড়ী তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে লাঠি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করল। সে গিয়ে ইন্দ্রের কাছে নালিশ জানাল। ইন্দ্র ধ্যানযোগে সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পারলেন; কলাবতীর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরায় অভিশাপ দিলেন যে সে পৃথিবীতে নাগপুরের রাজা নরসিংহের দেবালয়ে পুতুল হয়ে শোভা পাবে। কিন্তু তার মায়ের অনুরোধে অভিশাপ-নিবৃত্তির উপায়ও বলে দিলেন, 'ঐ দেবালয় ভেঙ্গে সমভূমি হলে কলাবতী মুক্তি পাবে।' কলাবতী জুয়াড়ীর কাছে এসে তার দুঃখের কাহিনী জানাল। কিন্তু তার কাছে অলংকারগুলি গচ্ছিত রাখার পরই সে কাঠের পুতুলে পরিণত হোল। জুয়াড়ী আপন কৃতকর্মের অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগল।

তারপর জুয়াড়ী কয়েকদিনের মধ্যেই জটা, বাঘছাল, রুদ্রাক্ষের মালা প্রভৃতি যোগাড় ক'রে সন্ন্যাসী সেজে সেই নাগপুরে পৌঁছাল। কলাবতীর গচ্ছিত অলংকারগুলি চারটি কলসীতে ভরে মন্দিরসংলগ্ন বাগানের চার কোণায় পুঁতে রাখল এবং ঐ বাগানে একখানি কুঁড়ে ঘর তৈরী ক'রে সন্ন্যাসীর মতো বাস করতে লাগল। কিছুদিনের

মধ্যেই সে সিদ্ধ তপস্বিরূপে ঐ অঞ্চলে খ্যাতি লাভ করল। তার কথা রাজার কানেও পৌঁছাল। একদিন রাজা তাকে দেখতে এলেন; বহুক্ষণ কথাবার্তার পর সন্ধ্যাবেলা তিনি রাজধানীতে ফিরতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময় অদূরে শেয়ালের ডাক শোনা গেল। ধূর্ত সন্ন্যাসী তা শুনে হেসে উঠল। রাজা হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, 'মহারাজ, আমি শৃগাল-শাস্ত্র বহুযত্নে অধ্যয়ন করেছি, তাই তাদের ডাকের অর্থ বুঝি! এই নগরের পূর্বদিকে এক বাগান আছে, তার এক কোণে একটি রত্নভরা কলসী আছে। সেই সম্পদ গ্রহণ করার জন্য আমাকে আহ্বান করছে।' কথা শুনে রাজা বিস্মিত হলেন। সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সেই বাগানে গিয়ে মাটি খুঁড়িয়ে রত্ন-কলসী উদ্ধার করলেন। সন্ন্যাসী তখন বলল, 'মহারাজ আমার ধনসম্পদের প্রয়োজন নেই, এই কলসী আপনিই নিন।' এইভাবে সন্ন্যাসবেশী চতুর জুয়াড়ী নানান পশু-পক্ষীর ডাকের বিভিন্ন অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে বাকী তিন ঘড়া ধন উদ্ধার ক'রে রাজাকে দান করলেন। রাজধানীতে ফিরে রাজা সবার কাছেই সন্ন্যাসীর বিশেষ প্রশংসা করতে লাগলেন! অল্পকালের মধ্যেই তার বহু ভক্ত ও শিষ্য জুটে গেল। পুনরায় একদিন রাজপুরুষদের সঙ্গে নিয়ে রাজা তার আশ্রমে এলেন এবং তার সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। যখন তারা অভিশপ্তা অপ্সরা কলাবতীর পুতুলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সেই পুতুলের দুচোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সবাই খুব অবাক হলেন। পুতুলের রোদন-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় সন্ন্যাসী বিষণ্ণভাবে বলল, 'মহারাজ, এ ব্যাপার ভয়ানক অশুভ! আপনার এই দেবমন্দির অশুভ লগ্নে স্থাপিত হয়েছে। আগামী তৃতীয় দিনে আপনার ভাগ্যে মহৎ অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখছি। তাই আমার পরামর্শ এই দেবালয় ভেঙ্গে সমতল করুন এবং তারপর শুভ দিনক্ষণ দেখে পুনরায় নির্মাণ করুন।' ভীত রাজা তার পরামর্শ অনুসারে কাজ করলেন। কলাবতী অভিশাপ থেকে মুক্তি পেল

এবং উজ্জয়িনীতে ফিরে গেল। ধূর্ত জুয়াড়ীও সন্ন্যাসীর বেশভূষা পরিত্যাগ ক'রে উজ্জয়িনীতে ফিরে এসে অপ্সরার সঙ্গে মিলিত হোল।

গুহসেন-দেবস্মিতা বৃত্তান্ত

[কথাসরিৎসাগর]

বৎসরাজ উদয়নের মহিষী বাসবদত্তার অনুরোধে প্রিয় বয়স্য বসন্তক বণিক্‌কুলবধূ দেবস্মিতার পতিভক্তিপরায়ণতার এক কাহিনী বলতে শুরু করলেন: তাম্রলিপ্ত নামে এক নগর ছিল। সেখানে ধনদত্ত নামে এক বিত্তশালী সওদাগর বাস করতেন; তিনি ছিলেন অপুত্রক। একদিন মান্য ব্রাহ্মণদের ডেকে বণিক্ মনের দুঃখ প্রকাশ করলে ব্রাহ্মণেরা বললেন, 'মহারাজ, এ তো কঠিন সমস্যা নয়; বৈদিক প্রক্রিয়ায় ধর্মাচরণ করলে দুষ্কর কাজও সুকর হয়। শাস্ত্রে বলে প্রাচীনকালে জনৈক রাজার অন্তঃপুরে একশ পাঁচ মহিষী ছিলেন; কিন্তু কারো সন্তানসন্ততি ছিল না। ব্রাহ্মণদের দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ক'রে রাজা এক পুত্র লাভ করলেন; তার নাম রাখা হোল জন্তু। রাজপুত্র রাণীদের চোখের মণি হয়ে উঠল। একদিন তার উরুদেশে পিপীলিকায় দংশন করলে সে ব্যাকুলভাবে চীৎকার শুরু করল। তাই শুনে রাজা ও রাণীরা ভীষণ উদবিগ্ন হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর রাজপুত্র শান্ত হলে রাজা চিন্তা করলেন পুত্রহীনতাও যেমন দুঃখের কারণ, তেমনি একপুত্র থাকাও অতীব দুঃখের হেতু। তিনি পুনরায় ব্রাহ্মণদের ডেকে এর প্রতিবিধান চাইলেন। পণ্ডিতরা বললেন, 'মহারাজ, এর একমাত্র উপায় আছে; আপনার পুত্রকে হত্যা ক'রে তার মাংস আহুতি দিয়ে যজ্ঞ করতে হবে এবং সেই যজ্ঞীয় ধূমের গন্ধে আপনার মহিষীরা গর্ভবতী হবেন।' ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে কাজ ক'রে রাজা প্রত্যেক রাণীর গর্ভে একটি ক'রে পুত্র লাভ করলেন। এই কাহিনী বর্ণনা ক'রে ব্রাহ্মণরা বললেন, 'ওহে সওদাগর, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে আপনিও সন্তান লাভ করবেন।'

যথাবিধি হোম সম্পাদন ক'রে ধনদত্ত পুত্রের মুখ দর্শন করলেন। তার নাম রাখা হোল গুহসেন। কালক্রমে গুহসেন যৌবনে পদার্পণ করলেন; ধনদত্ত পুত্রের জন্য একটি সুন্দরী কন্যা খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু মনোমত পাত্রীর সন্ধান না পেয়ে তিনি পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে দূর দ্বীপে বাণিজ্য যাত্রা করলেন। সেই দ্বীপের ধনাঢ্য বণিক্ ধর্মগুপ্তের সুন্দরী কন্যা দেবস্মিতাকে দেখে ধনদত্ত তাকেই পুত্রবধূরূপে প্রার্থনা করলেন; কিন্তু তাম্রলিপ্ত অনেক দূর এই কারণে দেবস্মিতার পিতা সম্মত হলেন না। এদিকে গুহসেনের রূপগুণে আকৃষ্ট হয়ে বণিক্‌কন্যা তার প্রেমে পড়লেন। গভীর রাত্রিতে সখীর সাহায্যে তিনি পিত্রালয় ছেড়ে গুহসেনের বাণিজ্যপোতে উপস্থিত হলে পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারে তারা সকলে তাম্রলিপ্তের দিকে রওনা হলেন। স্বদেশে পৌঁছানোর পর ধনদত্ত গুহসেন ও দেবস্মিতার বিবাহ সম্পাদন করলেন। দুজনে দুজনার প্রতি গভীর-ভাবে আকৃষ্ট হলেন।

কিছুদিন পর ধনদত্তের মৃত্যু হোল। গুহসেনের বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন কটাহদ্বীপে বাণিজ্যযাত্রার জন্য। কিন্তু দেবস্মিতা সম্মত হলেন না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গুহসেন দেবতার অনুমতির আশায় অনাহারে তপস্যা শুরু করলেন। দেবস্মিতাও স্বামীর সঙ্গে যোগ দিলেন। উভয়ের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবতা স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'তোমাদের দুজনার হাতে দুটি পদ্মফুল দান করলাম। পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকার সময় যদি একজন অসদাচরণ কর, তবে অন্যের হাতের পদ্মটি মুদিত হয়ে যাবে।' দেবতার ফুল হাতে নিয়ে গুহসেন কটাহদ্বীপে যাত্রা করলেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর বহু মূল্যবান রত্নের লেনদেন হোল। বণিকের হাতে সদাবিকশিত পদ্মটি দেখে অন্য বণিকেরা কৌতূহলবশে তাকে গৃহে নিমন্ত্রণ ক'রে অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়ে মত্ত অবস্থায় পদ্মের রহস্য জেনে নিল। তারপর চারজন ধূর্ত বণিক্‌পুত্র স্থির করল তাম্রলিপ্তে গিয়ে গুহসেনের

বাড়াতে হাজির হয়ে যে কোন উপায়ে সুন্দরী দেবস্মিতাকে ভোগ করবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সেই বণিক্‌পুত্রেরা তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হয়ে নিভৃতে বসে তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানা উপায় চিন্তা করছিল। সেই সময় যোগ-করণ্ডিকা নামে জৈনমন্দিরবাসিনী এক সন্ন্যাসিনী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ধূর্ত বণিকেরা তাঁকে বলল, 'দেবী, আপনি মহীয়সী ; যদি আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন, তাহলে অনেক ধনসম্পদ পুরস্কার পাবেন।' সন্ন্যাসিনী বললেন, 'আমি অর্থের প্রত্যাশা করি না। তবে তোমরা যদি কোন স্ত্রীলোককে বশীভূত করতে চাও, আমি তোমাদের সাহায্য করব। সিদ্ধিকরী নামে আমার শিষ্যা আছে ; আমি তার সাহায্যে অনেক ধনসম্পদ অর্জন করেছি।' ধূর্তেরা জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন ক'রে তা সম্ভব হোল ?' সন্ন্যাসিনী বলতে শুরু করলেন, "একবার উত্তরাপথের এক বণিক এই দেশে এসে বসবাস শুরু করে। আমার শিষ্যা সিদ্ধিকরী দাসী সেজে তার বাড়ীতে পরিচারিকার কাজ নেয়। কিছুদিনের মধ্যে সে বণিকের কাছে অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠল। একদিন সুযোগ বুঝে সে বণিকের গৃহে সঞ্চিত সোনাদানা নিয়ে ভোরবেলায় চম্পট দিল। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এক ডোম তাকে দেখে সন্দেহ ক'রে পিছু নিল। ধূর্তা সিদ্ধিকরী ডোমের মনোভাব বুঝতে পারল। কিছুদূর যাবার পর সে এক পিঁপুলগাছের তলায় এসে দাঁড়াল। ডোমও কাছাকাছি এসে তার ঢোলটি মাটিতে নামিয়ে বিশ্রামের ছল করতে লাগল। তখন সিদ্ধিকরী তার কাছে গিয়ে করুণভাবে বলল, 'দেখুন, আমি আজ স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আত্মহত্যা করব বলে এখানে এসেছি। আপনি যদি এই গাছের ডালে একটা ফাঁস বেঁধে দিয়ে আমাকে সাহায্য করেন, তাহলে খুব ভাল হয়।' ডোম ভাবল, 'এই স্ত্রীলোকটি যখন আত্মহত্যা করতে চাইছে, তখন একে বধ করার কি প্রয়োজন।' তারপর সে সিদ্ধিকরীর কথা মত কাজ করল। এবার

সিদ্ধিকরী কাঁদতে কাঁদতে চণ্ডালকে বলল, 'আমি অতি মূর্খ, কিভাবে গলায় ফাঁস লাগাতে হয় জানি না। আপনি দয়া ক'রে একবার দেখিয়ে দিন।' মূর্খ ডোম তার কথায় সহজেই বিশ্বাস ক'রে ঢোলটি মাটিতে নামিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে যেই গলায় ফাঁস লাগিয়েছে, তৎক্ষণাৎ সিদ্ধিকরী লাথি মেরে ঢোল সরিয়ে দিল এবং ডোম গলায় ফাঁস আটকে মারা গেল।

এদিকে সেই বণিক্ গৃহভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে দাসীর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন। নানান জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। সিদ্ধিকরী দূর থেকে তাদের দেখে বহু পূর্বেই সেই পিঁপুল-গাছে উঠে পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। তারপর গাছের নীচে ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখে বণিক ভয়ে সে স্থান ত্যাগ করতে চাইলেন। কিন্তু তার ভৃত্যটি ছিল অত্যন্ত সাহসী; সে প্রভুকে অপেক্ষা করতে বলে বৃক্ষে আরোহণ ক'রে দাসীকে খুঁজতে লাগল এবং কিছুক্ষণ পর তাকে দেখতে পেল। সিদ্ধিকরী ইঙ্গিতে তাকে চুপ করতে বলে অতি সন্তর্পণে তার কাছে এসে কানে কানে বলল, 'ওগো যুবক, আমি প্রথমদিন থেকেই মনে মনে তোমার প্রতি আসক্ত ছিলাম। বণিকের যে ধনসম্পদ চুরি করেছি, তার সব গ্রহণ ক'রে আমার সঙ্গে সংসার কর।' এই বলে সিদ্ধিকরী ভৃত্যকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করতে লাগল। হঠাৎ সে দাঁত দিয়ে ভৃত্যের জিহ্বার অগ্রভাগ কেটে ফেলল। তার মুখ থেকে অজস্র ধারায় রক্ত পড়তে লাগল। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ভৃত্য তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ থেকে নীচে পতিত হোল। সমস্ত ব্যাপারটিকে ভৌতিক কাণ্ড ভেবে বণিক্ ভয়ে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। অতঃপর ধূর্তা সিদ্ধিকরী বৃক্ষ থেকে অবতরণ ক'রে স্বগৃহে প্রস্থান করল।"

উক্ত কাহিনী বর্ণনার পর সন্ন্যাসিনী আপন শিষ্যা ঐ সিদ্ধিকরীর সঙ্গে বণিক্‌পুত্রদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারা জানাল, 'এই নগরের প্রবাসী বণিক্ গুহসেনের পত্নী দেবস্মিতা আমাদের

অভিলষিতা।' তারপর সন্ন্যাসিনী নিজ গৃহে তাদের বসবাস ও ভোজনের ব্যবস্থা করে দিলেন। পরদিন দুষ্টা সন্ন্যাসিনী শিষ্যা সিদ্ধিকরীকে সঙ্গে নিয়ে দেবস্মিতার গৃহে উপস্থিত হলেন। গৃহদ্বারে এক প্রভুভক্ত কুকুব বাঁধা ছিল; সে তাদের দেখে চীৎকার শুরু করল। দেবস্মিতা দাসীর সাহায্যে উভয়কে গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে এলেন। সন্ন্যাসিনী তাকে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, 'মা, অনেকদিন থেকে তোমাকে দেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আজ স্বপ্নে দেখলাম তুমি অত্যন্ত দুঃখিনী; তাই সাক্ষাতের জন্য এসেছি। তোমার স্বামী বিদেশে, এদিকে তোমার রূপযৌবন বৃথা নষ্ট হতে চলেছে।' এরূপ নানা উপদেশ দিয়ে কিছুটা সময় সেখানে অতিবাহিত ক'রে ঘরে ফিরে এলেন। পরদিন সন্ন্যাসিনী তীব্র মরিচযুক্ত একখণ্ড মাংস হাতে নিয়ে বণিক্‌পত্নীর দ্বারে উপস্থিত হয়ে গৃহপালিত কুকুরটিকে সেই মাংসের দ্বারা বশীভূত ক'রে চোখের জল ফেলতে ফেলতে অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এদিকে কিছুক্ষণের মধ্যে কুকুরের চোখ ও নাক থেকে জল গড়াতে লাগল। সন্ন্যাসিনীকে কাঁদতে দেখে দেবস্মিতা তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, 'তোমার দরজায় ক্রন্দনরত কুকুরটিকে দেখে আমিও তার দুঃখে না কেঁদে পারছি না।' কুকুরকে তদবস্থায় দেখে দেবস্মিতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কেমন ব্যাপার?' সন্ন্যাসিনী বললেন, 'দেখ বাছা, আগের জন্মে ঐ কুকুর এবং আমি এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী হয়ে জন্ম নিই। রাজকার্য পালনের জন্য আমাদের স্বামী প্রায়ই বাড়ীর বাইরে কাটাতেন। সেই সুযোগে আমি স্বেচ্ছামত পরপুরুষ ভোগ করতাম; এক দিনের জন্যও নিজেকে বঞ্চনা করি নি। আর আমার সপত্নী সতীত্বের আদর্শ নিয়ে একনিষ্ঠ জীবন কাটাত। তাই আমি পুণ্যবলে এই জন্মেও মানবী হয়েছি, কিন্তু আমার সপত্নী কুকুর হয়ে জন্মাল। তা হলে কি হয়, ও কিন্তু আমাকে দেখেই পূর্ব জন্মের ঘটনা স্মরণ করতে পেরেছে; তাই দুঃখে কাঁদছে।'

দেবস্মিতা অতিশয় বুদ্ধিমতী ; তার বুঝতে বাকী রইল না যে সমস্তই এই ধূর্তা সন্ন্যাসিনীর ছলনামাত্র। ছলনার আশ্রয় নিয়ে দেবস্মিতাও শান্তচিত্তে উত্তর দিলেন, 'দেবী, আমি এতকাল পর্য্যন্ত এমন ধর্মকথা শুনি নি ; আপনি কোন সুন্দর যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিন।' সন্ন্যাসিনী খুশীমনে তার কাছে বণিক্‌পুত্রদের আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করলেন এবং সেই রাত্রিতে তার বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই অবসরে দেবস্মিতা নিঃশঙ্কচিত্তে তার দাসীকে বললেন, 'দেখ, কয়েকজন বিদেশী বণিক-সন্তান অসদভিপ্রায়ে আমার গৃহে আসছে এবং ঐ দুষ্টা তাপসী হয়েছে তাদের সহযোগী। তুই শীগ্‌গির ধুতরামেশানো মদ আর কামারের দোকান থেকে কুকুরের পায়ের ছাপ দেওয়া একখণ্ড লোহা নিয়ে আয়।' তার কথামতো সমস্ত কাজ সেরে দাসী স্বয়ং দেবস্মিতার রূপ ধরে বণিক্‌পুত্রদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সন্ন্যাসিনী বণিক-পুত্রদের একজনকে তার শিষ্যার বেশে সাজিয়ে সন্ধ্যাবেলায় দেবস্মিতার গৃহে পৌঁছে দিলেন। দেবস্মিতার বেশে সজ্জিতা দাসী শয়নকক্ষে উপস্থিত বণিক্‌পুত্রকে বিষাক্ত মদ্য পান করাল। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই সে মাতাল ও সংজ্ঞাহীন হয়ে গেল ; তারপর দাসী তার দেহের সমস্ত অলংকার ও পোষাক কেড়ে নিয়ে কপালে সেই গরম লোহার ছাপ দিয়ে ভৃত্যদের হাতে তাকে সমর্পণ করল। ভৃত্যরা তাকে অন্ধকারের মধ্যে বহে নিয়ে এক বিষ্ঠাপূর্ণ গর্তে নিক্ষেপ করল। পরদিন সকালবেলা মদের নেশা কাটলে সেই বণিক্‌পুত্র লজ্জায় অপমানে পূর্বরাত্রির সমস্ত ঘটনা গোপন ক'রে স্নানাদির পর বন্ধুদের কাছে ফিরে এল এবং সকলকে জানাল যে রাত্রিবেলা গৃহে ফেরার সময় একদল চোরের হাতে পড়ে সে সর্বস্বান্ত হয়েছে। কপালের পোড়া দাগ ঢাকা দেওয়ার জন্য সে মাথায় একখণ্ড কাপড় বেঁধে ভাণ করল যে রাত্রিজাগরণ ও মদ্যপানের ফলে ভীষণ মাথাব্যথার জন্যে মাথা বেঁধে রেখেছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বণিক্‌পুত্রও পরবর্তী

তিন রাত্রিতে দেবস্মিতার বাড়ীতে যাওয়ার পর একই বিপর্যয়ে পড়ল এবং মিথ্যা কথা বলে সব ব্যাপার গোপন রাখল। এইভাবে বিদেশী বণিক্‌পুত্রেরা ধনসম্পদ্ হারিয়ে অশেষ দুর্গতি লাভ করল এবং ধূর্তা সন্ন্যাসিনীব গৃহ ছেড়ে স্বদেশে ফিবে গেল।

পরদিন সন্ন্যাসিনী মহা আনন্দে শিষ্যা সিদ্ধিকরীকে সঙ্গে নিয়ে দেবস্মিতাকে অভিনন্দন জানাতে তার বাড়ীতে হাজির হলেন। দেবস্মিতা উভয়কে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে সেই ধুতরামিশ্রিত মদ্য পান করিয়ে অচেতন অবস্থায় তাদের নাক ও কান কেটে নগরের বাইরে বিতাড়িত করলেন এবং সমস্ত ঘটনা সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ ক'রে দিলেন। তারপর সকলে আশঙ্কা করতে লাগল যে ঐ পাপিষ্ঠ বণিকপুত্রেরা স্বদেশে ফিরে দেবস্মিতার স্বামীর অনিষ্ট আচরণ করতে পারে। অতঃপর দেবস্মিতা তার চারজন পরিচারিকাকে পুরুষেব বেশে সজ্জিত ক'রে স্বয়ং পুরুষের বেশ ধরে কটাহদ্বীপে উপস্থিত হলেন। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর তিনি স্বামীর সাক্ষাৎ পেলেন, কিন্তু তার কাছেও আপন পরিচয় প্রকাশ করলেন না। সেই দ্বীপের রাজার কাছে তিনি অভিযোগ করলেন যে কটাহদ্বীপের অধিবাসী-রূপে পরিচিত চার ব্যক্তি তার গৃহে ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল ; কিন্তু কয়েকদিন পর তারা বহুমূল্য দ্রব্যাদি অপহরণ ক'রে পলায়ন করে। অভিযোগ শুনে রাজা দেশের সমস্ত প্রজাদের বিচার সভায় ডেকে দেবস্মিতাকে বললেন সেই চার ভৃত্যকে চিনে নিতে। বণিক্‌পুত্রদের কপালে পোড়া দাগ থাকায় দেবস্মিতার পক্ষে খুঁজে নিতে কোন অসুবিধাই হোল না। কিন্তু অন্য সকলেই বলাবলি করতে লাগল ঐ চার জনই ধনীর সন্তান ; তারা কেন ভৃত্যের কাজ গ্রহণ করবে। তখন দেবস্মিতা সকলের সমক্ষে পূর্বাপর কাহিনী বর্ণনা করলেন। রাজা অপরাধীদের কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। দেবস্মিতা স্বামী গুহসেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিজয়গর্বে দেশে ফিরলেন।

রূপিণিকা নামে গণিকার বৃত্তান্ত

[কথাসরিৎসাগর]

ব্রাহ্মণবেশী বসন্তক রাজকুমারী বসন্তসেনার মনোরঞ্জনের জন্য হাস্যরসের এক বিচিত্র কাহিনী শোনালেনঃ এই ভারতবর্ষে কৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরা নামে এক নগরী আছে। সেখানে রূপিণিকা নামে এক গণিকা বাস করত। বৃদ্ধা কুট্টনী মকরদংষ্ট্রা ছিল তার মাতা। গণিকার রূপেগুণে আকৃষ্ট হয়ে যে সব যুবকেরা তার কাছে আসত, তাদের চোখে সেই কুট্টনী ছিল বিষের মতো। একদিন রূপিণিকা মন্দিরে পূজা দিতে গিয়ে এক সুন্দর তরুণকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হোল। কুট্টনীর সমস্ত আবেদন-নিবেদন এবং ভীতি-প্রদর্শনও তার কাছে নিষ্ফল হোল। সে মনে মনে একমাত্র সেই যুবককেই ভজনা করতে লাগল। একদিন সে তার প্রেমিক পুরুষকে ঘরে আনার জন্য দাসীকে আদেশ করল। পরিচারিকা গিয়ে যুবকের কাছে গণিকার আহ্বান জানাল। কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে যুবক বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণসন্তান, নাম লৌহজঙ্ঘ। আমি তো নির্ধন ; ধনিকেরাই গণিকার গৃহে যাওয়ার উপযুক্ত।' দাসী উত্তর দিল, 'আমার স্বামিনী আপনার ধনসম্পদের আশা করেন না ; আপনার উপর তার ভালোবাসা অকৃত্রিম।' একথা শুনে ব্রাহ্মণ যুবক রাজী হলেন। পরিচারিকার মুখে প্রেমিকের গৃহাগমন সংবাদ শুনে গণিকা তার আশায় গৃহদ্বারে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। অল্পক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ লৌহজংঘ যথানির্দিষ্ট সময়ে গণিকার গৃহে উপস্থিত হলেন। বৃদ্ধা কুট্টনী তাকে দেখে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, 'এ আবার কে এল!' এদিকে রূপিণিকা প্রণয়ীকে দেখে অতি প্রসন্নমনে স্বাগত জানাল। প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্না গণিকা আপন সৌভাগ্যে ধন্য হোল।

তারপর থেকে রূপিণিকা অন্য পুরুষের সঙ্গে দেখাশুনা বন্ধ ক'রে লৌহজঙ্ঘের সান্নিধ্যে আনন্দে কাল কাটাতে লাগল। এদিকে তার ঐ রীতিনীতি দেখে মথুরার সব গণিকাদের শিক্ষয়িত্রী তার মা কুট্টনী

মকরদংষ্ট্রা গভীর দুঃখে নিজের মেয়েকে একান্তে উপদেশ দিতে লাগল, 'ওলো মেয়ে, তুই কিনা নির্ধন পুরুষের প্রেমে মজে গেলি? মহৎ লোকেরা শবদেহ স্পর্শ করতে কুণ্ঠিত হন না; কিন্তু বেশ্যারা ধনহীন পুরুষকে স্পর্শ করে না। কোথায় ভালোমানুষের প্রেম, আর কোথায় গণিকার ভালোলাগা! বারবধূর অনুরাগ এবং সন্ধ্যার আলোকরাগ—দুইই সমান। বেশ্যারা নটীর মতো অর্থের লোভে কৃত্রিম প্রেমের অভিনয় করে। তুই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ কর্, এভাবে নিজেকে নষ্ট করিস্ না।' কুট্টনীমাতার একথা শুনে রূপিণিকা উত্তর দিল, 'মা, তুমি আমাকে আর এমন উপদেশ দিও না। ব্রাহ্মণ-কুমার আমার জীবনের অপেক্ষাও প্রিয়। আমার তো ধনসম্পদের অভাব নেই; তাহলে পুরুষসঙ্গের কি প্রয়োজন?' তাই শুনে মকরদংষ্ট্রা সেই ব্রাহ্মণকে বিতাড়িত করার উপায় চিন্তা করতে লাগল। একদিন পথে এক পরিচিত রাজকুমারে সঙ্গে তার দেখা। তার সঙ্গে দেহরক্ষী সশস্ত্র রাজপুরুষরাও ছিল। কুট্টনী রাজকুমারকে ডেকে দুঃখের ঘটনা শোনাল, 'রাজপুত্র, এক নির্ধন লম্পট এসে আমার বাড়ীতে আড্ডা দিচ্ছে। আপনি সত্বর ওকে বিতাড়িত করুন, আর আমার মেয়েটিকে বাঁচান।' কুট্টনীর কথায় রাজী হয়ে রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ রক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে রূপিণিকার গৃহে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সেই সময় রূপিণিকা ও লোহজংঘ দুজনেই বাড়ীর বাইরে ছিল। প্রত্যাবর্তনকালে ব্রাহ্মণ রাজপুত্রের রক্ষীদের হাতে আক্রান্ত হলেন। কিন্তু কোন উপায়ে পলায়ন করলেন। ইতিমধ্যে রূপিণিকা মন্দিরে দেবদর্শন সেরে ঘরে ফিরে আনুপূর্বিক ঘটনা শুনে ক্ষোভে দুঃখে গৃহত্যাগ করল এবং প্রণয়ী ব্রাহ্মণের সন্ধানে ঘুরতে লাগল।

লোহজংঘ ক্রোধে অপমানে ও লজ্জায় তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে আত্মহত্যার সংকল্প ক'রে মথুরা ত্যাগ করলেন। বনের মধ্যে যেতে যেতে ক্লান্ত ব্রাহ্মণ দেখলেন অদূরে এক প্রকাণ্ড হস্তিশব। শৃগাল

কুক্কুর সেই দেহের অভ্যন্তরভাগ নিঃশেষে ভক্ষণ করেছিল। পরিশ্রান্ত লৌহজংঘ বিশ্রামের জন্য হস্তিশবের মধ্যে প্রবেশ ক'রে অল্পকালের মধ্যেই নিদ্রিত হয়ে পড়লেন।

ক্ষণকাল পরে চতুর্দিকের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল এবং মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হোল। প্রবল বৃষ্টিতে সেই হস্তিশব নদীর স্রোতে বাহিত হয়ে সমুদ্রের মধ্যে উপনীত হোল। সাগরের জলে ভাসমান সেই বস্তুটিকে আমিষ ভেবে এক প্রকাণ্ড গরুড় পক্ষী ঠোঁটে ক'রে সেটিকে নিয়ে তীরে এসে তার চামড়া ভেদ ক'রে ফেলল; কিন্তু তার মধ্যে একজন মানুষকে দেখে গরুড় ভয় পেয়ে পলায়ন করল। হস্তিশব থেকে বেরিয়ে এসে ব্রাহ্মণ লৌহজংঘ সমুদ্রতীরে নিজেকে দেখে অবাক হলেন। ইতিমধ্যে দুই রাক্ষস তাকে দেখে সিংহলরাজ বিভীষণের কাছে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করল। রামচন্দ্রের হাতে রাক্ষসরাজ রাবণের পরাজয়ের পর থেকে রাক্ষসরা মনুষ্যজাতিকে ভীষণ ভয় করত। তাই বিভীষণের দূত গিয়ে লৌহজংঘকে বলল, 'প্রভু, আমাদের রাজবাটীতে আগমন ক'রে রাক্ষসকুলকে ধন্য করুন।' লৌহজংঘ তার সঙ্গে লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। পুরীমধ্যে সুবর্ণময় প্রাসাদ ও অট্টালিকার সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হলেন। অবশেষে রাজা বিভীষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল; তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, আপনি কে? কি কারণে আমার রাজ্যে আগমন?' লঙ্কা-রাজের আতিথ্যে প্রীত হয়ে চতুর ব্রাহ্মণ লৌহজংঘ তাকে আশীর্বাদ ক'রে ছলনার আশ্রয় নিয়ে নিজের মিথ্যা পরিচয় জানালেন, 'আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আপন দুঃখ দূর করার জন্য ভগবান নারায়ণের মন্দিরে অনাহারে তপস্যা শুরু করলাম। একদিন স্বয়ং নারায়ণ আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন—'ওহে লৌহজংঘ, লঙ্কার রাজা বিভীষণ আমার পরম বন্ধু। তুমি তার কাছে যাও, অনেক ধনসম্পদ লাভ হবে। তারপর যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখলাম সমুদ্রের তীরে শুয়ে আছি। পরে কি ঘটেছে আমি জানি না।'

ধূর্ত ব্রাহ্মণের কথা শুনে সরলহৃদয় বিভীষণ ভাবলেন, 'এ ব্যক্তি নিশ্চয় অতি মহান্। তাছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে লঙ্কায় পৌঁছানো অসাধ্য কাজ।' সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণকে অনুরোধ জানালেন, 'আপনি আমার রাজ্যে কয়েকদিন অপেক্ষা করুন; আপনাকে বহু ধনসম্পত্তি উপহার দেব।' তারপর বিভীষণ সুমেরু পর্বত থেকে এক বিশাল গরুড়পক্ষীকে ধরে এনে লৌহজংঘকে বললেন 'আপনি এই পাখীটিকে বশে আনুন, এর পৃষ্ঠে আরোহণ করেই মথুরায় ফিরে যেতে পারবেন।' চতুর ব্রাহ্মণ রাক্ষসের আতিথ্যে মহাসুখে কাল কাটাতে লাগলেন।

কিছুকাল পরে বিভীষণ মথুরাগামী ব্রাহ্মণকে অনেক ধনরত্ন দান করলেন এবং সেই সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর জন্য নির্মিত সুবর্ণময় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম উপহার দিলেন। সব কিছু সঙ্গে নিয়ে লৌহজংঘ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন এবং যথাসময়ে মথুরায় উপস্থিত হলেন। সেখানে কয়েকটি রত্ন বিক্রী ক'রে রাজার কাছ থেকে মূল্যবান বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্যাদি ক্রয় করলেন। একদিন তিনি মনোরম বেশবাসে সজ্জিত হয়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ ক'রে সেই গরুড়ে আরোহণ করলেন এবং সন্ধ্যাবেলা মথুরার গণিকা রূপিণিকার গৃহে পৌঁছালেন। গণিকা তাকে দেখে সাক্ষাৎ বিষ্ণু ভেবে প্রণাম জানাল। লৌহজংঘ বললেন, 'আমি সাক্ষাৎ বিষ্ণু; তোমাকে উদ্ধারের জন্য এসেছি।' রূপিণিকা সহজে তাকে বিশ্বাস ক'রে বলল, প্রভু, এ তো আপনার অশেষ কৃপা।' ব্রাহ্মণ গণিকার প্রমোদ কক্ষে আমোদ আহ্লাদে রাত্রিবাস করলেন এবং শেষ রাত্রিতে গরুড়ে আরোহণ ক'রে প্রস্থান করলেন। প্রাতঃকালে রূপিণিকা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভাবতে লাগল, 'আমি তো স্বয়ং লক্ষ্মী হয়ে গেছি; স্বর্গলাভের আর দেরী নেই। তাহলে আজ থেকে অন্য পুরুষের সংসর্গ করব না এবং বাড়ীর বাইরেও যাবো না।' এদিকে তার মা মেয়ের এই অবস্থা দেখে যথার্থ কারণ জিজ্ঞাসা করায়

গণিকা পূর্বরাত্রির সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। বৃদ্ধা কুট্টনী তার কথা বিশ্বাস করতে পারল না। কিন্তু সেই রাত্রিতে লৌহজংঘ-রূপী বিষ্ণুকে স্বচক্ষে দেখে সে অভিভূত হয়ে গেল এবং পরদিন সকালে কন্যাকে বলল, 'নারায়ণের কৃপায় তুই তো দেবতা বনে গেছিস্। আমি তোর মা; আমাকে একটু কৃপা কর্। বিষ্ণুকে বলে আমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দে, যার ফলে এই বুড়ো বয়সে সশরীরে স্বর্গে যেতে পারি।' রূপিণিকা মায়ের আবদার যথাস্থানে পেশ করল। ধূর্ত লৌহজংঘ বললেন, 'তোমার মাতা অতি পাপিনী। তার ঐ রূপে স্বর্গে যাওয়া অসম্ভব। তবে হাঁ, একাদশীর দিন সমস্ত ভক্তদের জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত থাকে। সেদিন প্রথমে শিবের ভক্তরা প্রবেশের সুযোগ পায়। সুতরাং তোমার মা যদি ঐদিন ক্ষুর দ্বারা মস্তক মুণ্ডন ক'রে দেহের একভাগ কাজলে ও অন্যভাগ সিঁদূরে লিপ্ত ক'রে বিবস্ত্র অবস্থায় শিবের ভক্তরূপে অপেক্ষা করতে পারে, তাহলে আমি তাকে স্বর্গে পৌঁছে দিতে পারি।' রূপিণিকার কথা অনুসারে তার মা সেইমত সাজসজ্জা ক'রে বিষ্ণুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ব্রাহ্মণ লৌহজংঘ সেই রাত্রিতে গণিকার সঙ্গে প্রেমলীলা সমাপন ক'রে বিকটবেশা কুট্টনীকে গরুড়ে চড়িয়ে প্রস্থান করলেন। কিছুদূর যাবার পর মন্দিরের উপর এক পাথরের চাতালে রূপিণিকার মাকে বেঁধে রেখে বললেন, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর; আমি শিবের অনুমতি নিয়ে ফিরে আসি।' এই বলে কিছুদূর গিয়ে আকাশ থেকে চীৎকার করতে লাগলেন, 'ওহে মথুরাবাসীরা শোন, আজ সর্বসংহারিণী মহামারী তোমাদের উপর পতিত হবে। তাই সবাই একসঙ্গে ভগবানের ভজনা কর।' এই বলে লৌহজংঘ গরুড় থেকে নেমে মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত অগণিত জনতার ভীড়ে মিশে গেলেন। এদিকে বৃদ্ধা কুট্টনী পাথরের উপর সেই অবস্থায় অপেক্ষা করতে করতে ভাবল, 'ভগবান তো এখনো এলেন না, তাহলে কি আমার স্বর্গে যাওয়া হোল না!' অবশেষে পতনের ভয়ে সে চীৎকার করতে লাগল,

'হে ভগবান, আমি যে পড়ে মারা যাব; আমায় বাঁচান।' প্রাতঃকালে মথুরাবাসীরা গণিকামাতা মকরদংষ্ট্রাকে দেখেই চিনতে পারল এবং চারিদিকে হাসির রোল উঠল। সবার সঙ্গে মজা দেখার জন্য রূপিণিকাও উপস্থিত হয়েছিল; কিন্তু মায়ের ঐ করুণ পরিণতি দেখে লজ্জায় দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেও সে কোন উপায়ে মাকে নীচে নামানোর ব্যবস্থা করল। নাগরিকদের কেউ কেউ বলল, 'ঐ বুড়ী মাগী অনেক লোককে ঠকিয়েছে, এতদিনে যোগ্য শাস্তি পেল।' অবশেষে লৌহজংঘ সকলের কাছে পূর্বাপর ঘটনা প্রকাশ করলেন। নগরের রাজা খুশী হয়ে ব্রাহ্মণকে পট্টবন্ধের মর্যাদা দিলেন এবং রূপিণিকাকে গণিকাবৃত্তি থেকে মুক্ত করলেন।

শ্রীমতী

[অবদান-শতকের এই আখ্যানে তথাগত বুদ্ধের প্রতি শ্রীমতীর ভক্তি ও আত্মত্যাগের এক করুণ কাহিনী বর্ণিত। রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী' কবিতা একে অবলম্বন ক'রেই রচিত]

পরম ধার্মিক প্রজানুরঞ্জক মহারাজ বিম্বিসার ভগবান বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। রাজগৃহ তাঁর রাজধানী। সুখ-সমৃদ্ধিতে উজ্জ্বল দেশ; ভিক্ষু ও শ্রমণদের ভিক্ষার অভাব নেই; অগণিত প্রজা, তাদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ নেই; নেই তস্কর আর ব্যাধির ভয়; শালী ধান্য, ইক্ষু, দুগ্ধবতী গাভী, মহিষ প্রভৃতির প্রাচুর্য; কৃষি আর বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি। রাজা আপন রাজ্যটিকে একমাত্র পুত্রের মতো পালন করেন।

সেই সময় রাজগৃহের বেণুবনে কলকন্দক নিবাপে ভগবান বুদ্ধ শিষ্যদের সঙ্গে অবস্থান করছেন। যেদিন থেকে বিম্বিসারের অন্তরে সত্যের উপলব্ধি ঘটেছে, সেদিন থেকে তিনি অন্তঃপুরবাসিনীদের সঙ্গে তাঁর সেবায় মনপ্রাণ দিয়েছেন।

বসন্ত এসে গেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে কুসুমের সমারোহ। হংস-ক্রৌঞ্চ-

ময়ুর-শুক-সারী-কোকিলের ধ্বনিতে উপবন মুখরিত। বিম্বিসার অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে প্রাসাদ থেকে উপবনে এসেছেন, সেখানে তথাগতের পূজার্চনা হবে। পথশ্রমে ক্লান্ত পুরনারীরা মহারাজকে সবিনয়ে নিবেদন করলেন, 'প্রভু, প্রতিদিন ঐ প্রাসাদ থেকে উপবনে এসে ভগবানের অর্চনা কি আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে? মহারাজ, তাই গৌতমের কেশ আর নখ ভিক্ষা ক'রে এনে এই অন্তঃপুরের মধ্যেই এক স্তূপ নির্মাণ করুন। সেখানেই আমরা প্রতিদিন পুষ্প-গন্ধ-মাল্য-বিলেপন-ছত্র-ধ্বজ ও পতাকা নিয়ে ভগবানের বন্দনা করতে পারব।' অন্তঃপুরচারিণীদের এ প্রার্থনা মহারাজ বিম্বিসার বুদ্ধের কাছে নিবেদন করলেন। ভগবান কেশ ও নখ দান করলেন। মহারাজের সৎক্রিয়া আর পুরবাসিনীদের উৎসাহের মধ্যে স্তূপ রচিত হোল। তারপর যথারীতি দীপ-ধূপ-গন্ধে পূজা-আরাধনা চলতে লাগল। কিছুদিন পর ধার্মিক ধর্মরাজ বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রুর হাতে নিহত হলেন। অজাতশত্রু সিংহাসনে আরোহণের পর তথাগতের সমস্ত দান-ধর্ম নিষিদ্ধ করলেন। বুদ্ধের স্তূপে উপাসনা বন্ধ হোল।

সেদিন পঞ্চদশী তিথি, বুদ্ধের 'প্রবারণা' অনুষ্ঠানের দিন। এবার কিন্তু আগের মত সেই স্তূপে ঝাঁট পড়ল না, দীপ-ধূপ জ্বালানো হোল না, কুসুমের অর্ঘ্য সাজান হোল না। অন্তঃপুরের রমণীরা এই নিদারুণ অবস্থা দেখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন; কিন্তু মহারাজের আদেশ তাদের মনে পড়ে গেল। করুণস্বরে কেঁদে উঠলেন তারা 'হায় কি কষ্ট! ধর্মরাজ যেই বিগত হলেন, অমনি আমরাও পুণ্যকাজ থেকে বঞ্চিত হলাম।' রাজপ্রাসাদে সকলের সঙ্গে বাস করতেন বুদ্ধের পরম অনুগতা এক অন্তঃপুরিকা। নাম শ্রীমতী। তিনি মনে মনে তথাগতের গুণগরিমা স্মরণ করলেন। নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে শ্রীমতী একাই স্তূপের সম্মুখে এলেন, তারপর সেখানে ঝাঁট দিয়ে দীপাধারে সারি সারি প্রদীপমালা জ্বালিয়ে দিলেন।

এমন সময় মহারাজ অজাতশত্রু প্রাসাদের উপরিতল থেকে সেই